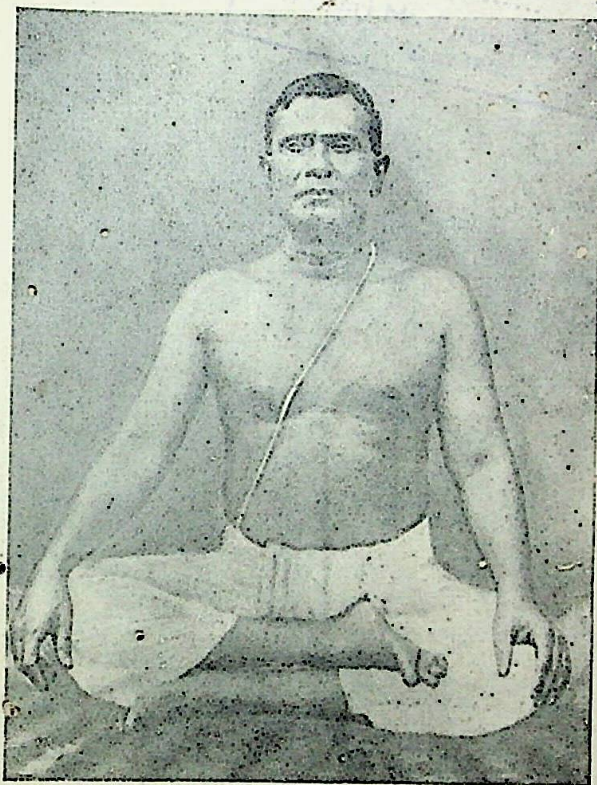
রহস্যবিদ্যা

আদিপ্রবাহ—কামাত্মিকা চণ্ডিকা



শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা



যো দুর্লভাং কৃতযুগেঽপি রহস্যবিদ্যাং
বিদ্যাম্বুধিঃ করুণয়েহ কলৌ বিতেনে।
শ্রীমদ্‌গুরুং সকলভূতহৃদি স্থিতং তম্
আদ্যং ঋষিং বিজয়কৃষ্ণমহং নমামি ॥

ঋষিপ্রবর শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণের

চণ্ডীতত্ত্বসম্বন্ধীয় উপদেশবাণী সংগ্রহ

বা

রহস্যবিদ্যা

আদিপ্রবাহ—কামাত্মিকা চণ্ডিকা

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত

শ্রীসতীশ চন্দ্র সেনগুপ্ত

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

১৩৫৬ সাল

প্রকাশক—শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
উপনিষদ্ রহস্য কার্য্যালয়
৬৪নং কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, হাওড়া

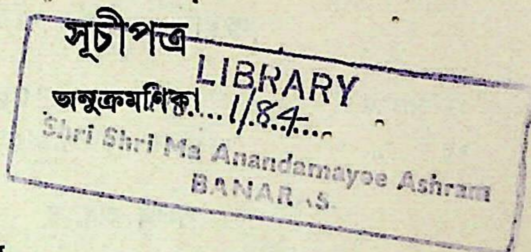
প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ
১২৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা

৪ঠা পৌষ, ১৩৫৬

মূল্য দুই টাকা

"বিশ্ববাণী প্রেস"
৪৪/এ, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩ হইতে
শ্রীকমলকুমার সুর কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র



প্রথম অধ্যায়

চণ্ডীতত্ত্বের সূচনা

দ্বিতীয় অধ্যায়

চণ্ডীর প্রথম মন্ত্রদ্বয়ের গুরুত্ব

তৃতীয় অধ্যায়

মন্ত্রশক্তিরূপিণী চণ্ডিকা

চতুর্থ অধ্যায়

অনুভূতি ও সম্ভূতি শক্তি

পঞ্চম অধ্যায়

অসুর তত্ত্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়

চণ্ডীর শক্তিস্বরূপতা



শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	৩	ছুয়ে	ছুঁয়ে
„	৪	সবটুকু	সরটুকু
২৬	১	প্রস্ফোফন	প্রস্ফোটন
৫৯	২৪	তুমিই ফুটছে	তুমিই ফুটছ
৭৫	২০	স্বচ্ছ পাতলা	স্বচ্ছ বা পাতলা
৭৬	১১	ইচ্ছার্ত্তি	ইচ্ছামূর্ত্তি
„	২৩	মন্ত্র পড়বার যদি	মন্ত্র পড়বার সময় যদি
৮০	২৪	জাঢ্য	জাড্য
৯৬	১১	এই টুকুই হ'লেই	এই টুকু হ'লেই
৯৭	২১	উপরিস্তাৎ	উপরিষ্টাৎ
১০০	১৮	জগৎ ঠেকেছে না	জগৎ ঠেকছে না
১০১	১৭	কতকগুল	কতকগুলি
১১৬	২	ব্যবহার দ্বারা	ব্যবহারের দ্বারা
১১৭	২	কী মহান ?	কী মহান !
১২০	১৬	আত্মাগত	আত্মগত
১২২	১৫	দেখতে হবে।	দেখতে হবে,
১৩০	২৪	চীৎকার কর তুমি যখন	চীৎকার কর—তুমি যখন
১৩৫	২১	পুরমরস বয়েছে	পরমরস রয়েছে
১৩৭	৩-৪	বেদ। গতিতে	বেদগতিতে
১৪২	২৬	দেখলাম	দেখালাম
১৫৬	২৪	সারা	সাড়া
১৬৬	১৪	ব্রক্ষাণী	ব্রহ্মাণী

—০:*:০—

মুখবন্ধ

"পাতঞ্জল দর্শন যেমন সাংখ্যের practical aspect (ব্যবহারিক বিজ্ঞান), তেমন 'চণ্ডী' হল ব্রহ্মবাদের practical • aspect বা applied philosophy (ব্যবহারিক দর্শন)। চণ্ডী সাংঘাতিক জিনিষ! চণ্ডী জীবের একমাত্র পরিত্রাণ। বেদব্যাসের রচিত যদি হয় মার্কণ্ডেয় পুরাণ, তা হলে মহাভারতের ভিতর 'গীতা' ঢুকিয়ে তিনি যে কাজ করেছেন, তার চেয়েও অনেক বড় কাজ করেছেন এই 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী' লিখে।"

—শ্রীশ্রীগুরুবাণী

১লা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৭ সাল ;
ইং ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ সাল।

উৎসর্গ

গুরো! তোমার শ্রীমুখনিঃসৃত ভগবৎতত্ত্বের বিরামহীন অপূর্ব্ব উপদেশের অমৃতধারায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর যখন আমাদের মনপ্রাণ উজ্জীবিত হইতেছিল, তখনকার এক শুভ মুহূর্ত্তের কথা আমার প্রাণে এতকাল ধরিয়া বিশেষরূপে জাগরূক রহিয়াছে। ১৩৪৭ সনের কার্ত্তিক মাসের শেষাশেষি এক সুপ্রভাতে তুমি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলে, "আমি তোকে একটা কাজের ভার দিতে চাই। চণ্ডীতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত যা কিছু বলেছি, এবং পরেও যা কিছু বলব, সে সমস্ত উপদেশ একটা বইয়ের আকারে সংগ্রহ ক'রে আমাকে দিতে হবে। একটা সুযোগ দেখে পরে প্রকাশ করা যাবে। সংগ্রহ করবার সময় উপদেশের বাজে কথাগুলি বাদ দিয়ে সারাংশগুলিই নিবি। উপদেশগুলি অনেকেই টুকে নিচ্ছে। আমি বিশেষ ক'রে মহেন্দ্রকে বলে দিয়েছিলাম এইগুলি আমাকে লিখে দিতে। এই খাতাগুলি এখানেই আছে, তোকে এখনই দিয়ে দিচ্ছি। তুই আজ-কালই কাজটা আরম্ভ ক'রে দে; এতে সময় লাগবে। দরকার বোধ করলে হৃদয় ও আর আর সকলের খাতাও তুলনা করতে পারিস্। এর পর বেদ সম্বন্ধে এখন যা বলছি, তা'ও তোর লিখতে হবে।" তোমার অপরিসীম আশ্রয়পুষ্ট ভাগ্যবান্ ভক্তগণের মধ্যে বহু গুণী, জ্ঞানী ও যোগ্যতর পুরুষ থাকা সত্ত্বেও কেন এমন একটি গুরুভার এক অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হইল তাহা, হে সর্ব্বদ্রষ্টা! তুমিই জান। তোমার এই অপ্রত্যাশিত আদেশে স্তম্ভিত হইলেও আমার প্রাণ এক অজ্ঞাত কারণে মহানন্দে নাচিয়া

উঠিয়াছিল। সুতরাং আমি সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তোমার কর্ম্ম-সাধনার্থে শক্তি দানের জন্য শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম।

তদবধি, ওগো অন্তর্যামি! তোমার ঐশী প্রেরণা আমার এই জীর্ণ দেহে, মনে ও প্রাণে অভূতপূর্ব্ব বল সঞ্চার করিয়া তোমার এই শুভেচ্ছার সম্পূরণে আমাকে কর্ম্মময় করিয়া রাখিয়াছে। তোমার প্রদত্ত অফুরন্ত উপদেশ হইতে নিগূঢ় চণ্ডীতত্ত্ব সঙ্কলন কার্য্য তৎপ্রভাবেই অবশেষে সিদ্ধ হইতে চলিল। কিন্তু, হে দেবতা আমার! তোমার আদেশের একাংশ আমি সম্যক্ পালন করিতে পারি নাই। তোমার উপদেশের অমৃতময় সমুদ্র মন্থন করিতে গিয়া আমি আনন্দে এতই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি, যে আমার সঙ্কলনে তোমার উপদেশের ভিতর সার-অসার এই ভেদজ্ঞান প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছে, এবং প্রায় সমগ্র উপদেশই সারময় বলিয়া গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছি। আমার এই বিকলতাজনিত ত্রুটিতে তোমার আদেশ পালন যে খর্ব্বীকৃত হইল, এই বৈগুণ্য যেন ক্ষমার্হ হয়।

হে বিশ্বগুরো! "রহস্যবিদ্যা"—চণ্ডীতত্ত্বের এই বিশিষ্ট নামটি তোমারই উদ্ভাবন। অতএব "রহস্যবিদ্যা" নামধেয় চণ্ডীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় তোমারই প্রদত্ত এই অমূল্য উপদেশসংগ্রহরূপ রত্নহার তোমার শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়া আমি কৃতকৃতার্থ। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক! তুমি এই সেবায় তৃপ্ত হও! সেবক ধন্য হউক!

শ্রীচরণাশ্রিত—

সতীশ

সঙ্কলয়িতার নিবেদন

গীতা ও চণ্ডী এই দুটী ধৰ্ম্মগ্রন্থ সমমর্য্যাদাসম্পন্ন এবং অধুনা এতদ্দেশীয় ধৰ্ম্মপিপাসু ও তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিবর্গের নিকট অতীব সমাদৃত। উভয় গ্রন্থের অন্তর্গত উপদেশই মনুষ্যহৃদয়গত বিপরীতমুখী প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি নামীয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবদ্বয়ের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া বা দ্বন্দ্বকে উপলক্ষ করিয়া পরোক্ষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার উপদেশে আছে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ঈশ্বর ও ব্রহ্মভাবের সুসজ্জিত ও সুস্পষ্ট দার্শনিক বিশ্লেষণ; আর আছে ভগবৎতত্ত্বে অনভিজ্ঞ বা অবিশ্বাসী জীবহৃদয়ে ভগবদাসন কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহার নির্দ্দেশ। গীতার উপদেশ জীবহৃদয়ে ভগবদাসন যেখানে প্রতিষ্ঠিত পাঠককে সেইখান পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। চণ্ডীর উপদেশ গভীরতর তত্ত্বসমন্বিত এবং অধিকতর পরোক্ষ ও প্রচ্ছন্ন। গীতার উপদেশে শরণাগতির ভাব হৃদয়ে জাগ্রত হইলে, এই তত্ত্বকে ব্রহ্মভাবে উত্তোলিত করিবার পথে অন্তরায় স্বরূপ ও মৃত্যুদ্বার স্বরূপ অসুরত্বের বা অহমিকার নিধন কিরূপে সংসাধিত হয়, এবং তদ্বারা কিরূপে ব্রহ্মসারূপ্যে উপনীত হইতে হয়, এই সমস্ত গুহ্য তত্ত্ব চণ্ডীগ্রন্থেরই অঙ্গীভূত। এইজন্য "মুখবন্ধে" বলা হইয়াছে "চণ্ডী হল ব্রহ্মবাদের applied philosophy বা practical aspect" অর্থাৎ ব্যবহারিক বিজ্ঞান। সমগ্র চণ্ডীতত্ত্বটিই একটি ফলপ্রদ ক্রিয়াময় ব্যাপার এবং তৎসংক্রান্ত উপদেশাবলী সদ্‌গুরুনির্দ্ধারিত পন্থায় অনুসৃত হইলে, তাহার ফলদাতৃত্ব সুনিশ্চিত ও ক্ষণসম্ভাব্য।

এই সকল দুজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব দেবাসুর সংগ্রামাত্মক একটা রূপক বর্ণনার দুর্ভেদ্য কুজ্ঝটিকান্তরালে নিগূঢ় রহস্যাবৃত অবস্থায় নিহিত বলিয়া চণ্ডীতত্ত্বকে রহস্যবিদ্যা বলা হইয়াছে। এই রহস্য ভেদ

intellect বা বুদ্ধির কর্ম্ম নয়, শুধু পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক জ্ঞানের পক্ষেও সম্ভবপর নয়। সিদ্ধ ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ—যিনি সারূপ্যবোধে আত্মচৈতন্যকে ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত একীভূত করার বিদ্যায় পারদর্শী—তিনিই কেবল চণ্ডীতত্ত্বের এই রহস্যোদ্‌ঘাটনে সমর্থ। এই কারণে গীতার ব্যাখ্যা করা বিদ্বজ্জনের শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক জ্ঞানের পক্ষে কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইলেও, চণ্ডীতত্ত্বের মর্ম্মগ্রাহী ব্যাখ্যা করা এক দুরূহ ব্যাপার বলিয়া এতদিন গণ্য করা হইয়াছে। এই দুরধিগম্য চণ্ডীতত্ত্বের গভীর রহস্যভেদাত্মক একখানি অভিনব প্রামাণিক গ্রন্থ চণ্ডী-পাঠকপাঠিকা-গণের হস্তে তুলিয়া দেওয়াই এই 'রহস্য বিদ্যা' নামক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য।

গ্রন্থের বিশেষত্ব

এই গ্রন্থটি চণ্ডীর একটি নূতন সংস্করণ নয়; কেন না চণ্ডীর মন্ত্র সমূহের অন্বয়, ব্যাখ্যা, টীকা ইত্যাকারীয় অর্থবিবৃতি বা ভাব বিশ্লেষণের কোন প্রচেষ্টা ইহাতে নাই। ধারাবাহিক ভাবে সপ্তশতী মন্ত্রসমূহের উল্লেখ এবং তদনুবাদ ও ইহাতে করা হয় নাই। এই গ্রন্থটিতে আছে শুধু চণ্ডীতত্ত্বের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্মস্পর্শী উদ্‌ঘাটন। দৃশ্যতঃ ইহা চণ্ডীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মাত্র একটি প্রবন্ধগুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে পারে বটে; কিন্তু ইহার অন্তর্গত তথ্যগুলি প্রবন্ধাকারে বিন্যস্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রবন্ধ-নামার্হ নহে; কেন না, যেরূপ উদ্দেশ্য লইয়া এক একটি প্রবন্ধ রচিত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া এই সকল তথ্য প্রকাশিত হয় নাই। প্রতিটী বিবৃত তথ্য পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অধ্যায়ের তথ্যগুলির সহিত পরস্পর সম্বন্ধাবদ্ধ। প্রতি অধ্যায়ের শিরোদেশে যে এক একটি বিশিষ্ট নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের লক্ষ্যানুসারে সঙ্কলয়িতারই উদ্ভাবিত। সুতরাং এই গ্রন্থটি চণ্ডীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিতান্ত অভিনব এক জ্ঞানপ্রকাশ। এখন এই জ্ঞানালোক কোথা

হইতে আবির্ভূত হইল,-এবং জ্ঞানগর্ভ তথ্যগুলিই বা কিরূপে সংগৃহীত হইল, তাহা বলিলেই সঙ্কলয়িতার মূল বক্তব্যটি নিবেদিত হইবে।

এই গ্রন্থটি শ্রীগুরূপদেশরূপ কুসুমকাননে চয়িত একটি দিব্য-পুষ্পমাল্য। বর্ত্তমান যুগের ঋষিপ্রবর আচার্য্য শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন উদাত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "জগতে দুটি প্রত্যক্ষ মহাসত্য আলোক আঁধারবৎ রয়েছে—ভগবান্ ও মৃত্যু; যারা প্রথমটিকে না দেখে, তারা শেষেরটি পায়, আর এই দুইএর ডাক কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না। গুরুরূপে ভগবানই ডাকেন; সুতরাং তাঁরই ডাক বলে তোরা গুরুমুখে তাঁর ডাকের সাড়া দিতে এগিয়ে আয়।" তখন দেশ দেশান্তর হইতে বহু ভক্ত এই "ডাকের সাড়া দিতে"—শ্রীগুরুর শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় উপদেশ বাণী শ্রবণ করিতে—আকুল প্রাণে হাওড়ার শ্রীগুরুমন্দিরে ছুটিয়া আসিল। তিনি খৃষ্টীয় ১৯৩৮ অব্দ হইতে ১৯৪৫ অব্দ পর্য্যন্ত বেদ, উপনিষদ, চণ্ডী, পুরাণ, তন্ত্র সমন্বিত অপরাজিতা ব্রহ্মবিদ্যার যে পূত প্লাবনে শিষ্য ও ভক্তগণের মনপ্রাণ অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই অংশতঃ এই রহস্যবিদ্যীর বিষয়ীভূত করা হইয়াছে। প্রায় প্রত্যহই বিশেষতঃ প্রতি রবিবার প্রাতে ৮টা হইতে ১০টা ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত অনর্গল ভাবে এই উপদেশামৃতধারা প্রবাহিত হইত। এই শ্রুতিমূলক অশ্রুতপূর্ব্ব ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণে শ্রোতৃসমাকীর্ণ প্রকোষ্ঠ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তন্ময় হইয়া থাকিত। এই উপদেশধারার একটি বিশেষত্ব ছিল চির নবীনতা। যদি কখনও পুরাতন কোন কথার অবতারণা করার প্রয়োজন বোধ হইত, তাহা যেন এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে ও নূতন রসে পরিপ্লুত হইয়া এক নব রূপ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীমুখনিঃসৃত হইত! হিমালয়নিঃসৃত বেগবতী মন্দাকিনীর ন্যায় ভাবতরঙ্গাকুলিত এই বাক্যস্রোত নির্গত হইবার সময় ক্ষিপ্র হস্তলিখনপটু কয়েকজন বিশিষ্ট শিষ্য ও ভক্ত তাহা যথাসাধ্য যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া

যাইতেন। স্বনামধন্যা ৺সরলাদেবী চৌধুরাণী, শ্রীহৃদয়রঞ্জন রক্ষিত, শ্রীভুবনমোহন দাশ, শ্রীমহেন্দ্রনাথ পূততুণ্ড ও শ্রীরমেশচন্দ্র পাত্র উক্ত লিপিকারদের মধ্যে অন্যতম। এইরূপে সংগৃহীত রাশিকৃত লিপি ইহাঁদের প্রত্যেকের নিকট অমূল্যসম্পদ রূপে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

শ্রীগুরুর আদেশে, আশীর্ব্বাদে ও প্রেরণায় এই সকল সংগৃহীত ও সংরক্ষিত উপদেশরাশি হইতে 'রহস্যবিদ্যা'র সঙ্কলয়িতা চণ্ডীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রায় সমগ্র উপদেশ চয়ন ও সঙ্কলন পূর্ব্বক এই গ্রন্থাকারে গ্রথিত করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছেন। এই সঙ্কলনে শ্রীগুরুর ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্য যথাসম্ভব অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। তিন চারি জন লিপিকারের পাণ্ডুলিপি অভিনিবেশ সহকারে তুলনা ও তাহা হইতে সার তথ্য উদ্ধার করার ফলে বর্ত্তমান গ্রন্থে এ উপদেশমালা গ্রথিত হইয়া যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতে অন্ততঃ স্থূলদৃষ্টিতেও শ্রীগুরুর উপদেশের প্রকৃত রূপ রক্ষিত হইয়াছে—গ্রন্থখানি এইরূপ ভাবে গৃহীত হইলে সঙ্কলয়িতার গ্রন্থ প্রকাশের প্রচেষ্টা সার্থক হইবে।

গ্রন্থে সংগৃহীত উপদেশের সন্নিবেশপদ্ধতি

চণ্ডী বিষয়ক তত্ত্বগুলি চণ্ডীর আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত ক্রমধারায় উপদেষ্টা কর্ত্তৃক কখনও বর্ণিত হয় নাই। শিষ্য ও ভক্তগণকে জ্ঞানে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি যখন যে তত্ত্বের উপর জোর দিয়া উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিতেন, তখন সেই তত্ত্বকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহার বাক্যস্রোত প্রবাহিত হইত। উপদেশ দানের সময় জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় এবং শ্রুতি, চণ্ডী, তন্ত্র, দর্শন, পুরাণাদি বিবিধ হিন্দুশাস্ত্রে প্রতিপাদিত ভগবৎ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়ের দিকেই তাঁহার আর্ষদৃষ্টি আলোকপাত করিত। চণ্ডীতত্ত্বও এই জটিলতার ভিতরেই সময় সময় নানাসূত্রে

বিবৃত হইত। শুধু চণ্ডীতত্ত্ব বিষয়ক অমিশ্রিত উপদেশ অল্পই দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে সেই লিপিবদ্ধ উপদেশাবলী হইতে নিছক চণ্ডীতত্ত্ব বাছিয়া লওয়া এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়াছে। আবার চণ্ডী সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি বর্ত্তমান গ্রন্থে ক্রমোচ্চ পদ্ধতিতে সন্নিবেশিত করা, অর্থাৎ চণ্ডী চরিতত্রয়ের সুস্পষ্ট ধারা বজায় রাখা অথবা সরল হইতে ক্রমশঃ জটিল (from the simple to the complex) এই বিজ্ঞানসম্মত ধারা অনুসরণ করাও সম্ভবপর হয় নাই। তবে উক্ত বিষয়গুলিকে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম (from matter to the spirit)—এইরূপ একটি ক্রম স্থূলভাবে অনুসরণ করার কতকটা চেষ্টা হইয়াছে। যেমন, চণ্ডীতত্ত্বের প্রাথমিক আভাস প্রদানের পর, স্থূল বা ব্যক্ত বিশ্বরূপে ভগবৎ শক্তির বিকাশ, তৎপশ্চাতে সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির লীলায়ন এবং পরিশেষে সূক্ষ্মতর রুদ্রশক্তি কর্ত্তৃক সর্ব্বশক্তির প্রত্যাহার বা প্রলীয়ন—ইত্যাদি বিষয়গুলিকে পুস্তাকাকারে সজ্জিত করিবার সময় এই ক্রমটির দিকে সূক্ষ্মভাবে না হইলেও স্থূল ভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। তত্রাচ স্থানে স্থানে পুনরুক্তি দোষ রহিয়া গিয়াছে। যেখানে যেখানে পুনরুক্তির বিলোপ করিলে context বা পূর্ব্ব প্রসঙ্গের সহিত আলোচ্য বিষয়ের সম্বন্ধহানি হয়, সেখানে সেখানে পুনরুক্তি করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া তাহা অবিকল রাখা হইয়াছে।

ঋষি প্রদত্ত সমগ্র উপদেশ সংগ্রহের প্রচেষ্টা

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে যাহা বলা হইল তাহা হইতে লক্ষিত হইবে যে, চণ্ডীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সকল জ্ঞাতব্য তথ্য এই গ্রন্থটিতে নাই। খুব সম্ভবতঃ শ্রীগুরু তদ্বিষয়ক কোন কথাই বুঝাইয়া বলিতে বাকী রাখেন নাই। এই সমস্ত কথা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইলেও তাহা ধরিয়া রাখিবার সামর্থ্য অতি স্বল্প শ্রোতারই থাকিত। পূর্ব্বোক্ত দ্রুতলিখন

পটু মুষ্টিমেয় শিষ্যও সময়ে সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। এই কারণে বহু অমূল্য তত্ত্বোপদেশ এবং তৎসঙ্গে চণ্ডীতত্ত্ব বিষয়ক অনেক দুর্লভ উপদেশও লিপিবদ্ধ না হইয়া বিস্মৃতি সাগরে চির-বিলীন হইয়া গিয়াছে। পঞ্চত্রিংশাধিক বর্ষব্যাপী শ্রীগুরু প্রদত্ত মৌখিক উপদেশরাশির মধ্যে মাত্র বৎসর দশেকের উপদেশ শিষ্যগণ কর্ত্তৃক কথঞ্চিৎ বিবৃত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম পঁচিশ বৎসরের উপদেশ কদাচিৎ লিখিয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। কেবল শ্রীগুরুর স্বহস্ত লিখিত কয়েকটি গ্রন্থে সে অভাবের কথঞ্চিৎ পূরণ হইয়াছে। উপদেশ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা রীতিমত লিপিবদ্ধ করিবার সর্ব্ব প্রথম চেষ্টা করেন শ্রদ্ধাভাজন ৺নিতাইচরণ ভট্টাচার্য্য। এইরূপ লিপিবদ্ধতার প্রভূত কার্য্যকারিত্ব দর্শনে শ্রদ্ধেয়া ৺সরলা দেবী চৌধুরাণী প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট শিষ্য এই লিখন পন্থা অনুসরণ করিতে উৎসাহিত হন। এইরূপে অনেকের লিখনের ফলে শ্রীগুরু প্রদত্ত অমূল্য উপদেশরাশির কতকাংশ চির বিস্মৃতি হইতে রক্ষা পাইয়াছে। শ্রীগুরু প্রসাদে সম্প্রতি ৺সরলা দেবীর পাণ্ডুলিপিসমূহ উৎসাহী ও শ্রদ্ধাবান কয়েকজন "গুরুভাই" এর বদান্যতায় ও উদ্যোগে "বেদবাণী" নামে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বহু ব্যয়সাধ্য হইলেও সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশিত হইলে দেশে এক অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। যদি পঁয়ত্রিশ বৎসরের সমগ্র উপদেশ এইরূপে লিপিবদ্ধ করা থাকিত ও প্রকাশিত হইত, তবে দেশের ধর্ম্ম সাহিত্য ভাণ্ডার কত সমৃদ্ধ হইত! শেষ দশ বৎসরের যাহা কিছু লিপিবদ্ধ হইয়াছে, মাত্র তাহা হইতেই এই সন্নিবিষ্ট উপদেশসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। যে সকল বিষয়ে উপদেশ সম্পুর্ণ লিপিবদ্ধ নয় বলিয়া এই গ্রন্থের মূল অংশে স্থান পাইতে পারে নাই, তন্মধ্যে চণ্ডী পাঠাঙ্গের অন্তর্গত অর্গলাস্তব, কীলকস্তব, দেবীকবচ, রাত্রিসূক্ত, দেবীসূক্ত, চণ্ডীর ত্রিবিধ রহস্য, চণ্ডীপাঠ বিধি, চণ্ডী পূজার পদ্ধতি প্রভৃতি বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীপাঠাঙ্গীয় যে কয়েকটি তত্ত্ব শ্রীগুরুমুখে শিষ্যগণ কর্ত্তৃক বিশ্রুত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা এইরূপে অপূর্ণাঙ্গ হওয়ায়, এই বিকলাঙ্গ পাঠাঙ্গটি গ্রন্থের আদিতে বা মূলাংশে সন্নিবেশিত না করিয়া গ্রন্থশেষে 'পরিশিষ্ট' নামে সংন্যস্ত করা হইল। ইহাতে প্রচলিত রীতির ব্যত্যয় ঘটিল বটে; কিন্তু যেহেতু গ্রন্থখানি চণ্ডীর একটি বিশিষ্ট সংস্করণ নয়, এবং প্রচলিত বিধিবদ্ধ (orthodox) পাঠক্রমও ইহার লক্ষ্য নয়, সেই হেতু আশা করা যায় উক্ত পদ্ধতির অনুসরণাভাব চণ্ডীর মূল তত্ত্বে প্রবেশ লাভের পথে গুরুতর বিঘ্ন ঘটাইবে না।

চণ্ডী প্রদর্শিত সাধন প্রণালী

এই গ্রন্থ প্রকাশের আরো একটি মুখ্য উদ্দেশ্যের কথা এখনও বলা হয় নাই। 'চণ্ডী' যে ব্রহ্মবাদের practical aspect বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান—এ কথাটি বহুবিশ্রুত চণ্ডীমাহাত্ম্য বর্ণনার অন্তরালে সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত। গুরুচক্ষুর সহিত চক্ষু মিলিত করিয়া যাঁহারা চণ্ডীতত্ত্বদর্শনে অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট এই পন্থা চণ্ডীর প্রতি মন্ত্রে নখদর্পণবৎ স্পষ্টীকৃত। এই গুরুচক্ষু বর্ত্তমান গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট প্রতি গুরুবাণীর (discourse) ছত্রে ছত্রে সত্যান্বেষী সাধকের নিকট অনায়াসে ধরা পড়িবে। সাধনার সূত্রপাতেই দুটি অমীমাংসিত প্রশ্ন সংশয়ের বোঝা লইয়া সাধকের পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়—(১) "তোমার ভগবান্ কোথায়"? আর (২) "তাঁহার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ"? অন্তরে জ্ঞানরূপী সদ্গুরুর উদয়ে যখন এই সংশয়াত্মক প্রশ্নদ্বয়ের সমাধান হইয়া যায় এবং সে কৃতনিশ্চয় হয় যে 'জ্ঞান' বা চেতনাই তাহার ভগবান্ আর ইনিই বাক্‌শক্তিরূপে জীব, জগৎ ও ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাদি অনন্ত দেবসঙ্ঘ এবং কালী, দুর্গা সরস্বত্যাদি অনন্ত দেবশক্তিসঙ্ঘ সাজিয়া নানা বৈচিত্র্যময় ভঙ্গিমায় আত্মরমণ করিতেছেন, আর ইনি কোথাও অন্বেষ্য নহেন, একান্ত

প্রত্যক্ষ—অন্তরে বাহিরে সর্ব্বরূপে দেদীপ্যমান্ ও সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টব্য, তখন হইতে সত্যান্বেষীর প্রকৃত সাধনার আরম্ভ হয়। অভিনিবেশ সহকারে রীতিমত চণ্ডীপাঠ করিতে থাকিলে এই প্রজ্ঞারূপী গুরুর উদয় হয়, এবং অবশেষে আত্মচৈতন্যরূপিণী চণ্ডিকা ক্রমে আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক সাধনার প্রতি স্তরের অন্তবর্ত্তী বিশিষ্ট বিশিষ্ট অচিৎদর্শনরূপ অসুরসমূহের নিধন করিয়া তাঁহার অন্তর্বাহ্যবিহীন ও বৈশিষ্ট্যবিহীন ভূমা চিদানন্দস্বরূপ সাধকের নিকট ব্যক্ত করেন। এই গ্রন্থপাঠে চণ্ডীপাঠের দুর্লভ সার্থকতা সত্যান্বেষী সাধকের নিকট সুলভপ্রাপ্তিরূপে অনুভূত হইবে। শ্রীগুরুর স্বহস্তে লিখিত 'ঋতম্ভরা' নামক ব্রহ্মবিদ্যার প্রাথমিক গ্রন্থখানি অগ্রে পাঠ করিয়া লইলে সাধকের পক্ষে 'রহস্যবিদ্যা' পাঠ সুবোধ্য হইবে।

চণ্ডীতত্ত্বের এই উদ্ভিন্ন রহস্য শ্রীগুরু প্রথমে গুহ্য ও অপ্রকাশ্য বলিয়া শিষ্য ও ভক্তগণকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্ণাক্ষরেও এই গুহ্যতত্ত্ব অন্যত্র প্রকাশিত হইলে, তিনি ইহাকে গুরুর আদেশলঙ্ঘন বলিয়া গণ্য করিতেন, এবং অপরাধীর প্রতি বিশেষ অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করিতেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত এই মনোভাব রক্ষা করেন নাই। তিরোভাবের বৎসর দুই পূর্ব্বে তিনি চণ্ডী ও বেদসম্বন্ধীয় উপদিষ্ট তত্ত্বসমূহের সঙ্কলন ও প্রকাশের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তদনুসারেই এই 'রহস্যবিদ্যা' প্রকাশের আয়োজন হইল।

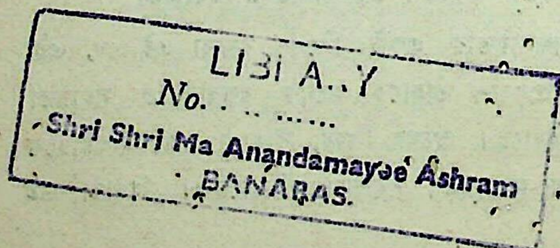
রহস্যবিদ্যা প্রকাশে গুরুভাইদের সহায়তা

পরিশেষে সঙ্কলয়িতার একটি বিশেষ বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ সঙ্কলনে ও প্রকাশে তাহাকে অনেক বন্ধুবান্ধবের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুখের বিষয়, তাঁহারা সকলেই হৃষ্টচিত্তে ও আগ্রহসহকারে আশানুরূপ সহায়তা করিয়াছেন। যাঁহারা এই

সঙ্কলন কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে তাঁহাদের সংগৃহীত শ্রীগুরুর উপদেশ ভাণ্ডার অকাতরে ও সর্ব্বান্তঃকরণে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রীহৃদয়রঞ্জন রক্ষিত, শ্রীভুবন মোহন দাশ ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ পূততুণ্ড। স্থানে স্থানে ৺সরলা দেবী চৌধুরাণী এবং শ্রীতারাপদ দত্তের সংগৃহীত তথ্যাদির ও সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে। সঙ্কলনের কোন কোন অংশে অনুজ শ্রীমান্ ভূপেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কথঞ্চিৎ ভ্রমসংশোধন ও ভাব সম্পূরণ দ্বারা বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক গুরুভাইয়ের আন্তরিক সহানুভূতি ও আগ্রহব্যঞ্জক নানাবিধ সহযোগিতা সঙ্কলয়িতাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই গ্রন্থ সঙ্কলনে এইরূপ আন্তরিক সহায়তার জন্য সঙ্কলয়িতা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। আর সর্ব্বশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন তাঁহারা, যাঁহারা স্বেচ্ছায় এই গ্রন্থপ্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উৎসাহী 'গুরুভাই' শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ। শ্রীহীরালাল হালদার। এই গ্রন্থের উৎকর্ষ সাধনে ও 'প্রুফ' সংশোধনে ইঁহাদের শ্রদ্ধাপ্রণোদিত ত্যাগ ও পরিশ্রমের সহায়তা না পাইলে ইহার আশু প্রকাশ সম্ভবপর হইত না।

"মাতৃমন্দির,"
৯১।এ রসারোড ঈষ্ট, টালিগঞ্জ।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত



প্রথম অধ্যায়

চণ্ডীতত্ত্বের সূচনা

—০:#:০—

প্রথম পরিচ্ছেদ

চণ্ডিকার পরিচয়

[চুম্বক—শরীরটা একটা স্থিতিশীল পদার্থ নয়, একটা শক্তিচক্র—বেদগতি দ্বারা তৈরী একটি মূর্ত্তি বা 'তনু'। ইহা বেদময়ীর প্রাণের সন্তান, তাঁর সস্নেহ দৃষ্টিদ্বারা বিধৃত। এই দৃষ্টি অনিমিক; এইরূপে তিনি বহুতনুময়ী হচ্ছেন। তেজ, প্রাণ ও মন রূপে জগতে যে শক্তি প্রবাহ প্রতিভাত, এটি বেদময়ী মায়েরই ত্রিবিধ শক্তিমূর্ত্তি। চিন্ময়ী মা আপনাকে এই ত্রিমূর্ত্তিতে বিশ্লেষিত ক'রে ক'রে আপনা থেকে বেরিয়ে আসছেন। এই প্রচণ্ড শক্তির নাম চণ্ডী'। ইনি "চমতি চ উড্ডীয়তে চ"—ইনি নিজেকে আস্বাদন করতে করতে নামছেন, আর প্রলীন হচ্ছেন। নানারকম আস্বাদন একত্রে 'তাল পাকিয়ে পাকিয়ে তিনি বিবিধ শ্রেণীর জীব রচনা করছেন। তিনি রূপ ও তার আস্বাদন,—জড় ও চেতন, শক্তিত্বের এই উভয় দিক ফুটাতে ফুটাতে বেরিয়ে আসছেন। জড়শক্তি চেতনেরই স্থূল তনু। এখান থেকে চেতন শক্তি বয়ে যাচ্ছে চিন্ময়ীর দিকে। এই সমগ্র মূর্ত্তিটিই চণ্ডী। এঁর দেহে নগণ্য বলে কিছু নাই। ইনি তনুত্ব পর্য্যন্ত নামেন, এবং তার অবসান ক'রে আবার ফিরে যান। এই তনুই চণ্ডীর যজ্ঞবেদী। তনুধারী জীব মাতৃবক্ষ ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না। জড় ও চেতন—শক্তিত্বের এই উভয় মূর্ত্তিই সংন্যস্ত জীবে। চণ্ডীতত্ত্বের এই জ্ঞান লাভ করতে হলে তনুর গণ্ডীত্ব ছাড়তে হয়, আর "স্বীকৃতি" অবলম্বন করতে হয়। উগ্রত্ব ও চণ্ডত্ব—এই হল চণ্ডীর বিশেষত্ব। প্রচণ্ড তেজই এর অভিব্যক্তি। প্রচণ্ডত্ব ও দেবময়ত্ব—এই অভিব্যক্তি দর্শনই চণ্ডিকা পূজার লক্ষ্য। তাঁর তনুটি 'জ্যেষ্ঠ' ও 'শ্রেষ্ঠ'। তাঁর খেলা হল বুকভরা ভালবাসা নিয়ে। আগে তাঁকে স্বীকার করে নাও। তা হলে জ্ঞানের চোখে দেখবে তিনি সর্ব্বত্র পাথর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছেন।]

শরীরটি তোমার বসে রয়েছে বলে যেন দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটি কি ঠিক এ রকম বসেই রয়েছে? না; এতে অনবরত ক্রিয়া চলছে—স্তরের পর স্তর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তৈরী হচ্ছে আবার প্রতিটি স্তর ক্রিয়াময় বা গতিময় হচ্ছে। চামড়া থেকে আরম্ভ করে প্রতি স্তর—হাড়, মাঁস, মজ্জা, স্নায়ু প্রভৃতি যা কিছু—প্রত্যেকটি প্রবাহ আকারে ক্রিয়াশীল রয়েছে। এতে এমন কিছু নাই যা নিষ্ক্রিয় হয়ে এমনি পড়ে রয়েছে। দেখতে মনে হয় যেন দেহটা নড়ে না চড়ে না—এক স্থৈর্য্যময় ভূমি; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এর প্রতিটি স্তর চঞ্চল, ক্রিয়াশীল বা গতিশীল। দূর থেকে মনে হয় নদীটা পড়ে আছে, দেখতে একটা sheet of water মাত্র। কিন্তু একটা sheet of water রূপে প্রকৃত পক্ষে এটা পড়ে নেই; এতে একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছে যার continuation এত দ্রুত, যে বুঝা যাচ্ছে না এর ভিতর ছেঁদা বা ফাঁক আছে কিনা। তেমনি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে শক্তিস্রোত বিঘূর্ণিত হয়ে হয়ে শরীরটাকে ধরে রেখেছে। আর এই যে শক্তি প্রবাহ এর বিভিন্ন স্তর আছে; তাতে বিভিন্ন রকম জিনিষ গঠিত হচ্ছে। যেটা যেটা গঠিত হল, তাতে তথোচিত ক্রিয়া প্রকাশ হচ্ছে; আবার সেটা যখন সরে যাচ্ছে, তার continuity ঠিক বজায় রাখছে। সুতরাং শরীরটা একটা শক্তিচক্র। যদি এর সমস্ত উপাদানকে শক্তি বলে গ্রহণ করি—যাতে আমি জাত হয়ে রয়েছি—তা হলে প্রকৃত পক্ষে বেদের ধর্ত্তা আমিই, অথবা বেদই এখানে আমার শরীর মূর্ত্তি ধরেছে।

মায়ের তনুত্ব গ্রহণ

পরমদেবতা জ্ঞানময়—চেতনাময়। এই চেতনের গতিই যখন বেদ, তখন যত কিছু গতি সব বেদগতিই। ভিতরে ভিতরে হরেক রকম স্তর তৈরী করছে আর মূর্ত্ত হচ্ছে। আমার 'নিজে' বলে একটা বোধ আছে, অন্তর আছে, একটি বেদচক্র যাতে অনন্ত অনন্ত স্পন্দন

ফুটছে। প্রতি বেদনের ultimate পরিণতি হচ্ছে একটা মূর্ত্তিতে, একটা চেহারায়, একটা রূপে। বেদচক্রের ঘূর্ণন দ্বারা যেটা ফুটে উঠছে, সেটা দেখা যাচ্ছে চেহারার আকারে—মূর্ত্তির আকারে। সুতরাং বেদনময়ী যিনি, তাঁর উদ্দেশ্যই হল আপনাকে মূর্ত্ত ক'রে তোলা—আপনাকে বহুবিধ ক'রে গড়ে তোলা। তাঁর যে গতি বেরুল, এ যে তাঁর বেদন,—এ যে তাঁর বুকের কামনা,—এ যে তাঁর বুকের উদ্বেলন,—এ যে তাঁর প্রাণ! এই মহাপ্রাণ স্বরূপ যে বেদগতি, একে মূর্ত্ত করতে তিনি ব্যস্ত; যেন ব্যস্ত হয়েছেন এক একটি মূর্ত্তি, এক একটি তনু তৈরী করতে। এইরূপ যে শক্তি নিজের বুকের ব্যথা দিয়ে তনু তৈরী করতে ব্যস্ত, ইনিই হচ্ছেন 'মা'; আর যেটি তৈরী হয়, সেটি 'সন্তান'। বুকের ব্যথাটি ফুটিয়ে ইনি 'তনু' হয়ে যাচ্ছেন। জলস্রোত যতক্ষণ বইতে থাকে ততক্ষণ যেমন সেখানে নদী থাকে, তেমনি বেদস্রোত যতক্ষণ চলে ততক্ষণ তাঁর বেদন—তাঁর হৃদয়—তাঁর প্রাণ—তাঁর সৃষ্টির continuity নিয়ে এমনি করে চেয়ে আছেন এই সন্তানের দিকে—আমার দিকে। আর যতক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন, ততক্ষণ আমার শরীর বিধৃত হচ্ছে। আর যাই চোখ ফিরিয়ে নিলেন অমনি শরীর আর নাই।

বেদময়ী মায়ের ত্রিবিধ শক্তিমূর্ত্তি

আমরা বাঁচতে বড় লালায়িত; তার জন্য কত আয়োজন ও উদ্যোগ করতে হয়—কত ব্যতিব্যস্ত থাকি। কার দৃষ্টিতে এই জীবন প্রবাহ চলেছে, সে দিকটা কিন্তু একেবারেই লক্ষ্য করি না। 'কার দৃষ্টি'—এখানে দৃষ্টি কথাটা মনে রাখতে হবে। 'দৃষ্টি' মানে চোখ নয়; দৃষ্টি মানে এই চোখের ভিতর দিয়ে যা বইছে। তার ভিতর দিয়ে বইছে 'তেজ', তার ভিতর দিয়ে বইছে 'প্রাণ', তার ভিতর দিয়ে বইছে 'হৃদয়', তারি ভিতর দিয়ে বইছে 'কামনা'। সে হয়গ্রীব

হয়ে এমনি ক'রে রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে গোটা প্রাণটা বইছে। তেজময়, প্রাণময়, ও মনোময় এই যে গতি তার দ্বারা আমার এই তনুটি তৈরী হয়েছে ও বিধৃত হয়ে রয়েছে। আমি এই তনুতে বসে কি ভোগ করি? মায়ের ঐ বুক। এই বুকখানাই এমন গতিবান হয়েছে—একটা তনয়ত্ব বা পুত্রত্ব ফুটিয়ে ধরে, আমাকে জাত ক'রে ধরে রেখে দিয়েছে—শুধু আমাকে নয়, বিশ্বকে ও। আমি যদি লক্ষ্য করি তো দেখব, আমার দিকে এ দৃষ্টি অনিমিক। তুমি যদি লক্ষ্য ক'র তো দেখবে, তোমার দিকে এ দৃষ্টি অনিমিক। আমি দেখি, এ সত্তাই বহু বহু তনুময় হয়েছেন। যেমন, এই যে জল, তারই গতির নাম স্রোত,—জল নিজেই ছুটছে হড়্ হড়্ করে। 'জল' বলে যে কি এক বস্তু, তা জানি না, কিন্তু হড়্ হড়্ করে যে ছুটছে এরই নাম জলস্রোত—এই স্রোতের নাম 'নদী'। এমনি করে যে শক্তি ছুটছে, এই ছুটার প্রথম ভঙ্গিমা হল 'তেজ', দ্বিতীয় ভঙ্গিমার নাম হল 'প্রাণ', তৃতীয় এক ভঙ্গিমার নাম মন'; তারপর যে ভঙ্গিমাটি ফুটে তার নাম 'তনু'। এইভাবে দেখা হলে একে বেদ বলে দেখা হল; অন্য ভাবে দেখলে একে বলা হবে চিন্তা। এই যে বেদময়ী মা, ইনি একেবারে আত্মময়ী। যেমন ধর জলের দৃষ্টান্ত; যত জলই আসুক হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্য্যন্ত, সবই দেখব জল'; এ জলায়তন কোথাও চওড়া, কোথাও উত্তালতরঙ্গময়, আবার কোথাও শান্ত। কিন্তু একে যে অবস্থায়ই দেখ না কেন, এ জলই,—জল ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক তেমনি এই যে তেজোময়, প্রাণময়, মনোময়, সর্ব্বেন্দ্রিয়ময় সত্তাটি বেরিয়ে আসছে, এর যেখানটাই দেখ, দেখবে ওই মা নিজেই বেরিয়ে আসছেন এমন চেহারা ধরে।

মায়ের বেদধারা

আবার দেখ, জল চলতে চলতে গিয়ে একটা গর্ত্ত পেল, তো হড়্ হড়্ ক'রে তাতে ঢুকে গেল। তখন এটা দেখতে হল পুকুরের মত।

এমনি ক'রে আর এক জায়গায় হ'ল পাতকুয়া। বিভিন্ন চেহারা লক্ষ্য ক'রে জলকেই এইসব ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। তেমনি এই মহীয়সী মায়ের এক নাম দেওয়া হ'ল 'তেজোময়ী'—এ এক রকমের বেদ; তার ভিতর আর এক নাম দেওয়া হ'ল 'প্রাণময়ী'—এ আর এক রকমের বেদ, আবার তার ভিতর 'মনোময়ী'—এ আর এক রকমের বেদ। চন্দ্রের তনু, বাতাসের তনু, কীট পতঙ্গাদির তনু, মাটি পাথর প্রভৃতির তনু,—এ সব তনুরূপে কা'কে দেখতে পাচ্ছি? বেদনাকে—বেদকে। এই বেদে অনেক বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্যকে বিভাগ ক'রে প্রধান তিনটি ক'রে নেওয়া হয়েছে—ঋক্, যজুঃ ও সাম। চণ্ডী বলতে এই বেদত্রয়কে বুঝায়। এর স্বরূপই হ'ল তিন রকম—তেজাত্মক বেদ, প্রাণাত্মক বেদ ও মনাত্মক বেদ। একে যদি 'চিন্ময়ী' মা না ব'লে বাইরে থেকে দেখ, তবে দেখবে, এক বিপুল শক্তি আপনাকে split ক'রে ক'রে ফড়্ ফড়্ ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে, যেমন একটা volcanic eruption হুড়্ হুড়্ ক'রে বেরোয়। এখানে কে একজন বা কি, তা জানি না, তবে হুড়্ হুড়্ ক'রে যে বেরোয় সেটা ঠিক। তার পরের ক্ষেত্রে দেখ, ঐ শক্তি যত জোরে বেরুচ্ছে, তত জোরে আবার ফিরছে; আর এই ব'ার হওয়া ও ফিরা, এই দুইয়ের সংঘর্ষণে উৎপন্ন একটা শক্তির উপলব্ধি পাওয়ার নাম ভোগ—taste—আস্বাদন। সেটা এমন আটাল যে তোমাকে শুদ্ধ জড়িয়ে নিচ্ছে। একটা স্রোত ভাঙ্গে যখন, তখন যা সামনে পায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়; আস্বাদন ক্ষেত্রটিও তখনি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই স্রোতে স্থির হয়ে তুমি এক মুহূর্ত্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছ না। নানা রকমে ভোগাত্মক ব্যাপার ফুটিয়ে ফুটিয়ে এই শক্তিস্রোত চলছে; তারপর দেখ, এই যে ভোগাত্মক ব্যাপার ফুটিয়ে চলছে, তাতে এ আবার তন্ময় হচ্ছে—পাঁচ রকম মিশিয়ে এক রকম আস্বাদনময় এক একটা কিছু হয়ে হয়ে জড় হচ্ছে! যত রকম আস্বাদন আছে, সব মিশিয়ে

মিশিয়ে এক একটা তাল বাঁধছে ; তার এক একটা নাম হ'ল মানুষ, গরু, গাছ, পাথর ইত্যাদি।

এই ভাবে চিন্ময়ী মা অনবরত বেদাগ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রে স্থূল শক্তি ফুটিয়ে চলেছেন। এ শক্তি খালি ফুটছে, আর ভিতর দিয়ে ফিরছে : আর তা' থেকে জ্ঞানগতি সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ—এই সব হড়্ হড়্ ক'রে বইছে। তুমি গাছের গোড়ায় খানিকটা জল ঢেলে দিলে : হ'তে পারে সেটা পাতকুয়োর জল, গঙ্গাজল বা ডোবার জল। কিন্তু সে জল যে রকমই হ'ক না কেন, সেটা গাছটার ভিতর ঢুকে উহার যত রকম constitution ছিল, সে সবগুলি নিয়ে নিয়েই চল্‌ল। তখন আর তাকে "জল" বলতে পার না ; কেন না সেই জল এখন আলাদা রকম হ'য়ে গেছে। কিন্তু যেটা প্রথম ঢেলেছিলে, সেটা জলই। যদি স্থূল মাটি, স্থূল জল—যা নিয়ে খাওয়া দাওয়া করছি—আমার ভিতর ঢালা হয়, তা হ'লে আমার যে ভোগ তন্ত্র তা'র ভিতর এ গুলি রকমারি ফুটাতে পারে ; ফুটিয়ে এর সঙ্গে খাপ্প খাইয়ে ধরে অথবা একে মারে। এই চলছে অনবরত। এই যে শক্তিজগৎ—অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ—এর যে দিকটা রূপের মত, সে দিকের নাম দাও 'জড়' ; আর যে দিকটা আস্বাদনের মত বা জ্ঞানের মত, ওটার নাম দাও 'চেতন'। শক্তি জগতের এই উভয় দিক এক সঙ্গে চলে। একটা শক্তির নামা মানেই এই উভয় দিক ফুটতে ফুটতে নামা।

চণ্ডীর যজ্ঞবেদী

গাছের যে ছালটা, সেটা হ'ল তার বেষ্টনকারী 'তন্ত্র'—ছালটাই তার যথার্থ তন্ত্র, কেন না ইহার দ্বারাই সে পুষ্ট হচ্ছে ; ইহাই তার শক্তি, কেননা ইহার ভিতর দিয়েই তার যত কিছু কাজ হচ্ছে ; আর তার ফলে গাছটা বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে। গাছের স্থূল যে তন্ত্রটি

এটিই যেন ছালে পরিণত হ'য়ে গেছে। যত রসই গাছটার ভিতর দিয়ে উঠে, সে রস ছালের ভিতর দিয়েই উঠে। ঠিক তেমনি ওই যে জড়শক্তির কথা বললাম, সেটা হ'ল চেতনের স্থূল তনু বা ছাল। আগুন, জল, বাতাস এগুলি তোমার বেষ্টনকারী তনু। ডুবে আছ তুমি আগুনে; আকাশে, বাতাসে; এতে যা কিছু আছে, তাতেই তোমায় ডুবিয়ে রেখেছে। এই জড় শক্তিই পাকিয়ে পাকিয়ে তোমার ভিতর দিয়ে বইছে, আর তোমার বিভিন্ন constitution কে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক'রে গ'ড়ে তুলছে। যাকে বাদ দিলে এক বিপুল জড়শক্তি দেখতে পাই, তার নামই 'চেতন'। অথচ 'জড়শক্তি' ও 'চেতন' একই জিনিষ। যেটা হয়েছে ভিতর পিঠ, সেটা 'চেতন'; এটা বয়ে যাচ্ছে মায়ের দিকে। আর যেটা বাহির পিঠ ওটা জড়'। যে বেদনময়ী মায়ের মূর্ত্তিটি দেখলে, এরই নাম চণ্ডী। 'চম্যতি উড্ডীয়তে চ'—খালি খাচ্ছেন আর উড়ছেন।

সুতরাং তোমার একগাছি লোম, একটি নখ—এমন নগণ্য অংশ সম্বন্ধেও তুমি বলতে পার না যে এটা মিছামিছি তোমার হাতে গজাচ্ছে। এটাও তোমাকে একটা মুক্তি দেবার জন্য গ'ড়ে গ'ড়ে চলেছে। এ কথাটা এভাবে না নিয়ে যদি মা ডাকতে বস, তা হ'লে বুঝবে তোমার ডাকা ঠিক হচ্ছে না। বড় তফাৎ এখানটায়।

এই মহাশক্তি তনুময়ী হ'য়ে নেমে এসে, যেখানে আবার ফিরতে আরম্ভ করলেন, সেখানে এই তনুর মৃত্যু হ'য়ে সেটাই তাঁর নামার শেষ সীমা হ'য়ে গেল। এই তাঁর মনের মতন হওয়াটি হ'ল। হওয়াটা যেখানে লক্ষিত হচ্ছে, তাকে বলে 'মর্ত্ত্য'। শক্তিময়ী এখান পর্য্যন্ত এসে তাঁর বেগটা এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছেন। মা আমাকে গ'ড়ে এখানে এনে রস খাইয়ে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছেন। এভাবে এই তনু আমার মায়ের যজ্ঞবেদী হয়েছে।

বেদজ্ঞানের সার্থকতা

ঋষি বলেছেন এই যে বেদজ্ঞান, এটি অবলম্বনে যদি কেউ একটা শুক্‌না ডাল হাতে ক'রে তার উপর এই বিদ্যা—এ বেদন—আরোপণ করে, তবে সে শুক্‌না ডালটি তৎক্ষণাৎ পত্র পুষ্প ধারণ করবে। যদি এই জ্ঞানে নিজের দিকে দৃষ্টি করে, তবে সে দেখবে, "আমি দেখতে যে রকম প্রকৃত পক্ষে আমি তো সে রকম নই; আমাকে বেদী ক'রে—মর্ত্ত্য বা মূর্ত্ত ক'রে—মা আমাতে এমন একটি রস ফুটিয়ে দিয়েছেন যে আজ আমার মন, আমার ইন্দ্রিয়—দেখতে হচ্ছে বটে বাইরের বস্তু অন্বেষণে ব্যস্ত—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তদন্বেষী তো নয়! আমার জামা চাই, টাকা চাই—এসব কথা এখন মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু যে চোখ জ্বলে উঠ্‌ল, তার ভিতর চলেছে এক অন্তর্দৃষ্টি—ওই মা-ই ভিতর দিকে ঘুরে আমায় নিয়ে ভিতর দিকে চলে যাচ্ছেন! আমি এত দিন জানতে পারিনি মা যে এমনি ক'রে আমায় নিয়ে চলেছেন—আমার মনে হচ্ছিল বুঝি বাইরে পড়ে গেলুম! যদি বেদ চক্ষু প্রজ্জলিত হ'য়ে থাকে, তখন দেখি—ওমা আমি তো আর কোথাও যাই নাই—নিজেতেই অর্থাৎ মাতৃ বক্ষেই রয়েছি! দেবি আমার, একি গো! আমার পাপ পুণ্য এখন কোথায় ফেল্‌ব? এ কার বুকে এসে পড়েছি আমি?

এই জ্ঞানটি প্রজ্জলিত রেখে যেখানে কোন কিছু গজায় না, এমন একটি শুষ্ক স্থানেও বৃক্ষাদি রোপণ করলে তা' ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,—এ এত বড় সত্য! তুমি বলতে পার "কেন মশায়! ভিতরটা না হয় বুঝলাম, এই যে বা'রটা পড়ে রইল, এটাকে কেমন করে 'মা' বলে নিই?" আমি এমন মায়ের কথা বলছি'না যে মা শুধু ভিতরেই আছে; আমি বলছি যে মা চেতন তারই কথা—আমি বলছি তারই কথা যে মা লুকিয়ে আছে কাঠ পাথরের ভিতর—যে মা আমার বা'রটা ও ভিতরটা দুটাই সংন্যস্ত ক'রে দিয়েছেন আমাতে।

"এই জ্ঞানে আমার কতটা বেগের প্রয়োজন হবে, ঠাকুর ?" "তোমার বেগের কোন প্রয়োজন নাই। বেগটা যে ওঁরই, এইটি স্বীকার করতে করতে তোমার বেগ আপনি আসবে—তোমার নিজের বেগ সঞ্চার করতে হবে না। তুমি যে বাঁধ দিয়ে রেখেছ—মাকে না দেখার বাঁধটা—সেটা ছেড়ে দাও, অমনি হড়্ হড়্ ক'রে বেগ আসতে থাকবে।" "কি ক'রে বাঁধ দিয়েছি, মশায় ?—"এটা তো মা' নয়, ওটা তো 'মা' নয়,—এমনি করে।" "তাই তো! তবে কোন্‌টা মা ?" "এমনি করে তুমি যে মাকে আড়াল ক'রে যাচ্ছ! তুমি তো জান না তুমি কোন্ অব্যক্ত শক্তির সন্তান! তুমি অমনি ক'রে না জেনে, আন্দাজে আন্দাজে নিজে নিজেই বললে 'এটা মা নয় কি ওটা মা নয়'। আর মা ও তখন বললেন 'আচ্ছা বেশ, তোমার কথাই রইল'। তুমি বললে, 'এটা আমি নই, ওইটে আমি নই'; তখন মাও তোমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা বেশ, ওটা আমি নই, ওটাও আমি নই।' তোমার এই ব্যাপারের ভিতর আসল কথাটি হল—স্বীকৃতি। তোমার কর্ম্মের মধ্যে কোন দোষ নাই; মহাপাপ ক'রেও তুমি পাপী হ'তে না, যদি তোমার 'মা' বলে স্বীকার থাকত 'ওগো মা! আমি না—তুমি!' আর যদি বললে —'আমি, তুমি না' তখন মা বলছেন, 'আচ্ছা বেশ, এবার তবে ভোগো'"।

কত ছোট্ট জিনিষে কত সামান্য অজ্ঞানতার দরুণ—গুরুর একটু জ্ঞানের অভাবে—কি পাথরের পিণ্ড হ'য়ে ভেসে থাকতে হয়! এইজন্য প্রতিটি জিনিষকে বেদময় ক'রে দেখতে হয়। এইরূপে বেদকে সমষ্টি আকারে এক সঙ্গে নিয়ে যে ভাবটি গ্রহণ করলাম, তাকে "এই যে চণ্ডিকা" বলে ঘিরে নিলাম। তা হ'লে এই বেদময়ী চণ্ডিকাই সর্ব্বদিক থেকে সহস্র নয়নে, অনিমিক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন।' এর প্রধান ভাবটি তুমি দেখতে পেলে, কেমন? সাপ

যেমন ফণা ধ'রে চেয়ে থাকে, বিদ্যুৎ যেমন লক্‌লক্ ক'রে দিঙ্মায় উদ্ভাসিত ক'রে যেতে থাকে,—তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয় কার সাধ্য? যে মাকে আঁকলাম, ওই যে তাঁর ছেলের দিকে অনিমিক চাওয়া, মাতৃত্বের এই চাওয়াটা কি তেমনি উগ্র নয়? এই মা ছেলের দিকে কেমন ক'রে চেয়ে আছে?—যেন তাঁর ভঙ্গী হ'ল "খবরদার, এ আমার ছেলে—আমার সন্তান! আমার তনু।" এমনি ক'রে তা' থেকে এক বিপুল তেজ ঠায় বেরুচ্ছে; সে তেজের বিপুলতার সীমা নাই। তোমার অন্তরে যে প্রাণ, সেটা না থাকলে হয় মৃত্যু; আর তোমার বাইরে যে electricity বা তড়িৎ প্রবাহ, সেটা না থাকলে জগৎ ভুস্ হয়ে যায়। দুই পাশেই শক্তির বিপুলতা দেখ। প্রাণ যদি ফিরল না, তোমার অন্তর-বাহির সবই ভুস্! বাহিরে ওই যে আকাশ, এতে বিদ্যুৎশক্তি বা তড়িৎশক্তি না থাকলে এই বিশাল সৃষ্টি নিভে ছাই হ'য়ে যাবে। দেখ, কত কড়া, কত দুর্দম শক্তির সমাবেশ আমার এই মায়ে। উগ্রত্ব ও চণ্ডত্ব, এটাই হ'ল এর গ্রহণীয়।

মার্কণ্ডের ঋষি শিব ঠাকুরের পূজা করতে বসেছেন, এমন সময় তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত বলে যম এসেছেন তাঁকে নিতে। যম এসেছেন দেখতে পেয়ে তিনি শিবলিঙ্গকে জড়িয়ে ধরলেন। অমনি ফেটে উঠেছে শিবের বজ্রনির্ঘোষ—"খবরদার! এ আমার আশ্রিত!" হিরণ্য-কশিপু যখন প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করল "তোর হরি কোথায় আছে? —এই স্ফটিক স্তম্ভের ভিতর?" এর উত্তরে প্রহ্লাদ যাই বললে "হাঁ", অমনি ফটাস্ ক'রে বেরুল এক নৃসিংহমূর্ত্তি। ওই যে প্রচণ্ড তেজ, এই হ'ল আমার "চণ্ডিকা"। ওই যে তেজের অভিব্যক্তি —ওই যে তাঁর জ্বলে উঠে এরূপ বুক ফুলিয়ে নেমে আসা, মায়ের এমন যে একটি ভঙ্গিমা আছে, এটিকে লক্ষ্য করে, আমরা বলি "চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।"

"কি করলে হ'বে, ঠাকুর, এরূপ প্রদীপ্ত আমার মা বলাটি" —"একে স্মরণ করতে গেলেই এরূপ তেজ ফুটে আসবে তো? এটা যে তাঁর return! এটা তো আমার বলা নয়! তা হ'লে ওই তেজটি কি রকম ফুটবে, এবার দেখে নাও। বেদ এবং এই 'চণ্ডা' ভাব—প্রচণ্ডত্ব এবং বেদময়ত্ব—এই ছুটি কথা মনে রাখবে, যখন মাকে পূজা করতে বসবে। আজ যা বললাম, এতে স্বর্গমর্ত্ত্য একসা করা আছে কি? এলেন আর নিভলেন, এইটে দেখ।

জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ তনু

'শ্রেষ্ঠ' শব্দটি = প্রশস্য + ইষ্ঠ। কিন্তু এখানে 'প্রশসা' মূল শব্দ নয়—মূল শব্দ হ'ল শ্রী; 'শ্রী' শব্দের উত্তর অত্যর্থে ইষ্ঠ প্রত্যয় যোগ ক'রে 'শ্রেষ্ঠ' শব্দটি নিষ্পন্ন করা হয়েছে। যেটি সর্ব্বোত্তম 'শ্রী', অর্থাৎ কল্যাণতম যে 'শ্রী', তাকে বলা হয় 'শ্রেষ্ঠ'। আর জ্যেষ্ঠ মানে কি? প্রশস্ত বা 'বৃদ্ধ' শব্দের উত্তর অতিশয়ার্থে ইষ্ঠ প্রত্যয় ক'রে 'জ্যেষ্ঠ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'বৃদ্ধ' হয়েছে 'বৃধ্' ধাতু থেকে। যেটা বর্দ্ধিত হয়েছে—যেটা যত ছোটই হ'ক না কেন; বৃংহন্ যার আছে,—সর্ব্বদা বাড়তে বাড়তে যেতে পারে এমন শক্তি যার আছে, এই অর্থে হয়েছে 'বৃদ্ধ' শব্দটি। যে বাড়তে পারে 'ইষ্ঠতে' অর্থাৎ Superlative degreeতে, তাকে বলি জ্যেষ্ঠ'। 'শ্রেষ্ঠ' মানে হ'ল 'শ্রীতম'; শ্রীতম এ কথাটার মানে যত কিছু যেখানে ফুটে, সবই 'শ্রী'—তাই হ'ল বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব। মোটা হিসাবে 'শ্রী' মানে হ'ল চেহারা; আর এর আসল হিসাবে মানে কি হ'ল? প্রাণের এমন একটা পূর্ণ বেগ—"নিজেই যাচ্ছি" বলে স্বয়ং দেবীর এমন একটা কামনা বা লালসা নিয়ে যে ফুটে উঠা—, সেটা শব্দ হ'ক, রূপ হ'ক, গন্ধ হ'ক, এই সবই হ'ল শ্রী, আর এই সব ফুটাগুলিকে একসঙ্গে নিলে হয় 'সমগ্রশ্রী'; "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য

বীর্য্যস্থ যশসঃ শ্রিয়ঃ।" যত রকমে তিনি শ্রীমান্ বা তনুবান হ'তে পারেন, সমস্ত নিয়ে 'শ্রেষ্ঠ' বা কল্যাণতম 'তনু' ধারণ করেন। চন্দ্র, সূর্য্য, পাহাড়, পর্ব্বত, এ সব তনুর কোন তনুটি হবে পরম শ্রেয়ঃতম তনু? যে তনুটি দেখলাম, এই চণ্ডাকে যদি দেখা যায়, তবেই শ্রেয়ঃতম তনু দেখা হবে। এ তনুটি যদি হয় 'চণ্ডা', তবে সে যে সাক্ষাৎ সর্ব্ব তনু হয়ে ফুটে,—সাক্ষাৎ সর্ব্বতনু 'শ্রী' হয়ে ফুটে,—সেইটিই হয়ে যাবে পরম শ্রেষ্ঠ তনু; একে মা বললেই সে তনুটি ক্ষুদ্র হ'লেও তৎক্ষণাৎ হয়ে যাবে "জ্যেষ্ঠ"—"শ্রেষ্ঠ"। এর চেয়ে বড় আর কেউ হতে পারে না—এর চেয়ে কল্যাণতম আর কেউ হতে পারে না। এই তনুটি যতক্ষণ না দেখতে পাবে ততক্ষণ "জ্যেষ্ঠায়ৈ স্বাহা", "শ্রেষ্ঠায়ৈ স্বাহা"—এসব বলার কোন অর্থ হবে না।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যময়ী মা

আমার উপদেশে তীব্র চক্ষু রাখলে দেখতে পাবে, সে উপদেশকে ঘুরিয়ে মা কিরূপে সর্ব্বদা একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় ফুটে উঠেন। বিজ্ঞানের যে অংশ দ্বারা বাহ্য স্থূল ভাবটি আমাদের গ্রাহ্যে আসে, তাতে মায়ের আবির্ভূতি যে রকমে তোমাদের দর্শন হ'তে পারে, এদিকে লক্ষ্য রেখে মাকে নামিয়ে নিয়ে আসছি। কত আদর দিয়ে, কত বুকভাঙ্গা ভালবাসা বুকের ভিতর থেকে বা'র ক'রে—বুকখানা নিংড়ে ফেলে—যাকে মা ভালবাসছেন, তার সঙ্গে "আমি তোমার" ব'লে লুটিয়ে পড়ার খেলা খেলছেন! এই যে মায়ের খেলাটি শিখাচ্ছি, কবে মায়ে আমরাও ঢালতে পারব এমন আদর—এমন নিবিড় ভালবাসা! যদি মায়ে কোন দিন ঢালতে পারি আর তারপর মরি—মরণ কখনও হবে না, তবু বলছি—সে মরণও আমাদের পক্ষে হবে বরণীয়।

মায়ের ঢালাই তো আজ চোখে প্রতিভাত হচ্ছে, আর "তাঁই

তো"—"তাই তো" ব'লে স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। "এই যে মা—তুমিই করছ।" এই যে কত বড় প্রাপ্তি! এই যে মাটি, একে আগে কত খেয়েছি! কিন্তু এরূপ রস তো তখন দেয় নাই! এই স্থূল জীবন নিয়ে তো কত হয়রাণ হয়েছি, আর পরিহার করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছি! এই ভাবে যে মা-ই হেয় হয়েছেন এর ভিতর, তা দেখিনি! আর আজ ভগবতী পাতাল থেকে বেরিয়ে আসছেন!

—শ্রীগুরুবাণী, বুধবার, ১৬-৯-১৯৪১

—০:*:০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মবাদ, সাংখ্যবাদ ও চণ্ডীতত্ত্ব

[চুম্বক :—ব্রহ্মবাদের ত্রিবৃৎতত্ত্ব এবং সাংখ্যবাদের ত্রিগুণতত্ত্ব। চণ্ডীর বিশেষত্ব। ত্রিবৃৎতত্ত্বের অস্পষ্টতা চামুণ্ডাতত্ত্বে সুস্পষ্টীকৃত। চামুণ্ডাতত্ত্বে ত্র্যস্ত্রধারিণী মহাশক্তি। ত্রিবৃৎতত্ত্ব ও ত্রি-অস্ত্র। খট্টাঙ্গ-ধরা কালী বা কামদা। আত্মত্ব ও ঐঁ বীজ। গুরুর পরিচয় ও কার্য্য। জগৎ আত্মারই প্রকাশ। আত্মার ঈশিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব। আত্মত্বের বা নিজত্বের জ্ঞানক্রিয়াময় মূর্ত্তি বা ভূতমূর্ত্তি। নিজত্ব বা গুরুমূর্ত্তি দর্শন। বস্ত্রানুভূতি ও ব্রজানুভূতি। 'অহং' ভাবের আশ্রয় হৃদয়। ব্রহ্মত্ব ও শক্তিত্বের দ্রষ্টৃত্ব। মহাশক্তির 'লোক' সমূহ। সাধনার উপায়—'জ্ঞান'। নিজত্বের 'কামদা' শক্তি। সর্ব্বভোগ প্রাপ্তির ঘর। পঞ্চ তন্মাত্রা ও পঞ্চভূত। 'মণি' ও 'বিশ্ব'—ভোগ ও আধার। 'মণিধরী' ও 'বজ্রিনী'—হৃদয়দেবতা ও জীবনমরণময় গতির নিয়ন্ত্রণ। হ্রীঁ বীজ ও হৃদয়। দ্বিতীয় মুক্তি বা আপ্তকামত্ব। পুনর্জ্জন্মনিরোধ কিরূপে সম্ভব। চণ্ডীতত্ত্ব বর্ণনা করবার 'অধিকারী' ঋষি—মৃকুণ্ডের পুত্র মার্কণ্ডেয়। কাল, কালো ও কালী। চণ্ডীর বিশিষ্ট শিক্ষা।]

ত্রিবৃৎতত্ত্ব ও ত্রিগুণতত্ত্ব

ব্রহ্মবাদে যে ত্রিবৃৎতত্ত্ব, আর সাংখ্যবাদে যে ত্রিগুণতত্ত্ব, এ দুটি একই জিনিষ। সাংখ্য মতে জীবচৈতন্য থেকে অনুভূতিটিকে বা'র ক'রে নিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ'—'অচেতন' ও 'চেতন'—ব'লে দুটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব দেখা যায়। প্রকৃতিকে গুণময় ও পুরুষকে নির্গুণ বলতে হয়। মাত্র চক্ষু দিয়ে জগদ্দর্শন করলেও গুণ-গুণী ভেদ চোখে ঠেকে। কিন্তু ব্রহ্মবাদে সবই একমাত্র বোধস্বরূপ-তাতে পর্য্যবসিত ব'লে তত্ত্বতঃ গুণ-গুণী ভেদ নাই। এই মতে জগৎ ব'লে যা কিছু গ্রাহ্য সমস্ত আত্মারই ত্রিবৃৎমূর্ত্তি। এক পরমতত্ত্ব রয়েছেন, যিনি নিজেই নিজেকে ত্রিবৃৎ ক'রে তুলেন। সাংখ্যবাদের ত্রিগুণতত্ত্ব এবং ব্রহ্মবাদের ত্রিবৃৎতত্ত্ব—এ দুটাই চণ্ডীর ভিতর গৃহীত আছে। এই উভয় তত্ত্বকে ঢাকা দিয়ে আর একটি রহস্যবিদ্যা দ্বারা ওই পরমতত্ত্বটিকে মুড়ে নেওয়া হয়েছে। চণ্ডীর বিশেষত্বই হ'ল এই 'রহস্যবিদ্যা'। এই রহস্যবিদ্যার মূল কথাটা হ'ল, তিনি এই হ'লেন—এই হ'লেন—এই হ'লেন, ইত্যাদি। একরস এই পরমতত্ত্বে এক অপূর্ব্ব শক্তি বা রহস্যবিদ্যা নিহিত আছে, যার বলে তিনি স্বয়ং ত্রিবৃৎ হয়ে এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করেন। খালি—এই হ'লেন—এই হ'লেন—এই হ'লেন এই কথাটি শুধু জানলে হবে না, তিনি স্বয়ংশক্তি ব'লে যেরূপ শক্তি প্রভাবে এই হ'লেন,—এই হ'লেন, সেই পরমা শক্তিকে দেখতে হবে। এই কথাটি আর কোথাও বলা হয়নি, বলা হয়েছে শুধু চণ্ডীতে। স্বয়ংশক্তি আত্মার এই পরমা শক্তি বা রহস্য বিদ্যাই 'চামুণ্ডা'। চণ্ডীখানা ইঁহারই সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক মহিমা বা লীলায়ন বর্ণনা।

চণ্ডীর বিশেষত্ব

ব্রহ্ম সৎস্বরূপ ছিলেন ; তাঁ থেকে তিনি তেজোময়, প্রাণময় ও অন্নময় হ'য়ে হ'য়ে জগৎমূর্ত্তি ধারণ করলেন—বেদান্তের বক্তব্য হ'ল

এই। আর সাংখ্য যখন বলছে, আত্ম ও অনাত্ম এই দুটি তত্ত্বের সংযোগেই যা কিছু সব হচ্ছে, তখন সাংখ্যবাদ আরো ঝুলে পড়েছে। ব্রহ্মবাদের কথা হ'ল, ব্রহ্ম যখন সম্ভূতিময় পুরুষ, তখন তিনি নিজেই শক্তি; অর্থাৎ নিজেই নিজের শক্তি এবং সেই শক্তি প্রভাবেই তিনি সব হয়েছেন ও হচ্ছেন। কিন্তু সেই শক্তির বৈশিষ্ট্যটি কিরূপ, এ কথাটা ব্রহ্মবাদে কোথাও সুস্পষ্ট ক'রে বলা হয়নি। ব্রহ্ম বা পরমাত্মত্ব যে স্বয়ংশক্তি, এ কথা তো চণ্ডীতে বলা হয়েছেই, আর অধিকন্তু বলা হয়েছে সে শক্তির বিশেষত্ব, যে শক্তির প্রভাবে ব্রহ্ম অধিদৈব, অধিভূত ও অধ্যাত্ম—এই ত্রিবৃৎ হ'ন। তিনিই তেজ, তত্রাচ এই তেজ হ'ল তাঁর একটি বিশিষ্টতা। তিনি প্রাণ বটে, তত্রাচ প্রাণ হ'ল তাঁর একটি বিশিষ্টতা। তিনি মনই বটে, তত্রাচ মন হ'ল তাঁর এক বিশিষ্টতা। তিনি হ'লেন নিজেই বটে, কিন্তু কোন্, বিশিষ্টভাব নিয়ে হ'লেন, সেইটার উল্লেখই হ'ল চণ্ডীর বিশেষত্ব। স্বয়ংশক্তি ব্রহ্মের এইরূপ 'অস্ত্র' সাজাই তাঁর শক্তির বৈশিষ্ট্য। এই শক্তিরই নাম হ'ল '**চামুণ্ডা**'। ওই যে ত্রিবৃৎ শক্তি—তা' দ্বারা ব্রহ্ম যত রকম মূর্ত্তি ধরতে পারেন ধরেছেন; কিন্তু এর ভিতর যে general principleটি কাজ করছে তারই নাম হ'ল চামুণ্ডা। সর্ব্বত্রই ঐ এক ব্যাপার চলছে। যেখানেই যাও ঐ মহাশক্তিই ত্রিবৃৎরূপে অস্ত্র পরিচালনা ক'রে জন্ম-স্থিতি-লয়, মুক্তি-বন্ধন—সব নিয়ন্ত্রণ করেন। যা দ্বারা এই নিয়ন্ত্রণ চলে, সেটি তিনটি অস্ত্র মাত্র নয়—এ হ'ল এক ত্রি-অস্ত্রধারিণী শক্তি। তিনটি অস্ত্র কি কি? 'অসি', 'পাশ' ও 'খট্ট', অর্থাৎ কেটে ফেলা, এক একটি চেহারা নিয়ে ধ'রে রাখা বা বেঁধে নেওয়া, এবং তার সংহরণ মূর্ত্তি তৈরী করা।

বেদান্তে যা 'অন্ন' তার মানে হ'ল মূর্ত্তি; মূর্ত্তি তৈরী হওয়া মানে একটা ভোগ্য জিনিষ তৈরী হওয়া। বেদান্তে যা 'জল' তার মানে হ'ল প্রাণ। বেদান্তে যা 'তেজ' তার মানে থাক্। বেদান্তে

যার নাম 'প্রাণ', শক্তিতন্ত্রে তাকে বলা হয় 'পাশ'; বেদান্তে যার নাম 'তেজ', শক্তিতন্ত্রে তাকে বলা হয় 'অসি' বা ক্ষেপন; বেদান্তে যা 'মন' বা 'অন্ন' বা 'মূর্ত্তি', শক্তিতন্ত্রে তার নাম 'খট্টাঙ্গ'। 'খট্টাঙ্গ' মানে হ'ল খাটো বা ছোট অঙ্গ—একটা miniature formation বা অঙ্গ। তা হ'লে 'কালী' হলেন অসি, পাশ ও খট্টাঙ্গধরা। ইহা বলাও যা, এক মহাশক্তি ত্রিবৃৎ রকমে খেলা করেন, এ বলাও তাই। তেজ, জল আর অন্ন—যে মহাশক্তি এই তিন রকম অস্ত্র চালনা করেন তাঁর নাম **'চামুণ্ডা'**। তাই চামুণ্ডা তত্ত্ব বর্ণনা করিতে গিয়ে ঋষি বল্লেন "ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ।" ইনি ঐঁ, অর্থাৎ আত্মস্বরূপ, নিজেই নিজেতে প্রকাশ হচ্ছেন; ইনিই হ্রীঁ, অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ বা হৃদয় স্বরূপ; আবার ইনিই ক্লীঁ, অর্থাৎ 'কামদা' বা অন্নদা। ক্লীঁ আর ক্রীঁ—'কামদা' ও 'রতি' প্রায় একই কথা। রতির ভিতর যা আছে, তা ছড়িয়ে বা বিশ্লেষণ ক'রে ধরার বা ফুটাবার যে শক্তি, তার নাম **'কামদা'**।

আমিত্ব ও ঐঁ বীজ

জ্ঞান স্বরূপতা বা চেতন স্বরূপতা হলেন 'গুরু'। আত্মাই গুরু হবেন কেন?—চেতনাই সমস্ত দেখিয়ে দেন ও পাইয়ে দেন। আবার গুরুর কাজ সমস্ত দেখিয়ে দেওয়া ও পাইয়ে দেওয়া। সুতরাং চেতনার প্রথম মূর্ত্তি হ'ল গুরুমূর্ত্তি। এসব যে তিনি বা'র থেকে কুড়িয়ে পাইয়ে দেন, এমন নয়; ভিতরে যা কিছু আছে তাই পাইয়ে দেন। সুতরাং ঐঁ হ'ল আত্মত্ব—এ চাই একেবারে! এর প্রধান জিনিষ হ'ল সব প্রকাশ। মাটি, জল, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য—এসব নিজত্বেরই প্রকাশ, আর কারও নয়। এ গুলিকে আত্মত্বে স্থাপিত ক'রে দেখ। আত্মতত্ত্বকেই দেখছ—এমন ক'রে নিজেতে অনুভূতি হ'লেই জ্ঞান ঠিক হ'ল। মহান্ আত্মার ভোক্তারূপ অংশ হ'লে তুমি।

এখন তুমি যদি তোমাতে আত্মত্বকে বা নিজত্বকে দেখতে পাও তবে সেই মহান্ আত্মা ও তার টুকরো তুমি—এইত হ'ল জগৎ! দার্শনিকের তর্কে ভুলো না। জগৎকে আত্মারই প্রকাশ ব'লে দেখ। আত্মত্বে নিহিত আরও ধর্ম্ম আছে—এই নিজত্বটা যেন চতুর্দ্দিক থেকে যত কিছু আত্মজ্ঞানের মূর্ত্তি, তা'দ্বারা ঢাকা বা মোড়া; যথার্থ কর্ত্তা হ'ল আত্মাংশ। যেখানে যে কেউ আত্মত্বকে ভোগ করে, সে "আমি আত্মা— আমি "আত্মা" ব'লেই ভোগ করে! আত্মা যে আবার ভোগ্যও হয়, এ দর্শনটা নিজত্বকে দেখলে আপনিই এসে যায়। গুরুই জানিয়ে দেন, যত কিছু ফুটেছে সবই তোমার নিজের মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তবে কি মনে হবে 'আমিই ঈশ্বর'? একটু স্থির হ'লেই পরে দেখবে যে তুমি আর ছোট নও—তুমি মহান্! তোমার প্রথম অবলম্বন হ'ল তোমার জগতে যত রকম বা যা কিছু আছে সব নিজেই—নিজেকে ছাড়া আর কা'কেও দেখছ না। ঐ প্রকাশ আরও ফুটে উঠবে। যোগশাস্ত্রের সমাধি লক্ষণ যদি দেখ, তা হ'লে এ কথাটি বুঝতে পারবে। যোগশাস্ত্রমতে কোন বস্তুর ইতিহাস জানতে হ'লে, সে বস্তুর মূল থেকে যা কিছু, নিজেই সে সবটা হয়ে যেতে হয়। কবে কোথায় জন্মেছে এক বৃক্ষ, তার স্থূল পরিস্থিতি পর্য্যন্ত নিজে হ'তে হ'লে তোমাকে বোধ করতে হবে তুমিই সেই গাছ। তখন তোমার নিজত্বে বৃক্ষটির সমগ্রত্ব ইতিহাস আকারে ফুটে উঠবে। এরূপ যদি বিশ্ব দেখ তবে তোমাতে সর্ব্বজ্ঞত্ব ফুটে উঠবে।

এ জগতে যা 'পর' ব'লে দেখছ, তা প্রকৃত vivid নয়—তার উপরের ছালটা মাত্র দেখছ। এর পূর্ণ প্রত্যক্ষতা দেখতে হ'লে নিজেকেই দেখছ, এই বোধে জাগ্রত হ'তে হবে। কি মূর্ত্তিতে নিজেকে দেখছ? নিজেরই জ্ঞানক্রিয়াময় মূর্ত্তিতে। যা কিছু গড়া এসবই জ্ঞানক্রিয়া; ভূতমূর্ত্তি জ্ঞানক্রিয়ার ভূতভাবোদ্ভবকর মূর্ত্তি অর্থাৎ

ভূতভাব উদ্ভব করতে পারে এমন যে জ্ঞানরূপ কর্ম্ম বা জ্ঞানক্রিয়ার চেহারা। কোন ক্রিয়া বা গতি প্রকাশিত হ'লে তার ফলস্বরূপ যা পরিলক্ষিত হয়, তাই ভূত; যেমন অগ্নিকে চক্রের আকারে ঘুরালে যে আলোময় এক পরিধি রচিত হয়, সেটাই একটা ভূতের চেহারা।

বজ্রানুভূতি ও ব্রজানুভূতি

গুরুর প্রথম আদেশ হ'ল, আগে গুরুমূর্ত্তি দর্শন কর। খোসামুদির প্রথম কাটান-ছাটান হ'য়ে গেল তবে এখানে। স্ত্রী, পুত্র, আকাশ, বাতাস, বিদ্যুৎ—এ সব কা'কে দেখছ? নিজেকেই। কি জাগরণে, কি স্বপ্নে, কি নিদ্রায়—সর্ব্বাবস্থায় নিজেকেই। খালি আমাতেই নয়—এতে, ওতে, তোমাতে, আমাতে সর্ব্বত্র নিজেকেই। তা হ'লে নিজত্ব এত সর্ব্বব্যাপী! সবারই 'নিজে' বলে একটা entity আছে। চেতন, অচেতন, স্থাবর, জঙ্গম—যেখানে যা আছে বা জন্মেছে, সেই 'নিজের' বজ্রানুভূতি আছে সবাকার। বজ্রানুভূতি' কেন বললাম? নড়চড় হয় না, যেমন হয় ব্রজানুভূতিতে অর্থাৎ আচরণময় 'অনু' ই বা অনন্বিত জ্ঞানে। 'আত্মজ্ঞান' ও 'অচেতন জ্ঞান' বলাও যা, বজ্র ও ব্রজ বলাও তাই। সর্ব্বত্র এ জ্ঞানটা যতই আসতে থাকে, তার কি রকম উপলব্ধি হয়? দ্বিতীয় আর কেউ নাই। তুমি ব'লবে, তা তো বটেই। কিন্তু ভোগাত্মক কি হয়? এ উপলব্ধি হ'লে সব আমাতেই ব'লে প্রাণটা কি ফুলে উঠে না? "হাম বড়িয়া" এই অহঙ্কার কেন জন্মায়? পুঁজি এলে ঢেউ উঠে তো? আর চেপে রাখতে না পারলে আন্দোলন তোলে। হৃদয় থেকে তবে অহঙ্কার জন্মায়। হৃদয় হ'ল পূর্ণ প্রাণবত্তা বা ব্যাপ্তি। যত ব্যাপ্তি সবটা নিজেরই ব্যাপ্তি—এ যত ব'লবে, নিজের প্রাণবত্তা ততই জেগে উঠবে। সুতরাং নিজত্ব 'অহং' জন্মাবার আশ্রয় বটে। একে যেমনি develop করলে, অমনি হ'য়ে উঠল ব্যাপ্তিময় বিশ্বরূপ, আর তুমি transformed হ'য়ে গেলে বিষ্ণুত্বে।

নিজত্বের প্রকাশ

যখন ব'ল্‌লে নিজেরই চেহারা দেখছি, তখন তুমি ব্রহ্মত্বের দ্রষ্টা; আর যখন ব'ল্‌লে দেখছ 'নিজেই সব' তখন তুমি শক্তিত্বের দ্রষ্টা এবং বিষ্ণু হ'য়ে বিষ্ণুলোকে ঢুকে পড়লে। তোমরা পড়েছ ঋষিরা বসে বসে কথা কইছিলেন, হঠাৎ ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন, আবার হঠাৎ বিষ্ণুলোকে চলে গেলেন। তোমরা বল এসব গাঁজাখুরি কথা; কোথায় ব্রহ্মলোক আর কোথায় বা বিষ্ণুলোক—যে বলা মাত্রই সেই সেই লোকে চলে গেলেন! বলা মানেই তাই হ'য়ে যাওয়া আর তার নামই বিষ্ণুলোক বা শিবলোকে চলে যাওয়া। তোমরা যেমন একদেশ থেকে কল্‌কাতায় এলে, আর দেশের হাবভাব ভুলে গিয়ে কল্‌কাতার হাবভাবে ঢাকা পড়ে যাও, আর কল্‌কাতাবাসী ব'লে বলতে বাধ্য হও এবং তোমাদের আচার ব্যবহারও কল্‌কাতাবাসীর মতই হ'তে থাকে, শিবলোক, বিষ্ণুলোক প্রভৃতি লোক লোকান্তরে শক্তিবলে যাতায়াতের ব্যাপারটিও এইরূপই। মহাশক্তির লোক সকল তোমার অন্তরে লুকিয়ে আছে। গুরু প্রকাশ সেই লোকে তোমাকে প্রবেশ করিয়ে তদ্বৎ ভোক্তা করিয়ে দিচ্ছে; তোমাকে তাই দেখতে হবে—'আমি বিষ্ণু', 'আমি শিব'। ঐরূপ দেখা মানে সেই সেই লোকে ঢুকে পড়া।

'জ্ঞান বল্‌লে চক্ষু স্থির করা, প্রত্যাহার করা—ওসব কিছু নয়। আসল কথা হ'ল just to know—শুধু জানা। যাঁহাতক ভাল ক'রে জানছ অমনি ঢুকে যাচ্ছ। ধ্যান, ধারণা—ওসব আবরণ মাত্র। ওগুলি সাধনা নয়। সাধনা হবে জানাটুকু। ওরকম কর আর না কর তাতে কিছু এসে যাবে না; তবে এসে যাবে, যদি জান আর না জান।

নিজত্বের হৃদয়মূর্ত্তি

আত্মত্ব সম্বন্ধে কি পরিচয় দিতে পার? যাহা দ্বারা জানছ কোথায় ঢুকেছ!—ব্রহ্মা বিষ্ণুর এ পাশটা হ'ল—যা-কিছু সব নিজেই হই।

তা হ'লে আমিই আমার পক্ষে কামদ। আমার যদি থাকে রূপের কামনা, আর সে রূপ যদি হয় সূর্য্যমূর্ত্তি, তবে সে কি রূপের কামনা দিবে না? আমার যদি ধনের কামনা থাকে, তবে আমার লক্ষ্মী মূর্ত্তি কি ধন দিবে না? তেমনি প্রাণ, মন সিদ্ধি, শান্তি—যা কিছু সমস্তের প্রাপ্তিই এইরূপে নিজত্বে সম্ভব। "যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্।" (ছান্দোগ্য)

সেদিন বলছিলাম এই তত্ত্বেরই কথা। রূপ দেখলাম মানে নিজেতে রূপের প্রকাশ দেখলাম। নিজেতেই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের অনুভূতি রয়েছে, অথচ বা'র করতে পারছ না; অথচ বিজ্ঞানটা এই যে এখানেই সব পেতে হবে—পেলাম না, এ হবে না। বিষ্ণুত্বের লক্ষণ হ'ল ঘরে বসেই সব দেবে। ঐ যে নারায়ণ আমার দহরাকাশে বাস করছেন, ইনি আমায় সব দেবেন, যা কিছু আছে। যা কিছু আছে তাকে ভাগ করা হয়েছে—শব্দাত্মক, রূপাত্মক, গন্ধাত্মক, রসাত্মক ও স্পর্শাত্মক ব'লে। জ্ঞানালোকের দিক থেকে বল, আর শক্তির দিক থেকেই বল, সবই এই পাঁচ রকম বিভাগে বিভক্ত।

বজ্র ও মণি

'জানা'র একপাশে আত্মবোধ আর অন্য পাশে তন্মাত্রাবোধ—এক সীমায় নিজবোধ, আর এক সীমায় পঞ্চতন্মাত্রাময়ত্ব। পঞ্চতন্মাত্রা জ্ঞান, থেকেই পঞ্চ ভূত হ'য়েছে। যেমন দুধ থেকে সর তুলে খাও, আখের রস থেকে চিনি তুলে খাও, তেমনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ তোমাতেই রয়েছে—নিজেতেই রয়েছে। যেটি যখন ফুটে, তা তুলে তুলে খাও! দুধ থেকে মাখন তুলে তুলে খাচ্ছ, এখানে দুধ হ'ল 'বজ্র'; আর তুলে যে টুকু খাচ্ছ, সে টুকু হ'ল 'মণি' অর্থাৎ অগ্রভাগ। এই তন্মাত্রায় তোমার লিঙ্গ শরীরের গঠন; ঐটিকেই ভোগ করছ। বাইরে যে এত বড় পৃথিবী তার সারাংশ

গন্ধভাবে পাচ্ছ। গন্ধ হ'ল্ল তরল বায়বীয় অনুভূতি ; এই গন্ধই স্থূল মূর্ত্তি ধরেছে পৃথিবীরূপে। আর স্পর্শ ব'লে কে একটু ছুঁয়ে দিলে, তাই এ বিপুল বায়ু। আর চক্ষু, এ ঐ সূর্য্য। সূর্য্যই ঐ চক্ষুরূপ সবটুকু দিয়ে তোমায় ঢেকে রেখেছে—দুধের উপর যেমন সর ভাসে। এই যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, যা থেকে সব ভোগ হচ্ছে—এই ভোগে যেটা তার সারাংশ, সেটা পর্য্যন্ত দেখতে হবে। সূর্য্য তোমার হৃদয়ে খালি রূপটি নয় ; পৃথিবী তোমার হৃদয়ে খালি গন্ধটি নয়। এরূপ যখন দেখবে, তখনই তুমি আস্বাদন পাবে। "ও বাবা, সত্য খালি অনুভূতির দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ওটা মাত্র ত অনুভূতি নয়—মাত্র দুধের সারাংশটুকু নয়। বিশ্বদুধ টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটছে! সমগ্র দুধের কড়াটা যেখানে আমার সঙ্গে ঠেকেছে, এ সবটাই যে আমার হৃদয়!" এ যদি হয় তোমার হৃদয়দেবতা, তবে তাতে ঢুকে, যা বলবে তাই তো পাবে! সূর্য্য যখন হৃদয়স্বরূপ পরম দেবতার প্রকাশ, তখন সূর্য্যের ভিতর যে ধন আছে, সে সব ধন সূর্য্য থেকে পাওয়া তোমার কাছে কিছু নয়। এগুলিকে বল্লে 'মণি'। সূর্য্য 'বজ্র' আর চক্ষু 'মণি' ; দিক্‌ 'বজ্র', কর্ণ 'মণি' ; পৃথিবী 'বজ্র', গন্ধ 'মণি' ; বায়ু 'বজ্র', স্পর্শ 'মণি'। তা হ'লে যখন বলি 'মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে মাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা', এখানে 'প্রতিসর' মানে কি? প্রলয়, বাঁচা থেকে মরা ও মরা থেকে বাঁচা, এ দুইই প্রতিসর। এ দু'য়ের যাতায়াত থেকে আমায় রক্ষা কর। মণিধরী যদি হয় হৃদয়, আর বজ্রিণীও যদি হয় হৃদয়, তবে তো আমার যাতায়াত মায়ে ছাড়া আর কোথায় নয়! এ জন্য বললাম ওগো মনিধরি! ওগো বজ্রিণি! তুমি এমন ভাবে ফুটে উঠ যেন আমার জীবনময় ও মরণময় গতিটা আর না চলে—যেন সেটা ভুলে যাই। এই হ'ল প্রথম মুক্তি বা প্রকৃতি মুক্তি।

ত্রিগ্রন্থি ভেদ

'হ্রীঁ' হ'ল হৃদয়। একে জানার চরম ফল কি?—সর্ব্বপ্রাপ্তি। এরূপ পাওয়া যায় ব'লে হৃদয়ে মুক্তির নাম দ্বিতীয় মুক্তি বা আপ্তকামত্ব। ব্রহ্ম গ্রন্থি ভেদ করতে পারলে পুনর্জন্মনিরোধ হ'য়ে যায়; হৃদয় গ্রন্থি ভেদ করতে পারলে আপ্তকামত্ব আসে; আর রুদ্র গ্রন্থি ভেদে 'সাযুজ্য' এসে যায়—জীবত্ব আর দেখা যায় না। পুনর্জন্মনিরোধ মানে পরাধীনভাবে আর জন্ম হবে না। যখন নিজেকে through and through জ্ঞানময় দেখি তখন 'ভুত' আর ঈক্ষণে আসবার রাস্তা নেই। এই মুক্তির ভিতর আর একটা কথা আছে—intellectually বুঝেছি কিন্তু তাতে স্থিতি হচ্ছে না। কিন্তু intellectually বুঝাই হ'ল ব্রহ্মক্ষেত্রের সাধনা। তাতে দাঁড়াতে পার কি না পার তাতে কিছু এসে যায় না। কথা গুলি খালি মস্তিষ্কে নিঃসংশয়ভাবে নিতে পার তো আর ভূত হয়ে জন্মাতে হবে না। হৃদয়ে গেলেও তখনও বিশেষভাবে দাঁড়াতে পারবে না; কেন না, কর্ম্মগ্রন্থি ভেদ না হ'লে, বিজত্বে দাঁড়ান যায় না। হৃদয়রূপী গুরু বলছেন—খালি নিজেতে সব কিছু বা'র ক'রে ভোগ কর। যদি এই বলে স্বীকার করতে পার 'তাই তো! এই যে রয়েছে', তা হ'লে গুরু বলবেন, ঠিক হয়েছে। এসব স্তর মুক্তি তত্ত্বের। জানা না থাকলে এসবের কোন মানে নেই। এসব জ্ঞান এখন লোপ হ'য়ে গেছে পৃথিবী থেকে। এই হৃদয় তত্ত্ব হ'ল ব্যক্ত হৃদয়; আর এই যে 'ভূত' 'ভূত' করছ এও ব্যক্ত হৃদয়। যথার্থ গ্রন্থি ভেদ হয় শুম্ভনিশুম্ভবধে। এ দু'টায় (ব্রহ্মগ্রন্থি ও বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদে) খালি ব্যক্ত অংশের সামঞ্জস্য হবে, রুদ্র গ্রন্থিতে বসে এ সব ভেদ হবে; তখন আর নালিশ করবার কিছু থাকবে না যে, জানলাম না, অথচ ঘুরপাক খেতে হচ্ছে কেন? Intellect ক্ষেত্রে পুনর্জন্ম নাশের অবস্থা আসছে? Believe it. তাঁ'দ্বারা অরি

মাটি দেখতে জন্ম হবে না। যদি দেখ তো গুরুর দোষ নেই। 'এইটি কেন?' এরূপ যত বলবে, তত ঘুরবে। এই জন্য একটা কথা এনে, এত রকম ক'রে ওলট পালট ক'রে বলি।

চণ্ডীর ঋষি মার্কণ্ডেয়

মহাচণ্ডিকা যে ঋষির বুকে, তার নাম মার্কণ্ডেয়। যেমন ধানকে কাঁড়ে উদূখলে, তেমনি যে ঋষি মৃত্যুকে কেঁড়ে জীবন বা'র করেছেন, সেই ঋষিই চণ্ডীর বর্ণনা করতে পারেন। চণ্ডী' বললেই 'চণ্ডী' হয় না. 'চণ্ডী' শুনলেই 'চণ্ডী' হয় না, 'চণ্ডী' লিখলেই 'চণ্ডী' হয় না। যেটা মৃত্যু, যেটা অন্ধকার ব'লে আশঙ্কা হচ্ছে, সেটা ধামাচাপা দেবার জিনিষ নয়। অথচ মরণটাকে যে ছেঁটে ফেলে দিতে শেখার কথাটা—সেটাকে ভাষ্যকারেরা ধামাচাপা দিয়েই চলেছেন। ওকে boldly face করতে হবে—কাঁড়তে হবে—ছাঁটতে হবে—তার ভিতর থেকে 'মা'কে বা'র করতে হবে। এটি যে করতে পারে, সেই 'চণ্ডী' বলতে পারে, দিতে পারে, শেখাতে পারে! সেই হ'ল চণ্ডীর ব্যবস্থাপক।

কাল, কালো ও কালী

এই বিশেষত্বটুকু দেখাবার জন্য বলছি, যেটা 'কাল' বলে ঠেকেছে সাংখ্যবাদীর চোখে, বেদান্তের চোখে সেটাই ঠেকেছে যেন এমন একটা কিছু আছে, যার নাম 'কালো'। ওই কালোটাই হ'ল 'মা'। এর নাম মরণকে কেঁড়ে জীবন বা'র করা। ওই কালোটাই চণ্ডীর ঢাকুনি। যেটাকে দেখে সাংখ্যকারেরা ভয় পেয়ে 'কাল'- ব'লে বর্ণনা করেছেন, আর শঙ্করাদি ভাষ্যকারেরা 'অনাত্ম' বা 'মায়া' ব'লে এসেছেন. সেটা ত্রিবৃৎতত্ত্বের ভিতর যে ব্রহ্মতত্ত্ব রয়েছে—তাই। এটা ততক্ষণ বুঝা যাবে না, যতক্ষণ না ওই ঢাকুনিটা উঠবে—যতক্ষণ না মৃত্যুকে জীবন ব'লে ভোগ করা

যাবে। 'কাল' বলে যেটা ঠেক্‌ছে, সেটাকে যতক্ষণ না 'কালী' ব'লে, ব'লে উঠতে পারবে, ততক্ষণ তুমি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নও নিশ্চয়ই। ওই কালোটা যতক্ষণ না টকটকে রাঙ্গা মা হয়ে উঠবে ততক্ষণ ওই ঢাক্‌নিটি—মায়ের আবরণটি—খোলা হবে না।

ব্রহ্মবাদ, সাংখ্যবাদ, আর তার উপর চণ্ডীর চণ্ডীত্ব এই তিনটি তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। 'কালো' অর্থাৎ negativity সব জ্ঞানকে negatived ক'রে ছেড়ে দেয় যেখানে অন্ধকার, আর চোখ ঠেকে না। ভূত যেমন কালো—তামসী, ওটাও তেমনি কালো; সেখানে সে কালো মেয়ে—সেখানে সে আনন্দময়ী; আর তা না দেখলে এখানে শুধুই কালো। শুধু 'কালো' না দেখে তোমার আত্মাকেই যে কালো ক'রে তোলে, তাকেই দেখ।

চণ্ডীর specific অংশটা ব'লে দিলাম। এটি বড় দামী—বড় রহস্যময়। একথাগুলি সব পেটের ভিতরেই রাখবে।

—শ্রীগুরুবাণী, রবিবার, ১৩-২-১৯৪১

—০ঃ*ঃ০—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিজবোধ ও চণ্ডীতত্ত্ব

[চুম্বক—ত্রিমূর্ত্তিময়ী ভগবতী। নিজবোধের প্রস্ফোটন বিজ্ঞান ও নামরূপাত্মক ক্রিয়া। এই ক্রিয়াকে বা শক্তিপ্রবাহকে নিজত্বে পুনঃ প্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়ার উপায়। ভগবতীর সাড়া কিরূপে পাওয়া সম্ভব। নিজবোধ ও আমিত্বের মধ্যে প্রভেদ। নিজত্ব কখন বরণীয় ব'লে গৃহীত হয় এবং সাধককে বরণ করে। নিজত্বের

মধ্যে তত্ত্বসমূহের আনন্ত্য। নিজত্বের বিশ্বন্তর মূর্ত্তি দর্শন। নিজ বোধকে সর্ব্বস্ব ব'লে ও মহান ব'লে গ্রহণ বা স্বীকৃতিই মুক্তির পথ। অচেতনকে চিন্ময়ীরূপে দর্শনই অমরত্ব লাভের উপায়। চণ্ডীতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য। নিজবোধরূপী দেবতার জন্ম-মৃত্যু-নিয়ন্তা মহাকাল মূর্ত্তি। অনুভূতি ও সম্ভূতি মূর্ত্তি। আপ্তকামত্ব কখন সম্ভব? ব্রহ্মতত্ত্বে প্রবেশের অনধিকার। ভগবতীর পদদ্বয়। অচেতনে জ্ঞানমূর্ত্তি ও জ্যান্ত ভগবতী দর্শন। নিজচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের অভেদ-দর্শয়িতা গুরুশক্তির বিকাশ। নিজচৈতন্যই সর্ব্বপ্রাপ্তির ভূমি।]

ত্রিমূর্ত্তিময়ী চণ্ডিকা

শুধু চেতনাকে দেখতে গেলে দেখি, ইনি এক অনির্ব্বচনীয় বোধ স্বরূপ তত্ত্ব। তিনি আপনাকে যেমনি বোধ করেন, অমনি তিনটি জ্ঞান ক্রিয়ার মূর্ত্তি ফুটে উঠে:— (১) জানার 'হওয়া' ক্রিয়ামূর্ত্তি অর্থাৎ 'ব্রহ্মা', (২) জানার 'ভোগ' ক্রিয়ামূর্ত্তি অর্থাৎ 'বিষ্ণু', (৩) জানার 'কর্ত্তা' বা 'নিয়ন্তা' মূর্ত্তি অথবা 'মহেশ্বর'। এই তিনটিকে সমষ্টি ক'রে নিলে হয় ভগবতী। কিন্তু শুধু সমষ্টি নিলে তাতে অধিরূঢ় হওয়া যায় না। তার উপর থাকা চাই ওই তিনটি aspect বোধ বা দেবতা বোধ। এতে কি ক'রে অধিরূঢ় হতে পারি, এইটা দেখবার জন্য ঐ ভাবে বিভাগ ক'রে দেখি। কিন্তু এর ভিতর কোন দেবতাই আলাদা আলাদা নয়। সবাই সেখানে আছে—একই জিনিষ অথচ তাতে সমস্ত সংন্যস্ত। আমরা ক্রমদর্শী পুরুষ ব'লে যেদিকে চোখ পড়ে সেইটাকে নিই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ব'লে আলাদা আলাদা কোন উপাস্য নেই। 'এই একটি দেবতা, একে ধরি,—ওই একটি দেবতা ওকে ছাড়ি'—যতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থা, ততক্ষণ এই ভাবনা যে দেবতাই বল, সব একেরই অন্তর্গত।

নিজবোধের প্রস্ফোফন

চেতন বা অনির্ব্বচনীয় বোধতত্ত্বের ফুটার দিকটা দেখলে, এবার এর বিজ্ঞানটা দেখ। যেখানেই হ'ক চেতন বিলাস ওই তিনটা aspect (দিক) না ফুটিয়ে খেলা করে না। একটি আলো জ্বললেই heat (তাপ), light (আলো) এবং motion (গতি) একসঙ্গে হয়। নিজবোধ বা আত্মত্ব এমনই জিনিষ যে সে ঐরূপে আলাদা হ'য়ে ফুটেও একই আছে। তুমি নিজে ভাত খাচ্ছ; তার মানে কি এই যে তখন তুমি বাড়ী-ঘর-দোর ছেড়ে ফেলে দিয়ে এসেছ? এটি এই নিজবোধেরই আলাদা হওয়া অথচ যেমন তেমনি থাকা। 'ভাত-খাওয়া আমি' এবং 'ঘুমানো আমি' এ উভয়ই এক, অথচ এক নয়। এগুলি functional (ক্রিয়াবিষয়ক) ব্যাপার; যত বিভিন্নতা কেবল ক্রিয়ার। বিচার করতে বসলে দেখি, এসব বিভিন্নতা কেবল ঐ চেতনারই নাম-রূপ ক্রিয়া। "বাচারম্ভণম্ বিকারনামধেয়ম্ মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্।" (ছান্দোগ্য) ক্রিয়া করছি, চেহারা ধরছি, তদ্ভাবময় হচ্ছি, আবার যেমন তেমনই আছি। তোমার চেতনায় সত্য সত্যই এসব হচ্ছে কিনা দেখ। চেতনাতে এই শক্তিকে প্রবেশ করিয়ে দিবার জন্যই চেষ্টা করতে হবে। যা কিছু শুনছ, বুঝছ বা লিখছ. এটা চেতনাতে লাগাতে না পারলে, এই শুনা বুঝা বা লেখা—সব অবিদ্যা হয়ে গেল। হাজার চিন্তা বা গবেষণা কর—কিছু হবে না; লাগাতে হবে শিবে। এমন লাগাতে হবে যেন তোমার ব্যবহার শুদ্ধ তাতেই হচ্ছে, এ বুঝতে পার। তোমার কর্ম্মময় জীবনে সেটা লাগিয়ে লাগিয়ে চল্‌তে পারছ কিনা, এইটা দেখতে হবে। এইটা করবার জন্য ব'লে দিয়েছি, বিষ্ণু বলতে গিয়ে তোমার চেতনা যদি বিষ্ণুই হ'য়ে উঠে, তবেই সে তোমার পূজ্য, নচেৎ তার কোন মূল্য নেই। সেইরূপ ব্রহ্মা বলতে গিয়ে তোমার চেতনা ব্রহ্ম হ'লেই সে

তোমার পূজ্য, নচেৎ নয়। 'নমঃ শিবায়' বা 'নমঃ দুর্গায়ৈ' বলতে গেলে তোমার প্রথম কাজই হ'ল বলা 'ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব'। বীরের মত এখানে দাঁড়াতে হবে; তবেই চামুণ্ডাতত্ত্বের একটু সাড়া পাবে। শিকেয় তুলে রাখা ভগবতী নয়! সারাদিন যা খুসী করলাম, সন্ধ্যাবেলা তাকে নামালুম, একটু তেল হলুদ মাখিয়ে চক্‌চকে ক'রে নিলাম,—এ করা যেন, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। ঠিক ঠিক যদি লাগাও ত' দিনগত পাপক্ষয় হয়। তবে হাতে নিয়েও যদি হাতড়াতে হয় তো সব গেল! কিন্তু যখনই তাকে নামাও, তখনই ভগবতীকে যদি definite (নির্দ্দিষ্ট) করতে না পার, তবে সে ভগবতী তোমাকে মুক্তি দিতে পারবে না। ভগবতী definite হ'লে তুমি বলবে 'তোমা থেকে নিজবোধে ফুটে-ছিলাম এখন দেখি আর নিজেকে খুঁজে পাই না। হাত পা চোখ মুখ প্রাণ—সব তোমার হ'য়ে যায়, অথচ আমি ব'লে যে সুখ, তা' আছে; খানিকটা বঞ্চিত আছি আমি—এমনটী হবার যো নেই; তবুও বিশ্বম্ভর যদি না হই, তবে আমার হওয়া ঠিক হ'ল না। এই ব্যাপারে হাতী ঘোড়া কিছু নেই। তুমি নিজবোধকে খালি আমিত্ব দিয়ে ঘিরছ। 'নিজবোধ' আর 'আমি'র মধ্যে প্রভেদ হ'ল এই যে 'নিজবোধ' দাতা আর 'আমি' গ্রহীতা; 'নিজবোধ' ফেটে উঠে, আর বহু বহু 'আমি' তা থেকে বা'র হ'য়ে যায়। আমিত্বটা একটা গর্ত্ত যেখানে 'আমি' মরে যায়, আর ভগবান জেগে উঠেন। নিজবোধে কোন গর্ত্ত নেই—সবটাই নিজবোধ। 'আমি' মরে যাওয়া মানে ওর সঙ্গে এক্‌সা হ'য়ে যাওয়া,—ওতে গ্রস্ত হ'য়ে যাওয়া—ওরই যে ধর্ম্ম তাতে প্রবিষ্ট হ'য়ে যাওয়া।

নিজত্বের বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি

কে দেখে? কে শুনে? চৈতন্যই খালি—এইটা দেখ। এই pointটা তোমরা miss ক'রে যাও। দেখা মানে কি? শুনা

মানে কি? দেখা ব'লে কোনও জিনিষ আছে, যেখানে রূপ নেই? শুনা ব'লে কোন জিনিষ আছে যেখানে শব্দ নেই? যেখানে দেখা, সেখানেই রূপ; যেখানে শুনা, সেখানেই শব্দ। 'নিজে' যদি রূপ হই, তো যাকে দেখছ এ কে? 'নিজে' যদি শব্দ হই, তো যাকে শুনছ এ কে? রূপদর্শন এবং 'নিজে' এক সঙ্গে—এ কে? নিজে ছাড়া আর কেউ হবার উপায় নেই। তেমনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের বেলায় আমি শব্দময়, স্পর্শময়, রূপময়, রসময় ও গন্ধময়—এই পরিচয় দিবে কে?—নিজেই। এই 'নিজে' চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বিদ্যুৎ সবেতে আছে। এ তবে কোন্ 'নিজে'তে এসে পড়লাম? এ যে 'বরণীয় নিজে!' যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।

'রূপ' মানে রূপতত্ত্ব। রূপতত্ত্ব এমনি তত্ত্ব যা' থেকে অনন্ত রূপ বা'র হয়, অথচ সে নিজে রূপ নয়। 'তত্ত্ব' মানেই অনন্ত ক্রিয়াময় entity (অস্তিত্ব)। এ রকম এক এক তত্ত্বে বিপুল আনন্ত্য বিরাজ করছে। এসব তত্ত্ব তোমার নিজত্বেই রয়েছে। স্ফটিক স্তম্ভ ভেদ ক'রে যেমন নৃসিংহ বা'র হয়েছিলেন, তেমনি তোমাকে ভেদ ক'রে অনন্ততত্ত্বময় 'নিজমূর্ত্তি' বা'র হ'ল? এ 'নিজ' হ'ল জাগ্রত দেবতা; নিজবোধ আছে অথচ জাগ্রত দেবতা নেই তা হয় না। তা হ'লে এই জাগ্রতা দেবতা দেখতে গিয়ে উপাসনাময় হ'তে হয়। উপাসনাশূন্য হ'য়ে ভগবৎ তত্ত্ব শ্রবণ মহাপাপ। একেবারে জ্যান্ত নিজত্বকে দেখছ কি না, তার উপর 'বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি' দেখা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। কোথায় ছিলে একটা কৃমি কীটের মত কোন জগতে! আর এখন কোন্ তেজোময়—অমৃতময় রাজ্যে ঢুকেছ! ভাল ক'রে এখন দেখ তো। সমগ্র বিশ্বকে হটিয়ে এনে নিজেই ফেল্‌লে এই 'নিজে'তে? যে অমৃতময় পুরুষে এসে পড়লে, তাঁর পায়ে নতি নিয়ে এস—মাথা হেট করিতে

শেখ; তবে এসব কথা শুনবার অধিকারী হবে। তোমার সমস্ত জীবনের সার্থকতা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে এইখানে।

মুক্তির পথ

যার শুধু কাঁথা আছে, সে ভাবে, কাঁথার মত সুখের বস্তু আর নেই। সে যদি মোটর গাড়ীতে উঠতে যায়, তবু কাঁথা বগলে ক'রেই উঠবে—সেই কাঁথায় যেন প্রত্যক্ষ নিজ জ্ঞানটা জড়িয়ে রয়েছে। যখন তার নিজের মোটর গাড়ী হবে, তখনই সে কাঁথা ছাড়বে। এমনি ক'রে নিজের কেরামতি ফলিয়ে তোমরা 'কাঁথা' বগলে ক'রে বসে আছ। নিজত্বে যতক্ষণ না ভগবতী দেখ ততক্ষণ কাঁথা ফেলবে কি ক'রে? এমন মায়াময় জিনিষ এই কাঁথা যে একে ফেলবার সাহস নেই। নিজে পাপী কি না, তাই ফেলতে গেলে ও বেছে বেছেই ফেলা হয়। বৎস! এমন একটা কিছু নেই যেটা 'আমি' নই—যেটা ভগবতীর অঙ্গে মাখানো নয়। ও ছাড়া কেউ নেই—তা কে জানে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রে, আর কে জানে বা মহান্ হ'তেও মহানে! খালি তোমার স্বীকারের জন্য অপেক্ষা করছে। এই জন্যই বিজ্ঞান বলতে হয়। স্থূল জগৎ কি ক'রে আত্মত্বে ঢুকে, কি ক'রে অদ্বৈত হয়, যেখানে দ্বিতীয়ের স্থান নেই, কি ক'রে জীবই ভগবান্ হয়—এই সব তত্ত্ব বুঝাবার জন্য চক্ষুষ্মাণ গুরুর দরকার। এ বাঁধন ফেলা বড়ই শক্ত। সাংখ্য বলেন প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগেই বন্ধন; বেদান্ত বলেন অজ্ঞানতাই বন্ধন; কিন্তু আমি বলছি দ্বিতীয়বোধই বন্ধন, আর অদ্বিতীয় বোধই মুক্তি।

আমরা যখন 'জ্যান্ত'কে অর্থাৎ চেতনকে ধরতে পাই না, শুধু 'মড়া'কে অর্থাৎ অচেতনকেই পাই, তখন আমাদের মড়াকেই জীবিত ব'লে নিতে হবে। একটা ধূলোর কুচি, তাকে ও ছাড়ব না 'মা' বলতে। কোন সংশয় রাখব না। খালি বলব 'মহেরণায় চক্ষুষে'—তুমি চিন্ময়ী, তোমার চেতন যে আমি, এই আমাতে তুমিই

স্থিত ; এখানে এমন ক'রে দাঁড়াও যাতে আমি দেখি তুমি মহান্ হ'য়ে উঠেছ—যাকে দেখেছিলাম মিথ্যা, সেই হ'য়ে উঠেছে পরম রমণীয় সত্য। এই দেখলে হয় মার্কণ্ডেয় ঋষি—হয় অমর।

এই যে 'চণ্ডীর' এত সুখ্যাতি করছি, কি জন্য? 'চণ্ডী'তে এত দূর বিশেষত্ব রয়েছে, যে তা সাংখ্যে বা বেদান্তে নেই। এঁরা ব'লে গেছেন বটে যে ইঁনিই ত্রিবৃৎ হন। কিন্তু কোন্ রহস্য শক্তি এই পরম তত্ত্বে আছে, তা' বলেন নাই। এইজন্য দর্শন শাস্ত্র—religion (ধর্ম্ম) নয়—মাত্র philosophy (দর্শন)। Religion begins where philosophy ends (দর্শনের যেখানে শেষ, সেখানে ধর্ম্মের আরম্ভ)। এসব দর্শনশাস্ত্রীয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তিতত্ত্বকে দেখান হয়নি। মৃতদেহকে ব্যবচ্ছেদ করা আর জ্যান্ত মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার করা—কত তফাৎ! দর্শনশাস্ত্র আর চণ্ডিকাতত্ত্ব ও তেমনি। উপনিষদে 'প্রচ্ছন্নবিদ্যা', 'রহস্যবিদ্যা' 'গুহ্যবিদ্যা' ব'লে দু'এক স্থলে উল্লেখ আছে। ঐ হ'ল 'চণ্ডিকাতত্ত্ব'।

মহাকালের অনুভূতি ও সম্ভূতি মূর্ত্তি

দেখতে পাচ্ছ, মহাকালের করাল স্রোত তোমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, ডিগ্‌বাজী খাইয়ে, কত modification (পরিবর্ত্তন) দিতে দিতে, তোমার অজ্ঞাতসারে অপ্রতিবন্ধকতার সহিত কেমন ক'রে মরণের পথে অথবা নিজের কোলে টেনে নিয়ে চলেছেন! এঁকে উপেক্ষা ক'রে কোন্ জ্ঞান নেবে? এঁকে দেখলে আর এখানে স্থিতি দেখতে পাও না। কিন্তু নিজবোধরূপ দেবতা এইখানেই তোমাকে মড়া সাজাচ্ছেন আর গুড়িয়ে নিচ্ছেন। গোড়াতে বসে আছেন আত্মস্বরূপে ; জন্ম থেকে মৃত্যু তোমাতেই গড়ছেন—চতুর্দ্দশ ভুবন এই তোমাতেই দেখছ। প্রত্যেক পদ magnified (বর্দ্ধিত) রয়েছে বিরাটে। বিরাটে এর magnification (বর্দ্ধন) দেখ—মহাকালের গতি দেখ; দয়া নেই, মায়া নেই, বিচ্যুতি নেই—

কত কঠিন আইনের নিগড়! এ এইখানেই ঘটছে—ওখানে রয়েছে ব'লেই এখানে ঘটছে। এই একটা phase (দিক) আর ওই একটা phase—একই জিনিষের তু'টো phase (দিক)। কেন তু'টো phase? অনুভূতি ও সম্ভূতি যুগপৎ একসঙ্গে হচ্ছে। বোধতত্ত্ব মানেই এই কথা—it indicates this very thing. আমি বসে বসে বোধ করছি—এ তা' নয়। যে প্রকৃত বোধ তাকে ধরলেই অনুভূতি ও সম্ভূতি একসঙ্গে চলে। তখন বলতে না বলতেই হয় গুঁড়ো! উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে একসঙ্গে যে সিদ্ধান্ত স্বরূপ নিয়েছে—তার বলতে না বলতেই তুটো phase গুঁড়ো হ'য়ে যায়। ইনি যে মণিধরী বজ্রিণী! উত্তর মেরু আছে, দক্ষিণ মেরু নেই—এমন হয় না। ঠিক তালে যে চলতে পারে, সে যদি বলে, গাছটা এখান থেকে উড়ে যাক্, অমনি তা' উড়ে গেল; সারা তুনিয়াটার বেলাই এমন সম্ভব।

আপ্তকামত্ব

এই সিদ্ধান্তে সুদৃঢ় হ'তে হ'লে, এ জ্ঞানে ডোবা-বসা কতখানি দরকার দেখ তো! "ভগবৎ তত্ত্বে বসায় কতদূর অভ্যস্ত হ'লে, তবে এসব কথা শুনলে বলতে বলতেই ঘটবে, একবার বুঝ তো! বলতে বলতেই হচ্ছে এতদুর efficacy (ফলদান শক্তি) এর! বললাম কিন্তু হ'ল না—এটা বিজ্ঞান নয়। এই শক্তিকে বাদ দিয়ে কি শুনবে? মস্তিষ্কের পক্ষে এ যে গুরুতর আহার! দ্বৈত—অদ্বৈত তত্ত্ব খুব ব'লে দিলাম, আর তোমরা কি সব মাথা চুলকিয়ে মরবে! বেদব্যাস বেদান্ত লিখে ঋষিদের দেখাচ্ছিলেন। তাঁরা মার্কণ্ডেয়কে দেখাতে বললেন। তিনি তখন মার্কণ্ডেয়কে তাঁর লেখা ব্রহ্মসূত্র পড়ে শুনালেন। মার্কণ্ডেয় শুনে বললেন, 'হাঁ, বেশ হয়েছে, কিন্তু কলিরই যোগ্য হয়েছে'—অর্থাৎ ঐ কালেই ব্রহ্মকে নিয়ে হাটে, বাজারে বিক্রী হবে—ফট্‌কা খেলা বা speculation করা চলবে!

"দেবাব ব্রহ্মণঃ রূপে।" যা কিছু ফুটেছে, তা' এক পাদ ভিতরে আর এক পাদ বাইরে। যেটা রকমফের হয়েছে সেটা এক পা, আর যেটা তেমন হয়নি, সেটা আর এক পা। ভয়ঙ্করী দুর্গা! বাহিরে দেখি তুমি কালী, আর ভিতরে দেখি তুমি 'নিজে'! বাহিরে দেখি, তুমি শান্ত শিবস্বরূপ দেবতা, আর ভিতরে দেখি, তুমি নিজে! এখানে এই যে 'নিজে' ব'লে মানুষটি ছিলাম, এখন দেখি, এই নিজেই হ'য়ে গেছি 'ভগবতী'।

নিজে বলাটার সংযোগ দেখ। 'নিজে' বলা মানে এ নিজত্বটা গ্রস্ত হ'য়ে গেছে ভগবতীতে। কোথায় বসে শুনছ এসব কথা? মরা মাটির জগতে বসে, না 'নিজে'তে বসে? জ্যান্ত মাটিতে—'নিজে'তে। জ্ঞানমূর্ত্তিকে দেখ। কর্ম্মগ্রন্থির দোষে দেখাটা অভ্যাস হয় না। এজন্য বলবার আগে গুরু পূজা চাই—"কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্"। গুরুকে ছেড়ে ভগবতীর কথা কইতে গেলে হবে না। যে কাজেই যাও, তৎসম্বন্ধীয় experience (অভিজ্ঞতা) তার গোড়ায় না রেখে, কোনও কাজ করতে পার না। জ্যান্ত মাটিকে দেখছ—মরা মাটিকে নয়। "আধারভূতা জগতস্তমেকা"—দেবী, তোমাকেই দেখছি—এ জ্ঞান ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত, অথচ বৈজ্ঞানিক!

—শ্রীগুরুবাণী, বুধবার, ২৬-২-১৯৪১

—০:*:০—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিজচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য

[চুম্বক :—নিজচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের প্রভেদ-দর্শয়িতা গুরু শক্তির বিকাশ। নিজচৈতন্যই সর্ব্বপ্রাপ্তির ভূমি। ইহাই আরও উর্দ্ধক্ষেত্রে ঈশ্বর ভূমিরূপে পরিদৃষ্ট হয়।]

উপাস্য দেবীতে যে শক্তি বিভাগ ক'রে দেখান হয়েছে—সেই চিন্ময়ী দেবীতে যে aspect সকল রয়েছে আমাতেও সেই সকল aspect দেখা যাচ্ছে; সুতরাং আমিও তাই। এ জ্ঞান যার বুকে যত সুন্দর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে নিজেকে সেই অনুসারে সংগঠিত ক'রে নিয়েছে, সেই তত বিশিষ্টরূপে গুরু হ'য়ে যাচ্ছে। তাতেই গুরুশক্তি' আবির্ভূত হচ্ছে। যে শক্তি জীবচৈতন্য আর ভগবৎ-চৈতন্যের মাঝে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মচৈতন্য উদ্ভাসিত ক'রে দেখিয়ে দেয় যে এই দুই চৈতন্য অভিন্ন, তারই নাম 'গুরুশক্তি'।

আমি তোমাদের পুনঃ পুনঃ বলছি যে তোমরা 'কালী', 'দুর্গা', শিব' বলতে শেখ বা 'যাই' বলতে শেখ, তাকে যদি নিজ-চৈতন্যে প্রয়োগ ক'রে নিতে না পার তো কিছুই হবে না। সকল কর্ম্মেই ভগবৎ-কর্ম্ম সংসাধিত হচ্ছে, এইটা যেমন ভিত্তি হ'য়ে থাকা চাই, তেমনি তোমার নিজচৈতন্যেই এই মহতী মহিমা দেখতে পাচ্ছ—কালী বা দুর্গা দেখতে পাচ্ছ—এইরূপ ভিত্তি থাকা চাই। ভোগাত্মকভাবে পাওয়া, অধ্যাত্মভাবে পাওয়া আর নিজ চৈতন্যে পাওয়া—সব একই কথা। মায়ের কথা শুনতে গেলে এ অভ্যাসটিতে সর্ব্বদা সতর্কভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। আকাশ দেখছ, কি মাটি দেখছ—সব নিজচৈতন্যেই। 'ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ'। এ তখন সুন্দর ভাবে আকাশের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যায়। আর একটু গেলে যদি আকাশের সঙ্গে identified (একীভূত) হ'তে পার, তবে এমন ভূমি পাবে যেখান থেকে আকাশ তৈরী হয়। যা থেকে আকাশ তৈরী হয়, তার নাম 'ঈশ্বর ভূমি'। চেকে চেকে যাওয়া, পেতে পেতে যাওয়া, এই হ'ল তোমাদের লক্ষ্য।

—শ্রীশ্রীগুরুবাণী, শুক্রবার, ২১-২-১৯৪১

—০:#:০—

দ্বিতীয় অধ্যায়

চণ্ডীর প্রথম মন্ত্রদ্বয়ের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

চণ্ডীতত্ত্বের মূল সূত্র

[**চুম্বক :**—চণ্ডীর প্রথম শ্লোকেই তার সারাংশ গ্রথিত। প্রতি জ্ঞানক্রিয়ায় 'নিজবোধ' নামক তত্ত্বটি থাকে। নিজবোধময় পুরুষের নাম 'স্বর', আর তার আত্মবিস্তারের নাম 'সূর্য্য। স্বরত্ব থেকে 'স্বসম্বেদন' ও 'পরসম্বেদন' নামে দুইটি বোধপ্রবাহের উদ্ভব। ভগবানের সম্ভূতি ও অনুভূতির রূপক বর্ণনা হ'ল সূর্য্যের পত্নীদ্বয় 'সংজ্ঞা' ও 'সবর্ণা'। সবর্ণার পুত্রের নাম 'সাবর্ণি' অর্থাৎ অনুভূতিময় পুরুষ। কি রূপে এই অনুভূতিময় সাবর্ণি নিজবোধকে ব্যাপ্ততম দেখে অষ্টম মনু হ'ন—ইহাই চণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয়। নিজবোধকে বিরাট বিশ্বব্যাপী দেখলেই বেদোদ্ধার হয়। স্বর্গ-মর্ত্ত্য জোড়া অবাধ আত্মবোধ ব্যতীত ভগবৎসারূপ্য লাভ হয় না। জ্ঞান দেবতা বা আত্মবোধ মাত্র অনুভূতিতে আবদ্ধ নয়। সারা বিশ্ববোধের তলায় সম্ভূতিশক্তিময় ভূমা আত্মবোধ বিস্তৃত। ক্ষুদ্র নিজবোধ ও ব্যাপ্ততম আত্মবোধ দৃশ্যতঃ বিভিন্ন হ'লেও তত্ত্বতঃ একই। সুতরাং ভূমা আত্মবোধ 'নিজ' ব'লেই গ্রহণীয়। ইহাই চণ্ডীপ্রদর্শিত সাধনার পথ। কিন্তু প্রাণহীন আত্মবোধ সাধকের লক্ষ্য নয়, কেন না তাতে দুর্দ্দশার অবসান হয় না। ওঙ্কারের বুকে প্রণবের অবাধ লীলায়ন দর্শনই সাধকের একমাত্র লক্ষ্য। ওঙ্কারই চণ্ডীবর্ণিত প্রণবের প্রতিবল।]

আমি বলেছি, যে চণ্ডীর প্রথম শ্লোকটিতে যে কথাটি বলা হয়েছে, সেটি কেমন ক'রে হয় তারই বর্ণনা—এই হ'ল গোটা চণ্ডী। চণ্ডীর গোড়ার শ্লোক হ'ল :—

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাৎ গদতো মম॥

সাবর্ণি নামে যে সূর্য্যতনয়, যিনি অষ্টম মনু হয়েছিলেন, তিনি কেমন ক'রে মনুত্ব লাভ করেছিলেন, এই কথাটিই এখন বিস্তার ক'রে বলছি। এর নাম 'চণ্ডী'।

স্থিতঞ্চ যচ্চ

পরমতত্ত্ব is not to be taken as an object. যেটি ফুটে দিগ্‌দিগন্ত ব্যেপে বিচ্ছুরিত হ'য়ে লহরে লহরে ফুটে উঠ্‌ছে সেই হ'ল পরমতত্ত্ব। এই যে উল্লাসপ্রবণতা বা গতিময়তা এই তত্ত্বটি হ'ল 'স্থিতঞ্চ যচ্চ'। তোমার জ্ঞানক্রিয়া হুড়্ হুড়্ ক'রে চলছে। এ জ্বলতে জ্বলতে বেরুচ্ছে আর যতদূর আত্মবিস্তার ততদূর যাচ্ছে। চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বায়ু, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—যত কালের বিস্তার, দেশের বিস্তার, দিকের বিস্তার সব জ্বলছে। এর প্রজ্বলনের নাম 'যৎ'। তার মানে এই যে—যেখানে যেটি 'স্থিত' বলে মনে হচ্ছে সেখানে সেটি নাই—সেটি অহর্নিশ বিদীর্ণ হ'য়ে হ'য়ে বোমার মত ফেটে, জ্বলছে ও ফাটছে, আবার জ্বলছে, ফাটছে, আবার জ্বলছে। ফেটে ফেটে উথ্‌লে উথ্‌লে জ্বলতে জ্বলতে এই যে চলা—এইটা লক্ষ্য কর; তবেই পাবে বেদের দর্শন।

তোমার চোখে কিন্তু জ্বলতে জ্বলতে বেরুচ্ছে না। তার কারণ তুমি দেখছ না যে, যা' বেরুচ্ছে তা' একেবারে আত্মময়। ওতে নিজবোধ আছে। 'নিজে যাচ্ছি' এই বোধ নিয়ে এ যাচ্ছে। তুমি বলছ এ 'জ্ঞান', কিন্তু জ্ঞান কি তা তুমি জান না। 'জ্ঞশ্চ অনশ্চ' ইতি জ্ঞানম্। যাতে নিজবোধ নাই, তাকে 'জ্ঞান' বলবে? 'নিজে' আছে এইরূপ যে বোধ তার নাম 'জ্ঞত্ব'। 'নিজে' এই কথাটি জ্বলতে জ্বলতে ফুটলে তার নাম হয় 'জ্ঞান'। যেমন 'আকাশ' ফুটল মানে এমন একজন ফুটল যে নিজেকে জানছে আকাশ ব'লে। জ্ঞানেতে 'নিজ' ব'লে যে ধর্ম্ম আছে সেটা মাথায় থাকলে তবেই বলব 'জ্ঞান'; তা না হ'লে 'জ্ঞান' বললেও বেরুবে শুধু 'কথা'। সুতরাং যখন

বললে 'ভগবান দেখলাম', 'আকাশ দেখলাম' ব' 'সূর্য্য দেখলাম' তখন তোমাতে যে বেরুল সে ভগবানও নয়, আকাশও নয়, সূর্য্যও নয় ; সে বলছে 'নিজে হয়েছি', অর্থাৎ সে হ'ল 'নিজ' ব'লে যে বোধ সেইটি। তাকে না দেখে পরমাত্মা বললেও পরমাত্মা হয় না।

সুর, সূর্য্য ও সূর্য্যতনয়

এই নিজবোধ স্বরূপটি যে দেখতে পায় তাকে আমরা বলি 'সুর' অর্থাৎ দেবতা। 'সুন্দরং রঞ্জয়তি ইতি সুর—সুন্দরভাবে যে নিজবোধময় হ'য়ে জলে উঠেছে অর্থাৎ বহ্নিময়, অগ্নিময় বা বর্ণময় হয়েছে। যে এইরূপ ভাবের ভাবুক হয় অর্থাৎ সুর-ভাবাপন্ন হয়, তার নাম 'সূর্য্য'। যে আত্মদোহন ক'রে এইরূপ আগুন বা'র ক'রে জলে উঠে, তার নাম সুরের তনয় 'সূর্য্য'। এটি পরম দেবতার একটি বিস্তারের মূর্ত্তি। তিনি এইরূপ আত্মবোধময় ও বহ্নিময় হ'য়ে যা কিছু সব বা'র করেন—আয়তনময় বা তনয়ময় হন। তনোতি থেকে হ'ল 'তনয়'। তনয়ময় হওয়াটি একটি আত্ম বিস্তারের ভাব—একটি আত্মজ্ঞান—নিজবোধস্বরূপ প্রজ্বলন। 'সুর' যিনি তিনি নিজেকে ফুটালেন, আত্মবোধময় হ'লেন ও আত্মবিস্তার করলেন বা তনয়ময় হ'লেন। এই ফোটা ওর নিজেরই ফোটা ; এইজন্য ওর নাম হ'ল 'সূর্য্য'। আত্মবোধকে এই কারণে সূর্য্যের সহিত তুলনা করা হয়। এ যেন এক রকম বোমা।

এই যে সূর্য্য নামক দেবতাটি বেরুলেন, তাঁর আগে 'সুর'কে দেখ। এখন তোমরা নিগুর্ণ, নির্লেপ—এ সব কথা থো কর। আগে দেখ সুরকে। সুরত্বে যে আলোটি ফুটে উঠে তার নাম আত্মবোধ বা নিজবোধ। সুরের প্রধান মহিমা হ'ল, প্রজ্বলিত হওয়া। এই প্রজ্বলনের বিশিষ্ট নাম 'স্বসম্বেদন'। এইরূপ প্রজ্বলনের ফলে ওই দেবতা থেকে নিজবোধ বা বিবিধ বোধ বেরুতে থাকে—

বিবিধ বোধ হ'ল নিজবোধ থেকে উৎপন্ন, কিন্তু ঠিক এর উল্টা। আর বিবিধ বোধ যাই হ'ল অমনি উনি হলেন তাতে অনুপ্রবিষ্ট। এটি একটি স্থিতিশীল জিনিষ নয়—গতিশীল। তা হ'লে তুমি যখন কথা কও, তখন তার ভিতরেও ঠিক এই জিনিষ থাকে।

তাই গল্পচ্ছলে সূর্য্যের বর্ণনা করা হয়েছে যে, সূর্য্য এত তেজবান যে তার তেজ অহর্নিশ বিকীর্ণ হচ্ছে—যেন তা' থেকে সে তেজ ঠিকরে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই বিকীর্ণ তেজের নাম 'সংজ্ঞা'। 'সম্যক্ জানাতি' ইতি সংজ্ঞা অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান। জ্ঞানের সম্যকতা হ'ল যখন ওটি অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে একটি মূর্ত্ত প্রকাশের চরম সার্থকতা নিয়ে দাঁড়ায়। তার নাম হ'ল প্রতিষ্ঠা। 'আগুন' কথাটি তোমার মুখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসে যদি আগুনের মতই জ্বলত তবে ওর নাম হ'ত 'সংজ্ঞা'। সেইরূপ বিশ্বসংজ্ঞাও সূর্য্য থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "ওগো, আমি যে এই স্বামীর প্রচণ্ড তেজ আর সইতে পারি না"! বেরুবার সময় ঠিক তার মতন দেখতে একজন স্ত্রী-লোককে সূর্য্যের কাছে রেখে গেল। তার নাম 'ছায়া'। এই হ'ল উপাখ্যান। এর মানে এই যে আমরা যখন কোন জিনিষ ভুলে থাকি, তখন তার নাম হয় 'ছায়া' আর সেই জিনিষটা হ'ল 'সংজ্ঞা', অর্থাৎ তৎবিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর যেন তোমার ঘরে যে স্ত্রী আছে তার নাম 'সংজ্ঞা, আর তোমার জ্ঞানে তোমার স্ত্রী সম্বন্ধে যে অনুভূতি আছে, তার নাম যেন 'ছায়া'। এই 'ছায়া' তা হ'লে হ'ল তোমার স্ত্রীর 'সবর্ণা'। ওটির চেহারা ঠিক তোমার স্ত্রীর মতন? ওটি সংজ্ঞার সমানবর্ণীয়া বা সবর্ণা, কেন না সংজ্ঞা তোমাতে যেমন ভাব ফুটায় এই ছায়াও তেমনি ভাব ফুটায়। এই যে তুমি হিরণ্যকশিপু হয়েছ—জ্ঞানকে পেটে পুরে গা'ময় মেখে বসে আছ, এই জ্ঞানের নাম 'সংজ্ঞা', আর অন্তরে তুমি যে অনুভূতিময় হ'য়ে রয়েছ, এই অনুভূতির নাম 'সবর্ণা'। সূর্য্য ঠাকুর এখানে এই

'সবর্ণা' বা 'ছায়া'র সঙ্গে কিছু দিনের তরে বসবাস করছেন ও খাচ্ছেন, ঠিক যেমন তোমরা এখানে অনুভূতিময় হ'য়ে বসবাস কর ও খাও। এদের মিথুনে যে পুত্র হ'ল তার নাম 'সাবর্ণি'। এও সূর্য্যতনয়। তোমরা 'সংজ্ঞা' না 'সবর্ণা'কে খাচ্ছ? 'সবর্ণা'কে। ওর যে পুত্র হচ্ছে তার নাম 'সাবর্ণি'। মনে কর, তুমি একটি মোটরগাড়ী কিন্‌লে, আর ভাবলে 'রূপনারায়ণপুর যাব' বা 'দিল্লী যাব'। মোটর-গাড়ীর সঙ্গে মিথুন ক'রে এসব তোমার ছেলে জন্মাচ্ছে। ছেলের নাম -'সাবর্ণি'। তুমি যখন চিন্তায় বসে যাচ্ছ, তখন তুমি সাবর্ণি হ'য়ে বসে আছ—তুমি তখন তনয় অর্থাৎ তনুবিস্তার। অনুবেদনে যে বহু বহু ভাব জন্মাচ্ছে, সেই সবই সবর্ণার গর্ভে পুত্র হ'য়ে বেরুচ্ছে—তনুবিস্তার হচ্ছে। সহস্রারে কি খুঁজতে যাচ্ছ,—সব আছে মূলাধারে।

অষ্টম মনু—বেদোদ্ধর্ত্তা পুরুষ

সূর্য্যের ন্যায় তুমিও পরম দেবতার এক পুত্র। কিন্তু সূর্য্য সম্ভূতিময়, আর তুমি হয়েছ অনুভূতিময় পুরুষ। কর্ম্মবন্ধন মাত্র তোমার পুঁজি। তোমার পুত্র সাবর্ণি কেমন করে অষ্টম অর্থাৎ অশতম বা ব্যাপ্ততম মনু হয়, অর্থাৎ অনুভূতিময় জীব কেমন ক'রে সম্ভূতিময় পুরুষ হয়, এই হ'ল চণ্ডীর শিক্ষা।

তুমি মাত্র একটি অনুভূতিময় জীব, এখানে কুঁকড়ে রয়েছ। অনুভূতিময় ক্ষেত্রে মৃত্যুর তালের ভিতর তুমি মাত্র একটু চুক্-চুকানি আলো। মৃত্যুর একটা বিপুল আবর্ত্তন তোমাকে মৃত্যুর গহ্বরে নিমজ্জিত করতে আসছে। তোমার অনুভূতিতে যা কিছু আসছে তা' 'দ্বিতীয়' বা 'অন্য' ব'লেই আসছে—'নিজ' ব'লে আসছে না। এই মরণময় ক্ষেত্রে এমন যে চুকচুকানি-আলো বা অনুভূতিময় জীব, সে কেমন ক'রে অষ্টম মনু বা সম্ভূতিময় পুরুষ বা মন্ত্রময় পুরুষ হ'বে? অষ্টম বা অশতম অর্থে বলেছি ব্যাপ্ততম অর্থাৎ নিজেই দিগ্‌দিগন্ত সর্ব্বতোব্যাপ্ত। যে কোন জ্ঞান যতই ব্যেপে

থাক না কেন—দিক, কাল বা দেশের মধ্যে—পরিশেষে কিন্তু দেখি যে সবই আমার নিজেতেই। কোথাও এই নিজবোধকে অতিক্রম করা যেতে পারে না। যেখানে যত কিছু ফেনিল বা রসোল্লাসময় হ'ক, সে সব কোথাও দাঁড়ায় না আমার নিজেতে ছাড়া। তা হ'লে অণুতম বা ব্যাপ্ততম হ'ল 'নিজে'। তুমি দেখছ, 'নিজে' যেন একটি ছোট্ট জিনিষ, কেবল 'নিয়ে আয়' 'নিয়ে আয়' করছে, আর কে অপর একজন যেন সব-কিছু তোমার নিজের ঘাড়ে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। এই তো তোমার 'নিজের' অবস্থা, আর যখন দেখ, যেখানে যত কিছু—সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অমন কোটি কোটি দুনিয়া ইত্যাদি—কেউ তোমার 'নিজে'কে, তোমার আত্মময়তাকে, অতিক্রম ক'রে যায়নি, এই হ'ল আসল 'নিজে'। কোন ব্যাপ্তিই যাকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে না, সে-ই নিজে। তুমি যা' কিছু দেখ বা বোধ কর সে সব 'ব্যাপ্ত' হ'তে পারে বা 'ব্যাপ্ততর' হ'তে পারে; কিন্তু 'নিজে' ছাড়া আর কেউ 'ব্যাপ্ততম' হতে পারে না। চণ্ডীর প্রথম শ্লোকটিতে বলছে—এই যে ক্ষুদ্র জোনাকি পোকার মত নিবো নিবো আলো, এ কেমন ক'রে এক বিরাট ব্যাপ্ততম সূর্য্য হয়, এই কথাটি বলছি। তা হ'লে এই শ্লোকেই গোটা চণ্ডী-খানি বলা হ'ল না কি? চণ্ডীপাঠ করতে গিয়ে যদি ওই অণুতম ক্ষেত্রে যেতে না পার, তবে কি ঠিক চণ্ডীপাঠ হবে?

তুমি বললে 'মা গো, তারিণি, রক্ষা কর!' আগে তারিণী আসুন, তবে তো রক্ষা! তোমার তারিণী কে? ওই যে পিট্ পিট্ করছে তোমার বুকের ভিতর, ও তোমায় রক্ষা করবে? ও বলবে না কি 'আমিই' যে ভয়ে মরছি, বাবা! আগে আমাকে তুলে দাও, তবে তো আমি তোমায় রক্ষা করতে পারব। মৎস্য পুরাণের উপাখ্যানে আছে যে এক ব্রাহ্মণ পুকুরে আহ্নিক করতে গিয়ে এক গণ্ডূষ জল নিয়ে দেখে, তা'তে একটা পুঁটিমাছ

ছট্ ফট্ করছে আর বলছে 'আমাকে বাঁচাও, আমি ভয়ে মরছি!' সে তাকে ঘরে এনে এক হাঁড়ি জলে পুরে রাখলে। পরদিন সে দেখে সেই পুঁটিমাছটা বেড়ে গেছে ও বলছে 'আমাকে আরও বড় একটা জলাশয়ে রাখ।' হাঁড়িটা ভ'রে গেছে, তাতে মাছটার আর কুলায় না দেখে, ব্রাহ্মণ ওকে হাঁড়ি থেকে তুলে নিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিলে। ক্রমে ওই মাছটা পুকুর জোড়া হ'য়ে গেল। তখন ব্রাহ্মণ ওকে সমুদ্রে নিয়ে ফেললে। পরে মাছটা সমুদ্রের মত বিরাট হ'য়ে ব্রাহ্মণকে বললে, বৎস, তোমার প্রলয়কাল উপস্থিত; আমি বেদোদ্ধার করতে এলাম। তুমি এখন তোমার নৌকা আমার শৃঙ্গে বাঁধো। সেই পুরুষ পরে মনু হ'ল। এই উপাখ্যানের মানে হ'ল, তোমার এই ক্ষুদ্র 'নিজে'কে বা আত্মত্বকে মাত্র এইটুকু না দেখে বিরাট বিশ্বব্যাপী ব'লে দেখ! ঐরূপে পর পর বৃহত্তর দেখতে দেখতে পরিশেষে বৃহত্তম ব'লে দেখার নামই বেদোদ্ধার ও জীবত্বের প্রলয়।

চণ্ডীও এই কথাই বলছে; কার পর কি দেখতে হ'বে, এসব কথা চণ্ডীতে পর পর দেখা মানে তোমারি এই সান্ত ভাবকে ক্রমে অনন্তে ধারণা করা। তোমার এই যে সান্ত ভাব বা অনু-ভূতিময় ভাব এটি প্রকৃত পক্ষে এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। তুমি দেখতে পাচ্ছ, তোমার যে অনুভূতিময় আত্মত্ব বা জ্ঞানময়স্বরূপ এটি মাত্র এই টুকুই—এর বাইরে তুমি নেই, এর পরেও তুমি নেই; আর দেখছ যেন এই আত্মত্বটির ঘাড়ে সব কিছু ভোগ উড়ে এসে পড়ছে; এবং যে টুকু আত্মবোধ তোমার আছে, মাত্র সেইটুকুই তুমি ভোগে পাচ্ছ, আর সবই অগোচর। আর যে টুকু ভোগে আসছে সে টুকুও নিজে ব'লে আসছে না, পর ব'লে আসছে; আর আসছেও যদি, তবু থাকছে না, হারিয়ে যাচ্ছে। আজ তুমি যা ভোগ করছ, কাল তা বিস্মৃত হচ্ছ; আর

গেল-জন্মের যে কথা, সেগুলি তো সব কেটেই গেছে। এই তো তোমার অবস্থা। তা হ'লে তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমার ভোগ সকল এ মাথায়ও কাটা, ও মাথায়ও কাটা—স্বর্গেও কাটা, মর্ত্যেও কাটা। এই দু'দিক দিয়া যার কাটা তারই নাম অনুভূতিময় পুরুষ। কিন্তু এই দু'দিক যদি অবাধ আত্মবোধে জুড়ে যায়, তা হ'লে সে পুরুষ কি আর এরূপ কাটা থাকবে?

অবাধ আত্মবোধ—সাধনার পথ

চঞ্চল কৃষ্ণকে' সংযত করবার জন্য যখন যশোদা দড়ি দিয়ে তাকে বাঁধতে গেল, তখন দেখা গেল ওই দড়ি যতই বাড়ান হয়, উহা দু'আঙুল কম পড়েই যায়। এই আঙুল দু'টি কি রকম? কৃষ্ণ বলছে, 'মাগো, তুমি অনুভূতিময় হ'য়ে আমাকে কেমন ক'রে বাঁধবে? তা'তেই তো দু'আঙুল কম পড়ছে! 'উচ্চয় দ্ব্যঙ্গুলম্'—আর ওই দু'টি আঙুল যদি জুড়ে দাও, তবেই আমাকে বাঁধা সম্ভব হবে।' এই উপাখ্যানটির মানে হচ্ছে যে, ভগবানই বল আর ননীচোরা কৃষ্ণই বল, তাঁকে যদি তুমি বাঁধতে চাও, তবে তুমি তোমার নিজত্বের ক্ষেত্রটিকে দু'আঙুল উঁচু ক'রে তোল। ওঁকে অনুভূতি দ্বারা বাঁধতে গেলেই তোমার অনুভূতি রজ্জুটি হবে 'ঊনং দ্ব্যঙ্গুলম্'। এই দু'আঙুল জুড়লে তবেই বন্ধন সম্ভব হবে। তোমার অনুভূতিময় চোখ নিয়ে জ্ঞানদেবতাকে যে দেখতে চাও তাতে ওঁকে বাঁধতে পারবে না। তুমি এঁকে দু'আঙুল উঁচু ক'রে তোল অর্থাৎ মর্ত্যক্ষেত্র ও স্বর্গক্ষেত্রকে প্লাবিত কর অবাধ আত্মবোধে।

যেমনি আমি বললাম প্লাবিত করার কথা অমনি তুমি গেলে আত্মবোধের দ্বারা প্লাবিত করতে। এ ঠিক নয়। যেটুকু তোমার অনুভূতিতে ধরা পড়ে, মাত্র সেইটুকুই কি ওই জ্ঞানদেবতা? পানাপুকুরের খানিকটা পানা সরিয়ে যতটুকু জল দেখ, মাত্র সেই-টুকুই কি পুকুরের জল, না যতদূর পর্য্যন্ত পানার বিস্তার ততদূর পর্য্যন্ত

জল? এই পানাগুলা যখন জলেই ভাসছে, তখন সমগ্র পানাক্ষেত্রটি জলে ভর্ত্তি, এ কথাটা বুঝে নেবে। তা হ'লে আত্মবোধ দেখা একটু পানা-সরানো জল দেখার মত নয়; আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আত্ম-বোধেরই বুকে ওই সমগ্র 'পানাক্ষেত্রটি' রয়েছে। জলটা মাত্র বিজ্ঞাত হচ্ছে একটা পানা সরানোর দ্বারা। তা হ'লে গোটা পানার তলায় আত্মবোধ বিস্তৃত রয়েছে। সুতরাং এখানে যদি দ্রষ্টা-শ্রোতা-ঘ্রাতা-মন্তা থাকে, তো গোটা বিশ্বময় দ্রষ্টা-শ্রোতা-ঘ্রাতা মন্তা আছে। তা হ'লে এখন ভগবতী বলতে গিয়ে কি খালি একটু পানা সরানো জল দেখেই নিশ্চিন্ত হবে না গোটা পানার তলায় যে প্লাবন রয়েছে দিগ্‌দিগন্ত ভ'রে, তাই দেখে উল্লসিত হবে? তখন দেখবে ওটা পানাপুকুর নয়—বিস্তীর্ণ সমুদ্র; আর যত পানা আছে সবার তলায় ওই সমুদ্র। আর দেখবে এই সমুদ্রই পানাগুলিকে প্লাবিত ক'রে কোথায় উড়িয়ে দিচ্ছে। আর আমার শরীররূপ পানার তলায় 'জল' দেখে যদি বলি ইনি দেখতে পান, শুনতে পান, ইত্যাদি, তবে এমন 'জল' তো বিশ্বরূপ পুকুরময় রয়েছে? আর তাই দেখলে অন্য সব দর্শনই ভেসে যাবে—পুকুর দর্শনে সমুদ্র দর্শনই হবে।

এই যে সমুদ্র—এই যে ব্যাপ্তিময়তা—একে কেমন ক'রে পেতে হয়, এ কথাটি আমি তোমাদের বলতে যাচ্ছি। ওই ব্যাপ্ততমকে 'নিজেই' ব'লে নিতে হবে, না আর একজন ব'লে নিতে হবে? যদি আর একজন ব'লে নেওয়া হয়, তা হ'লে এই আত্মবোধ খচ্ ক'রে কেটে যায়। আর যদি 'নিজেই' বলে নেওয়া হয়, তা হ'লে এই আত্মবোধকেই জড়িয়ে থাকা হয়। তা হ'লে একে ক্লিং ব'লে নিতে হবে—এই কথাটি বলা হয়েছে চণ্ডীতে। তত্ত্বতঃ এক জলই রয়েছে। 'জল' চিনতে হ'লে যেমন তার তত্ত্বজ্ঞানটি নিতে হয়, তেমনি তার ওই ব্যাপ্ততমত্ব জ্ঞানটিকেও নিতে হবে। পুকুরময় ব্যাপ্ত যত

জল আছে, সেই সমস্ত জলের উপর রয়েছে এই রকম পানা। 'আমি' জ্ঞানটি যেন একটা পানার আয়তন, আর 'পুকুর' যেন হ'ল বিপুল এক পানাক্ষেত্রের আয়তন। একটি কথার ভিতর একটি 'আত্মবোধ' ঢুকালে ওটি হ'ল একটি 'মণ্ডল'; ওটা ব্রহ্মার 'কমণ্ডলু' হ'য়ে গেল, একটি প্রাণের মণ্ডল তৈরী হ'ল। 'জল' বলতে তার মণ্ডল হ'ল পুকুর বা বিপুল জলরাশি। আবার যাকে ডাকছ, সেই বিপুল তত্ত্বও এইরূপ। কিন্তু সে তত্ত্বটি 'আমি' বা 'নিজে' নয়, যদিও সেটি ও 'আমি'—তত্ত্বতঃ একই বটে। সে তত্ত্ব বিপুল, অনাদি, অনন্ত; তবুও ঠিক এই রকম, 'নিজে' যেমন। সেই অণুতম বা ব্যাপ্ততম তত্ত্বটিকে এইভাবে দেখতে হবে। সুতরাং এতে দ্বৈতের ভাবটি কেটে গেল, নিজেও ছোট হ'ল না, আর 'পর'টিও আর 'পর' থাকল না—'আপন' হ'য়ে গেল। এই হ'ল চণ্ডীতে বর্ণিত সাধনার পথ।

ওঙ্কার ও প্রণব

কা'কে খুঁজছ? 'জীবন'কে তো। এই জীবনের ইচ্ছা কর, এই আয়ুর ইচ্ছা কর, বেঁচে থাকার সাধনা কর। 'জিজীবিষেৎ'—এই হবে তোমার সাধনা। ইন্দ্র—যিনি আত্মবোধের দ্রষ্টা—তিনি বললেন, 'আমি যতক্ষণ না এই আয়ুদেবতাকে—এই প্রাণদেবতাকে—চিনেছিলাম, ততক্ষণ অসুরেরা আমাকে আক্রমণ করেছিল; আর যেই প্রাণকে চিনেছি অমনি তারা বিধ্বস্ত হয়েছে'। এর মানে কি? আত্মবোধের উপর নির্ভর করলেও তুমি সর্ব্বদা দুর্দ্দশাগ্রস্ত, যদিও তুমি স্বর্গেই থাক। কারণ আত্মত্ববোধেই আত্মবোধ; যে আত্মবোধকে তোমরা চোখ বুজে ধর, সেই আত্মবোধই বলছে 'আমার দুর্দশা তখনও শেষ হয়নি, যতক্ষণ না আমি প্রাণকে চিনেছিলাম।'

'প্রাণদেবতা' মানে কি? ওই আত্মত্বের ভিতর রসের যে লহর বা বজ্রের যে ক্রিয়া চলেছে—ওঙ্কারের বুকে যে প্রণবের লীলায়ন—

এই রসময় ও বজ্রময় দেবতার নাম 'আয়ু' বা 'প্রাণ' বা 'প্রণব'। তোমরা 'ওঙ্কার' আর 'প্রণব' একই ব'লে মনে কর, কিন্তু তা ঠিক নয়। তত্ত্বহিসাবে এই দুটি একই, কিন্তু এদের aspect বিভিন্ন। 'প্রণৌতি ইতি "প্রণবঃ'—আপনি আপনাকে যত রকমে সম্ভব নব নব রূপে সাজিয়ে তুলছে, আপনারই স্তুতি আপনি প্রকৃষ্টরূপে করছে—আপনারই সেবা আপনি যত রকমে পারে করছে। এই যে double aspect, 'প্রণব' বলতে একেই mean করে। আর 'ওঙ্কার' হ'ল ওর ব্যাপ্ততমত্বের দিকটা। যতই ব্যাপ্তি নিক্ না কেন—যতই ছুটুক দিগ্‌দিগন্তে, অনন্তে অনন্তে 'প্রণব' দেখছে, ও নিজেকে নিজে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না—নিজেকে ডিঙোবার ক্ষমতা ওর নেই। ব্যাপ্ততমত্বের ভিতর স্বাধীন গতি—স্বাধীন লীলায়ন—স্বাধীন পরিপ্লাবন, এই পূর্ণ স্বাধীনতা হ'ল 'প্রণবের'। আর এত স্বাধীন উদ্বেলনের ঢেউ আর কোথাও নয়, ওই 'অশতম' বা 'ব্যাপ্ততম' নিজত্বেরই ভিতর; এই ব্যাপ্ততম বুকখানা হ'ল 'ওঙ্কারের'।

এইজন্যই চণ্ডীতে বলা হয়েছে, "যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি। যো মে প্রতিবলো লোকে, স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥" এমন যে ব্যাপ্তির উল্লাস তার 'প্রতিবল' কই—as if প্রতিবল! প্রণবের 'প্রতিবল' হ'ল ওঙ্কার (ওঁ)। কেমন প্রতিবল! কেমন দ্রষ্টৃত্ব! কেমন ঋষি! যদি 'ওঙ্কার' ও 'প্রণবে' কথা হ'ত তা হ'লে 'ওঙ্কার' বলত নাকি—"সুন্দরি! তুমি তোমার লীলায়নে যত দূরই যাও না কেন, আমাকে কখনো ডিঙোতে পারবে না"? এ চির পুরাতন—তবু কত মিষ্টি!

—শ্রীগুরুবাণী, রবিবার, ১৭-৬-১৯৪৫

—०:*:०—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহামায়ার স্বসম্বেদনময়ী মূৰ্ত্তি ও তদনুভাব

[চুম্বক :—চণ্ডীর দ্বিতীয় শ্লোকে 'অনুভব' অর্থে বস্তুদর্শন; আর 'অনুভাব' অর্থে বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তিমূর্ত্তি দর্শন। জীবনের ভোগসমূহের মধ্যে সুখের ভাগ অল্প, আর দুঃখের ভাগই অধিক ব'লে বোধ। নিরাশ্রয়ত্ববোধে নিজেকে রক্ষা করার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের অন্বেষণ। গুরুর উপদেশে ভগবৎ আশ্রয় গ্রহণ। কিন্তু সুখস্বাচ্ছন্দ্যভোগে তৎপরিবর্ত্তে নিজবুদ্ধির আশ্রয়ই গ্রাহ্য হয়। স্বতঃসিদ্ধভাবে ভগবদাশ্রয়ের প্রতি নিবিড় ও অটল শ্রদ্ধাবোধ কিরূপে জাগবে? এই জাগরণের ঋষিপ্রদর্শিত পন্থা হ'ল প্রচেষ্টার পরিবর্ত্তে অন্তর্বাহ্যে সর্ব্বত্র ভগবদালিঙ্গন দর্শন। সাধকের লক্ষ্য—সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যবহারশীলা বেদময়ীকে প্রত্যক্ষদর্শন। ইনি নির্লেপ হওয়া সত্ত্বেও সর্ব্বকর্ম্মরতা; নির্ব্বেদ হ'লেও ভালবাসায় আত্মহারা। জীবের ও ভগবানের আত্মহারা হওয়ায় প্রভেদ—ভগবান নিয়মাতীত। ভগবানের স্বসম্বেদনময় মূর্ত্তি—তিনি বহুরূপে আত্মপরবোধে আত্মহারাভাবের লীলায় ব্যাপৃত। ভগবৎলীলা ও জৈব খেলায় প্রভেদ—অসীম ও সসীম আত্মহারা ভাবের বিকাশ। প্রাণের আত্মহারা গতি কিরূপ? ভগবানের মাটী আগুন প্রভৃতি রূপধারণ, ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শিবই ভগবতীর এই লীলায়নের একমাত্র সাক্ষী। অন্তর্বাহ্যে সর্ব্ব-কর্ম্মে শিবশক্তি জীবের একমাত্র সঙ্গী—এই জ্ঞানেই সাধকের নির্ব্বিচারে আত্মহারা হওয়া সম্ভব। চণ্ডীতে উক্ত বিষ্ণুর জাগরণ অর্থে জ্ঞানদেবতার মন্ত্রপ্রভাবে দিগ্বয় আত্মবিস্তার। 'বিষ্ণুকর্ণমল' বা 'শ্রুতিমল' অর্থে বেদময়ীর বেদনকে বিষ্ণুবক্ষে সমাহিত অবস্থায় রাখা; আর বিষ্ণুকে বেদময় ক'রে ফুটিয়ে তোলাই 'বিষ্ণুর জাগরণ'। বেদময়ীকে দর্শন না করলে সাধকের জাগরণ হয় না—'বিষ্ণুর জাগরণ' হয় না। এই দর্শন গুরুকৃপা সাপেক্ষ।

জ্ঞানদেবতার ছয়টি ধর্ম্ম বা লক্ষণ। এই সব ধর্ম্ম না চিনলে দেবতাদর্শন হয় না। 'অগ্নিমীলে'—এই বেদমন্ত্রোক্ত 'অগ্নি' কে?—যে দেবতা ওই ছয়টি ধর্ম্ম ফুটিয়ে চলেন। এই ছয়টি ধর্ম্ম জীবেও

বিদ্যমান কিন্তু দেবগণপ্রদত্ত। সুতরাং এই অনুভূতি জ্বলে উঠ্‌লেই আহুত দেবতার দর্শন হয়। এই জাগরণের ক্রম—(১) কর্ণমলের জাগরণ, (২) কর্ণমলের প্ররোচনায় ব্রহ্মার জাগরণ, (৩) ব্রহ্মার মন্ত্রে বিষ্ণুর জাগরণ—জ্ঞানদেবতার জাগরণ। সকল দেবতা বেদময়ী মায়েরই মহিমা; তিনি ওই ছয়টি ধর্ম্ম নিয়ে জীবের সহিত ব্যবহারশীলা—এই দর্শনে সাধকের নিরাশ্রয়ত্ব-বোধ দূরীভূত হয়। বহ্নি প্রজ্বালনের উদ্দেশ্য—এই ধর্ম্মগুলো ফুটিয়ে তোলা ও মা থেকে ব্যবধান দূর করা। 'মনু' হয়ে মন্ত্র প'ড়ে বহ্নিতে ওই ধর্ম্মগুলি ফুটালে মাতৃ-জাগরণ হয়, এর নাম 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'। কিরূপে এটি সম্ভব? গুরুর দয়ায়, না সাধকের আগ্রহে?]

চণ্ডীর দ্বিতীয় মন্ত্র

চণ্ডীর দ্বিতীয় শ্লোকটি হ'ল :—

"মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ"॥

ঋষি এখানে 'মহামায়া অনুভবেন' বললেন না, বললেন "অনুভাবেন"। 'অনুভব' মানে 'ভবের' অর্থাৎ যা হয়েছে তার অনুবর্ত্তন, আর 'অনুভাব' মানে হ'ল ইনি যে ভাবে সেইটি হচ্ছেন, সেই ভাবে ভাবাপন্ন হয়ে যে ভাব। যদি একে বৃক্ষভাবে ভাবাপন্ন না দেখে শুধু মুখে বল ইনি বৃক্ষ হয়েছেন, তা হ'লে তোমার এই দেখাটি হ'ল 'অনুভব'। আর যে শক্তির বলে ইনি বৃক্ষ হয়েছেন, ভগবতীর সেই শক্তিমূর্ত্তি দর্শন—এর নাম 'অনুভাব'। একটা কিছু হ'তে গেলে তার ভিতর মায়ের বুকের ব্যথা আছে তো? সেই যে ব্যথা বা বেদন, তার নাম 'অনুভাব'। এটির মানে খালি সেই বস্তুটি মাত্র দর্শন নয়। কেমন ক'রে ইনি হয়েছেন সেই বস্তুটি—কেমন ক'রে ধরেছেন সেই মূর্ত্তি, সেইটিকে দেখ্‌লে যে দেখা হয়, তার নাম 'অনুভাব'।

জীবের নিরাশ্রয়ত্ববোধ

কাঁদতে কাঁদতেই জীবন গেল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগ নিয়ে দেখলে দেখি, তাতে একটু সুখ হ'ল বটে, কিন্তু তার ভিতর এমন এক কশাঘাত পেয়ে গেলাম, যে সেই সুখকে সরিয়ে দিয়ে একটা হাহাকার এসে গেল। তখন মনে হয় এত কাঁদলাম—এত দুঃখ ভোগ করলাম বটে, কিন্তু যিনি দিচ্ছেন এত দুঃখ তাঁকে কি ভাল ক'রে গ্রহণ করলাম? ঋষিরা বলেছেন, তাঁকে জানলেই এই যে ক্ষুদ্রত্বের অভিঘাত—সুখটি ছোট আর জ্বালাটা বড় ব'লে বোধ—এটার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। জ্বালাটা বড় এইজন্য যে মৃত্যুই তার অবশ্যম্ভাবী ফল—'পবি'। একটা বেদনের ক্ষুদ্র কুচি তোমার বুকের ভিতরে ভিতরে টান দেয়—অনায়াসে টান দিয়ে চলে যায়—টান ধরছে কি না ধরছে, তাও সে দেখে না। সুতরাং জ্বালাটাই বড় ব'লে বোধ হয়।

জগতে এসে পাঁচজনকে আশ্রয় দেওয়া বা পাঁচ জনের দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করা (পাঁচ জন মানে আত্মীয়দের নিয়েই পাচ জন) এই ব্যাপারেই তুমি মত্ত হ'য়ে রয়েছ। এইরূপে যাদের নিয়ে ব্যবহার কর, তাদের ছেড়ে আর পাঁচ জনকে নিয়ে থাকলেও দেখবে ছ'মাস পরে তারাই হয়েছে তোমার আপন বা 'নিজ'। এই জন্য জগতে সব চাইতে ভাল কাজ হ'ল 'নিজেকে' রক্ষা করা। কিন্তু নিজেকে যেখানে রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারা যায়, তেমন স্থান নেই। এইজন্য ঋষিরা বললেন, ওই যে একটি স্থান আছে ওঁর পায়ে, ওখানে রাখলেই নিজেকে ঠিক রাখতে পার। 'ওঁর পায়ে' এই কথা বলতে 'কে তিনি? কেমন তিনি? কোথায় তিনি?' এই সব প্রশ্ন আপনা থেকেই মনে উঠতে থাকে। একজন আছেন যাঁর তাড়নায় আমরা চলি। ওঁর বুকে যদি আশ্রয় পাই, তবেই নিশ্চিন্ত হই। যখন সুখে থাকি, স্বচ্ছন্দতায় দিন কাটে, তখন

এঁর মূল্য দেখতে পাই না। কিন্তু যখন দুঃখ পাই বা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি, আর অন্তর থেকে হাহাকার উঠে, তখনই মনে হয় 'সত্যই আমি এ জগতে নিরাশ্রয়'। তখন পুনঃ পুনঃ তাঁকে আশ্রয় ব'লে ধরবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে নানা জায়গায় ছুটাছুটি করি, নানা উপদেশ গ্রহণ করি এবং যাকেই বরণীয় ব'লে মনে করি তাকেই বরণ করি। কিন্তু পরিশেষে দেখতে পাই, সে বরণীয় নয়। আশ্রয় যে একজন আছে, বুক তা মেনে নেয়, তত্রাচ সন্ধান পাই না ব'লে, সেই নিরাশ্রয়বোধই থেকে যায়। তখন প্রাণ কাঁদে, বলি "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।" একদিকে নিজের অতীব নিরাশ্রয়ত্বটিই স্মরণে আসে, আর একদিকে জগদীশ ব'লে—জগতের আশ্রয় ব'লে—তাঁকেই আশ্রয় করি। যখন এই আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য সচেষ্ট হই, তারই ভিতর কোনগতিকে আবার স্বচ্ছন্দতা ফিরে আসে। তখন কিন্তু আর "জগদীশ রক্ষ" সে ভাবে বেরোয় না, অর্থাৎ কান্নার ঠেলায় বেরোয় না। তখন এটি শিখতে হবে, ওটি জানতে হবে বা পেতে হবে—এইরূপ প্রাণের ঠেলায় ছুটতে থাকি। তখন আর নিরাশ্রয়ত্বের মত আর্ত্তনাদ উঠে না—একটা কিছু শিখছি বা পেতে চাইছি—এই ব'লে ডাক বেরোয়।

জীবের সাশ্রয়ত্ববোধ ও শ্রদ্ধার উন্মেষ

জীবনের এই যে নিরাশ্রয় ভাব থেকে সাশ্রয় ভাবে উঠা—এই পথে অনেক অন্তরায় আছে। কিন্তু এর কি এমন কোন প্রতিবিধান নেই যাতে সাশ্রয় ভাবটি আমাতে এমন ভাবে ফুটে উঠবে যে তাতে আমার শ্রদ্ধা আর কখনও ছুটে যাবে না,—আত্মার আশ্রয় বলে সে ভাবটি এমন নিবিড় হবে যে তাতে স্বতঃই শ্রদ্ধা আসবে 'আমার পরম প্রিয় ব'লে'? ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোলে যেমন নিশ্চিন্ত হই এবং ঘুম ভাঙলেই যেমন ছেলের

চিন্তা প্রথমেই জাগে—ব'লে উঠি কোথায় গেলিরে বাবা! এমন ক'রে কি ফুটে উঠবে না আমাতে ওই ভাব—'এই আমার আশ্রয়' ব'লে? সকালে উঠে সকলেই হয়তো তাঁকে একটু স্মরণ কর—একবার ঠাকুর ঘরে যাও; কিন্তু তাতে কি ওই ব্যথা—ওই রস বুকে জাগে? তবে এমন কি কেউ নেই যে আমাকে এই শ্রদ্ধা পাইয়ে দেয়?

এই শ্রদ্ধা পাওয়াবার জন্য যে পথ ঋষিরা দেখতে পেয়েছেন সেটি আর কিছু নয়, সেটি হ'ল এই পথ যে পথে দেখা যায়, যত আকারেই এই জগৎ আমার কাছে আসুক—যত রকম সকমেই আমাকে বিবর্ত্তিত করতে থাকুক—প্রত্যেকটাই আমাকে দেখিয়ে দেয় যে যাঁকে খুঁজছি, তিনিই এসে আমাকে বুকে করছেন—আলিঙ্গিত করছেন এবং বলছেন, 'বৎস! আমি এসেছি!' প্রতি বস্তুর ভিতর দিয়ে, প্রতি ডাকের ভিতর দিয়ে, প্রতি চিন্তার ভিতর দিয়ে যদি জ্যান্ত মা—হৃদয়ময়ী মা—সর্ব্বেন্দ্রিয়ময়ী মা এই ভাবে সাড়া দেন, তবেই না আমার 'রক্ষ মাং' বলা ঠিক হবে? আর যতক্ষণ আমার নিজের উপরেই ভরসা থাকে, আর জানা থাকে যে আমি চেষ্টা করলেই হ'তে পারে, ততক্ষণ আমি নিষ্ফল হই; কেননা, আমি দুই একবার দাঁড় মেরে কি করব?—স্রোতের বেগে আমায় সাত হাত পিছিয়ে দেবে যে!

সুতরাং ততক্ষণ সাধনা হয় না, যতক্ষণ না দেখতে পাই 'তুমিই আমায় নিয়ে নানা রকমে ব্যবহার করছ'; এটি দেখলে তবে সাধনা হবে। তুমি করছ—এটা কিন্তু একটা গোঁজামিলের কথা নয়। এরূপ বলা গোঁজামিল দেওয়া কথাই হবে, যতক্ষণ না তুমি দেখতে পাও, তোমারই মতন হাত পা নেড়ে তিনি ব্যবহার করছেন—কথা কইছেন! আর তখনই তুমি বুঝবে তোমার আশ্রয় পাওয়া এখনও হয়নি। এই পথেরই নাম 'বেদ'। 'বেদ' মানে প্রত্যক্ষ

আবির্ভূতি তোমাতে—প্রত্যক্ষ ব্যবহার করা তোমাকে নিয়ে; 'প্রত্যক্ষ' এই কথাটি খালি মনে রাখতে হবে। এই হ'ল এর প্রয়োগ। কেন? উপাসনা যাঁকে করছ ব'লে মনে করছ, তাঁকে ভগবতীই বল, ঈশ্বরীই বল, আর যাই বল, তাঁর আসল নামটি হ'ল 'বেদ' বা 'বেদময়ী'।

ভগবতীর নির্লেপ অবস্থিতি অথচ আত্মহারা ভাব

আমাদের 'করা'টাই স্বভাব, কেননা তাঁর ও 'করা'টাই স্বভাব। তিনিও এই করার ঠেলায় নানারূপে সাজেন, জগৎমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সব করেন; কিন্তু এতসব হ'য়েও কিছু হন না। তাতে তাঁর ভালবাসাটির ত্রুটি হয় না। তুমি যখন কা'কেও ভালবাস, তখন তুমি তাতে আত্মহারা হ'য়ে যাও। তোমার মনে হ'তে পারে যে তিনি তেমন ক'রে ভালবাসতে পারেন না, কেননা তোমার জানা আছে তিনি যতই ভালবাসার ব্যবহার করুন, তিনি নিজে নির্ব্বেদ—কোন বেদনের দ্বারা তিনি কলুষিত বা আত্মহারা হন না। তোমার এরূপ সংশয় হওয়া মস্ত একটা ভুল। কেন? এই যে আত্মহারা হওয়া, এটিই তাঁর ধর্ম্ম। এই খেলায় তিনি জগৎকে পাগল করেছেন, দেবতাদের পাগল করেছেন, আর আপনিও পাগল সেজেছেন। এইরূপ আত্মহারা হওয়াটাই তাঁর পরম পরিচয়।

এই যে তাঁর 'পাগল করা' ও 'পাগল হওয়া'—এটা কিন্তু জড় বিজ্ঞানের কথা বলছি না। এটি হ'ল তাঁর কথা, যিনি পরম চিন্ময় —পরম রসময়। তার পক্ষে কোন law বা বিজ্ঞান নেই। জড় পদার্থের সম্বন্ধে বলতে গেলে বলি যে এটির মধ্যে এই রকম ক'রে এই হয়; এই হ'ল law। কিন্তু চিন্ময়ীর বেলায় সে কথা বলতে পার না। তাঁর প্রাণে কত ভাব, এটি শিক্ষা দেওয়ার

জন্য—তাঁর ওই আত্মহারা হওয়াটি বর্ণনা করার জন্য—মা আমার 'পর' সাজেন—তুনিয়া সাজেন—বহু বহু সাজেন। তুমি যেমন তোমার স্ত্রীপুত্রে আত্মহারা, আমি যেমন আমার স্ত্রীপুত্রে আত্মহারা, ওঁর আত্মহারা হওয়ার খেলাটি তেমন নয়। তার চেয়েও বহু সহস্র গুণে বেশী আত্মহারা হ'য়ে তিনি লীলা করছেন। তাঁর এই আত্মহারা হওয়ার লীলাটি যে দেখতে পেয়েছে, সেই মানুষই 'বেদ' চিনেছে। তা' না হ'লে এ সব কথা হ'ল শুধু কলের মত কথা—জড়ের মত কথা।

যখন তিনি 'স্বসম্বেদন'ময় হন, অর্থাৎ তাঁর বুকখানা যখন বহু হবার জন্য ধড়্ফড়িয়ে উঠে, তখন সেটি ছুটতে থাকে। তখন আপনি গেল কি রইল, সে হিসাব ওতে থাকে না—আপনি কেবল হুড়্ হুড়্ ক'রে বেরুতে থাকে। আবার এই ভাবে 'পর' সেজে যেমনি তিনি বেরিয়ে পড়েন, অমনি তাকে ধরবার জন্য তাঁর পিছু পিছু আপনি ছুটেন—নিজেই আর একজন হ'য়ে বসেন। তুমি যেমন ছেলেকে সাঁতার শিখাবার জন্য ছেলের সঙ্গে সঙ্গে জলে সাঁতার কেটে যাও, তেমনি তিনিও আর এক জন সেজে তোমার আমার পিছু পিছু ধড়্-ফড়্ করতে করতে বুক পেতে ছুটে চলেছেন। আগুন যেমন ঠিকরে ঠিকরে বা'র হয়, তেমনি তিনিও বহু বহু হ'য়ে ছুটে চলেছেন; এরই নাম তাঁর আত্মহারা ভাব। আবার যাঁহাতক ও থেকে এক একটি ভাব নূতন নূতন মূর্ত্তি ধরে বেরুচ্ছে, অমনি তিনি আর এক এক জন হ'য়ে সেই মূর্ত্তিগুলিকে বুকে জড়িয়ে ধরছেন। এইটিকে ঋষি বর্ণনা করছেন এই ব'লে—তিনি খাচ্ছেন—কণায় কণায় ভোজন করছেন। ওই যে তাঁর ঠিকরে পড়া বা বিচ্ছুরিত হওয়া, এ থেকে তুমি জন্মেছ—আমি জন্মেছি। এক দিকে যেমন তিনি আর এক জন সেজে বেরিয়ে আসছেন, আবার অন্য দিকে তারই তলায় তলায় তাকে ধরে নিচ্ছেন। এইরূপ হ'ল তাঁর আত্মহারা ভাবের খেলা।

আত্মহারা ভাবাত্মক লীলা

আমি গীতায় লিখেছি, শ্রীকৃষ্ণ রাধার জন্য পাগল হ'য়ে বাঁশী বাজাচ্ছেন। তিনি কি সত্যিকার পাগল হ'তে পারেন? যিনি নির্ব্বিশেষ পরম পুরুষ, তিনি কেমন ক'রে পাগল হচ্ছেন? যে এই পুরুষটাকে যথার্থ চিনেছে, সে বলবে,—'ওগো তোমায় আমি চিনেছি, তুমি ন্যাকা সেজে ওসব করছ!' কিন্তু এ কথাটা রাধা জানে না—শ্রীকৃষ্ণ জানেন। যদি জানি তিনি নির্ব্বেদ, তবে সে পুরুষ যতই বলুক না কেন তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না, তবু তিনি নিষ্ঠুর পাথর। কিন্তু তিনি যতই পাথর হউন, তিনি ততোধিক পাগল হ'তে পারেন। এটি শ্রীকৃষ্ণেই সম্ভব, রাধায় সম্ভব হয় না। রাধা যদি জানে যে সে কৃষ্ণের জন্য পাগল হয়েছে, তো কৃষ্ণ জানেন তিনি রাধার জন্য সহস্র গুণে অধিক পাগল হন। কেন?—বিজ্ঞানের কথা বলছি। শ্রীকৃষ্ণ তো 'জ্ঞানমূর্ত্তি'। 'ইনি যদি পাগল হলাম' ব'লে জোর দেন, তবে তাঁর চেয়ে কি কেউ বেশী পাগল হ'তে পারে? তা হ'লে এ কেমন ধারা 'পাগল' বুঝে দেখ। সুতরাং এটি 'লীলা'; কিন্তু 'লীলা' বলতে তোমরা সচরাচর যা বুঝ, এ সে জাতীয় 'লীলা' নয়। 'লীলা' মানে খেলা করা—এই আমরা বলি। কিন্তু 'লীলা' শব্দের প্রকৃত মানে 'লীয়তে ইতি লীলা', অর্থাৎ আপনাকে লয় করা বা আত্মলয় করা—আত্মহারা হওয়া। ঘুড়ি কেটেছে দেখলে ছেলেরা যেমন সেটাকে ধরবার জন্য মোটর চাপা পড়া বা অন্য কোন accident (দুর্ঘটনা) হওয়ার কথা না মেনে রাস্তায় ছুটতে থাকে, এও তেমনই। এমনই হ'ল 'লীলা'—লীলার force ঐখানে; আনন্দ করছি বা খেলায় মত্ত আছি—এতে লীলার force নেই; লীলার force হ'ল একেবারে হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে আত্মহারা হওয়ায়। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা এইরূপে আত্মহারা হই, যেমন টাকার কথায়, শরীরের কথায়,

স্ত্রী-পুত্রের কথায়। লীলায় যদি তিনি আমাকে ধরে থাকেন তো আমি দেখি আমি নিজেও তাই। কেন? আমিও তো ওই রকমই হ'য়ে যাচ্ছি—আমিও হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান হারিয়ে ফেলি!

প্রাণের গতি বা পাগল হওয়ার খেলা

এইরূপে যেটিকে ভালবাসি, সেটিই আমার সর্ব্বস্ব ব'লে যে আত্মহারা গতি, এটিকে প্রাণের গতি ব'লে বুঝিয়েছি। প্রাণ যেখানে ছুটে, যেখানে সর্ব্বস্ব নিয়ে উন্মাদ হ'য়ে ছুটে—এই কথা তোমাদের ব'লে দিয়েছি। সেই কথাটিই আজ আর একটু ঝাঝাল ক'রে বুঝাচ্ছি। এইরূপ গতির জন্য আমরা পদে পদে নিজেদের সুখী দুঃখী দেখছি। এটাকে আমরা পাগল হ'য়ে যাওয়া বলি। এইরূপে যে পাগল হয়, তাকে বলি 'ওরে, অমন করছিস্ কেন?—অমন কত যায়, কত আসে!' যে এইরূপ পাগল না হয়, তাকে বলি ধীর স্থির—তার কত সুখ্যাতি করি! কিন্তু এ সুখ্যাতি করা নয়—এ অখ্যাতিই করা হয়। কারণ, ভগবতীর দিকে আমাদের চোখ পড়ে না—তিনি যে পদে পদে এইরূপ আত্মহারা হন! মায়ের ধর্ম্মই এই। তা না হ'লে তিনি কি মাটি সাজতে পারতেন, জল সাজতে পারতেন, আগুন সাজতে পারতেন? এই রকম সেজে তিনি 'শক্তি'র পরিচয় দিচ্ছেন না—পাগল হওয়ারই পরিচয় দিচ্ছেন। আমাদের শিক্ষার জন্য তিনি এই পরিচয় দিচ্ছেন, 'আমি যে মাটি হয়েছি, এতে দেখ আমি কি সুন্দর ভাবে আত্মহারা হ'তে পারি'! সঙ্গে সঙ্গে এটিও শিক্ষা দিচ্ছেন, তিনি যখন পাগল হ'য়ে ছুটেন, অমনি শিবও তাঁর তলায় তলায় ঊর্দ্ধনয়নে চেয়ে থাকেন। যদি তিনি আমাকে দেখিয়ে দেন, আমি যেখানেই যাই না কেন, ওই শিবশক্তিই আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, তবেই আমার সমস্ত ভয় কেটে যাবে, নিরাশ্রয়ত্বের বোধ দূর হবে, আমার পাগল হওয়ার

ইচ্ছা জাগবে—আরও পাগল হওয়ার খেলা বেড়ে যাবে। এই যে 'আরও পাগল হওয়ার খেলা বেড়ে যাবে' বললাম এতে লক্ষ্য করলাম মৃত্যুকে। মোটর গাড়ী ঘাড়ে এসে পড়বে বলে যে পাগল সরে দাঁড়ায়, সে পাগল perfect (পূর্ণ) পাগল নয়। মোটর চাপা পড়বার দিকে লক্ষ্য নেই যে পাগলের, সেই রকম পাগল হওয়া চাই। কেন? মৃত্যুতে সব যে হারিয়ে যায়—মরণের মত ভয়ঙ্কর হারাণো আর নেই। তাই, হে ভগবতি! আমার চক্ষু এমন ক'রে জ্বেলে দাও যাতে আমি নির্ব্বিচারে পাগল হ'তে পারি এবং নির্ব্বিচারে তোমাকে ধরতে পারি। সুতরাং নির্ব্বিচারে পাগল হওয়া এবং নির্ব্বিচারে তাঁকে ধরা, এই হ'ল আমার সার কথা।

বিষ্ণুর জাগরণ বা বেদের অভ্যুদয়

চণ্ডীর প্রথম চরিতে আছে বিষ্ণুর জাগরণের কথা। আমি ঘুম থেকে জেগে উঠা মাত্রই আমার দুনিয়াটি সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল, এর নাম জেগে উঠা তো? একেই বলে বিষ্ণুর জাগরণ। ব্রহ্মাকে মধুকৈটভ হত্যা করতে আসছে দেখে বিষ্ণু জেগে উঠলেন ও ওদের সঙ্গে লড়াই করলেন। এই যে বিষ্ণুর জাগরণ, এটি কি একটি হুলুস্থূল ব্যাপার? ঘুম থেকে উঠা মানেই বিষ্ণুর জাগরণ। এই যে বেদস্বরূপ দেবতার প্রথম উত্থান এটি তুমি লক্ষ্য করনি। তার কারণ, জাগরণ ব'লে তোমার জ্ঞান হ'ল বটে কিন্তু এই জ্ঞানকে 'দেবতা' ব'লে চেননি। জ্ঞানের নাম যদি হয় দেবতা, তা হ'লে ওই জাগরণকে তুমি কি বলবে না, 'জ্ঞান দেবতা জেগেই দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে?' তার নাম 'বিষ্ণুর জাগরণ'। ব্রহ্মা তবে কোন্ দেবতা? সর্ব্বস্ব নিয়ে যে একটি entity—যে সর্ব্বময়তা, এর নাম ব্রহ্মা; আর ব্রহ্মারই নাম 'মন্ত্র'। একটি 'মন্ত্র' উচ্চারিণ মানে ব্রহ্মার সর্ব্বস্ব নিয়ে ফুটে উঠা।

চণ্ডীতে বলা হয়েছে, বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভূত মধুকৈটভ নামে দুটো অসুর জেগে ছুটাছুটি করছে। কর্ণমল মানে কি?—যে শব্দকে 'দেবতা' ব'লে দেখলে সে হয় 'বেদ', তাকেই দেবতা ব'লে না দেখলে সে হয় 'শ্রুতিমল'। যেমন মাটিকে দেবতা ব'লে দেখলে তবেই সে হয় দেবতা, আর তা' না হ'লে সে সামান্য মাটি মাত্র, এও তেমনই। বিষ্ণুকে মা ঘুম পাড়ালেন—এর মানে হ'ল উনি বেদকে বিষ্ণুর বুকে গুড়িয়ে নিলেন—ছুনিয়া 'শ্রুতিমল' হ'ল। উনি যদি বেদ গুড়িয়ে নেন, তা হ'লে হয় 'শ্রুতিমল'; আর তা না হ'লে হয় 'বেদময়।' বিষ্ণু ঘুমিয়েছেন, যদি বেদ হ'য়ে উনি ফুটেন তবেই তো তার নাম 'জাগরণ'? মা ঘুম পাড়ালেন, বেদ গুড়োলেন আর তখন শ্রুতিমল হ'ল। তুমি যেমন এই বৃক্ষটাকে 'দেবতা' ব'লেও দেখতে পার, আবার একে অচেতন ব'লেও দেখতে পার, এও তেমনি। বিষ্ণুকে জাগিয়ে দিলেন মানে বিষ্ণুকে বেদময় ক'রে তুললেন। তা হ'লে 'জাতবেদা' মা—বাক্ যার মূর্ত্তি—তিনি বেদময়ী হ'য়ে দাঁড়ালেন মানে বিষ্ণুকে জাগালেন; আর বিষ্ণুকে ঘুম পাড়ালেন মানে তিনি 'শ্রুতিমল' হ'লেন। বেদময় হওয়া মানেই এই জাগরণ। আমাদের যে নিজস্ব এ তো দিবারাত্রি কর্ণমল হ'য়ে রয়েছে। কিন্তু বেদময়ী মা, ইনিই অসুর রূপে বিষ্ণুর 'শ্রুতিমল' হ'য়ে বিরাজ করছেন, আবার বিষ্ণুকে বেদময় করছেন ও ব্রহ্মা বেদময় হচ্ছেন, এইটা দেখতে হবে।

এই যে জাগরণ' যেটিকে আমি এইভাবে বললাম এই হ'ল চণ্ডীর প্রথম চরিত বা বেদের প্রথম অভ্যুদয়। কিন্তু তুমি তো একে বেদময় ক'রে দেখতে পারছ না! তুমি আত্মহারা হ'য়ে খেলবার অবকাশ কি ক'রে পাবে! তোমাকে প্রতি পদে পদে হিসাবের চালে চলতে হচ্ছে। যা হ'লে তুমি নির্ব্বিচারে চলতে পারবে সে হ'ল বেদময়ী মাকে দেখা। তুমি যদি তোমার

জাগরণকে বেদময় ক'রে তুলতে পার,—বেদের প্লাবনে প্লাবিত ক'রে দিতে পার, তবেই এই জ্ঞানময়তা তোমার practical (ব্যবহারিক) ক্ষেত্রে জেগে থাকবে; জেগে উঠেই যে পরিমাণে বেদময়ীকে দেখবে, সেই পরিমাণে আত্মহারা হ'য়ে নির্ব্বিচারে চলতে পারবে। আর তা না হ'লে জাগরণ তোমার practically (ব্যবহারতঃ) এগোবার পথে অন্তরায়ই হ'য়ে থাকবে।

জ্ঞান ও তার ষড়বিধ ধর্ম্ম

এই যে জাগরণে সত্যি ক'রে দেবতা দেখা, এটি গুরু কৃপা ভিন্ন হবার উপায় নেই। ঋষি যেন তোমাদের কাছে মাকে দোহন ক'রে দিচ্ছেন,—বেদময়ীর স্তন থেকে দুধ বা'র ক'রে উপদেশ দিচ্ছেন, আর বলছেন 'এইটি খা—তবেই দেবতা দেখতে পাবি।' এ তবে কি ?

এই যে 'জ্ঞান বা 'জ্ঞানময়তা'—এ সব কথা কিন্তু একেবারে নিরর্থক হ'য়ে যায়, যদি না এর সঙ্গে দেখতে পাও আত্মময়তা, সর্ব্বেন্দ্রিয়ময়তা, বাঙ্ময়তা, ভোক্তৃত্বময়তা, বীর্য্যময়তা এবং রসময়তা। এইটি যতক্ষণ না তোমাদের মাথায় আসে, ততক্ষণ নির্গুণ সগুণ—যাই বল না কেন, ও সবের কোন মূল্য নেই। 'জ্ঞান' বলতে এতগুলি ধর্ম্ম যদি ওতে না থাকে, তবে ও মাটি হ'য়ে যায়। এ কয়টা ধর্ম্ম তাতে থাকা চাই-ই চাই। তবেই তুমি 'জ্ঞানম্', 'প্রজ্ঞানম্'—যাই বল, ওই সব কথা বলা ঠিক হবে। জ্ঞানকে 'আত্মা' বল, 'পরমাত্মা' বল, 'ভগবান' বল—যা-কিছু শব্দ উচ্চারণ ক'রে বল, তার আগে ওতে ওই কয়টি ধর্ম্ম থাকা চাই। এই হ'ল দেবতা দর্শনের প্রধান লক্ষণ। যখন 'জ্ঞানম্' বললে, তখন মনে পড়া চাই তাকে যিনি আত্মময়, বাঙ্ময়, ইন্দ্রিয়ময়, বীর্য্যময়, ভোক্তৃত্বময় ও রসময়। ''জ্ঞান' যেন একটা প্রদীপ যা নিয়ে তুমি

ভগবান খুঁজতে বেরিয়েছ—ও নয়। টিকে হাতে ক'রে, লণ্ঠন জেলে আর এক জনের বাড়ীতে ধরাতে যাওয়াও যেমন, তোমার ভগবান খুঁজতে যাওয়াও তেমনি। এই যে জ্ঞান ওই ভগবতী— এই ব'লে যদি ওকে বরণ করতে পার তো দেখবে টিকে আপনিই ধরে গেছে সেই ক্ষণেই। অপর কারো কাছে যেতে হবে না। তা হ'লে আত্মময়তা, বাঙ্ময়তা, ইন্দ্রিয়ময়তা, বীর্য্যময়তা, রসময়তা ও ভোক্তৃত্বময়তা যার স্বরূপধর্ম্ম, তাঁরই নাম জ্ঞানদেবতা। এই হ'ল যাঁর পরম স্থিতি, তাঁর এই ধর্ম্মের একটাকেও বাদ দিলে তাঁকে কেটে ফেলা হয়।

অগ্নি প্রজ্বালনের উদ্দেশ্য

আত্মময়তা, বাঙ্ময়তা প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি নিয়ে যে জ্ঞানদেবতা ফুটে উঠে, বেদে তার নাম 'অগ্নি।' এই জন্য বেদের প্রথম মন্ত্র হ'ল "অগ্নিমীলে"—প্রভৃতি। এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে যখন যজ্ঞ আরম্ভ করি, তখন এই দেবপ্রকাশকেই আহ্বান করি। আমি এই "অগ্নি" জেলে চলেছি যত দেবতা ফুটিয়ে তুলতে। তার মধ্যে আত্মময়তা একটি দেবতা, ইন্দ্রিয়ময়তা একটি দেবতা, বাঙ্ময়তা একটি দেবতা, ইত্যাদি। যে 'আমি' জ্বললে সব জ্বলে, তাকে বলছি 'অগ্নি'। অগ্নি প্রজ্বলিত হ'ল—বাক্ প্রজ্বলিত হ'ল—কথা ফুটল—আর তাতে বেরুল আত্মময়তা, বাঙ্ময়তা, ইন্দ্রিয়ময়তা, ভোক্তৃত্বময়তা, বীর্য্যময়তা ও রসময়তা। এই সব ফুটিয়ে যিনি চলতে থাকেন, তাকে ডাকছি 'অগ্নিমীলে' ব'লে।

যখন আকাশকে বললাম 'দেবতা', বাতাসকে বললাম দেবতা, জলকে বললাম দেবতা, তখন ওই সব ধর্ম্মগুলি জ্বলে উঠলে তবেই দেবতা দেখা ঠিক হবে। নইলে 'সর্ব্বেভ্যো-দেবেভ্যো নমঃ' বললে কি হবে? তুমি হয়তো বলবে মশায়, আমি বললাম বটে,

কিন্তু আমার আকাশ আকাশই থাকে, আমার জল জলই থাকে—কই, দেবতা তো ফুটে না, তার হাত পা তো বেরোয় না, সে তো কথা কয় না!' এই তো তোমার নালিশ? আচ্ছা, আকাশের, বাতাসের, জলের—এদের ইন্দ্রিয়ময়তা প্রভৃতি আছে? ওদের যদি নেই, তো তোমার কী আছে বল তো? তোমার হাত আছে, পা আছে? এই যে তোমার হাত পা চোখ কান এই গুলি কোথা থেকে তুমি পাচ্ছ? এই গুলি কি তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি? যে বাপের সম্পত্তি ব'লে তুমি এসব পাচ্ছ, সেই বাপকেই আমি আঁকছি;—যে আকাশ থেকে, বাতাস থেকে, জল থেকে, মাটি থেকে ওগুলি পাচ্ছ তাদেরই আঁকছি। এই আকাশ, বাতাস প্রভৃতি থেকে যে constant flow (অবিরাম প্রবাহ) আসছে তারই ফলে তুমি নিজেকে ইন্দ্রিয়ময় ও প্রাণময় বলছ। এরা দিচ্ছে ব'লে তুমি ভোগ করতে পাচ্ছ ইন্দ্রিয়ময়তা, প্রাণময়তা প্রভৃতি। এর অনুভূতি জেলে তবে তোমার জ্ঞান হচ্ছে।

সুতরাং এই জগৎটি দেখে তবেই তুমি অনুভূতিময় হচ্ছ। আগে 'কর্ণমল' জেগে উঠেছে। সেই শব্দগুলি তোমার ভিতর যখন বজ্ বজ্ ক'রে উঠে, আর খিমচি কাটতে থাকে, তার নাম হ'ল স্ত্রী পুত্র টাকা বাড়ী ঘর ইত্যাদি। তখন তুমি ঘুম থেকে জেগে উঠ। এর নাম ব্রহ্মাকে ও বিষ্ণুকে জাগিয়ে তোলা। এই হ'ল বিষ্ণুর বিশ্বব্যাপী মূর্ত্তি ধারণ করা। যে বিষ্ণু ওইখানে এইরূপ বিশ্বব্যাপী হ'য়ে জেগে, সেই বিষ্ণুই তোমার জন্য এখানে তোমার বিষ্ণু হ'য়ে জেগেছেন, ওখানে গাছের জন্য গাছের বিষ্ণু হ'য়ে জেগেছেন। এই জাগরণ হ'ল বেদবিজ্ঞানের প্রথম বিজ্ঞান। বেদময়ী মায়ের প্রথম ক্রিয়া হ'ল ঘুম ভাঙান।

এমন মাকে কি তুমি দেখতে চাও যে মা তোমাকে নিয়ে সত্যি ব্যবহারশীলা হয়েছেন? এই ব্যবহার গুলি যদি তিনি আত্মময়

বাঙ্ময়, ইন্দ্রিয়ময় ও প্রাণময় হ'য়ে করেন, তবেই তো তোমার দুঃখ দূর হয়। যদি দেখ, ওই আকাশ, ওই বাতাস, ওই মাটি—ওরা সব ভিন্ন ভিন্ন দেবতা হ'লেও এক দেবতারই মহিমা, এবং এই দেবতা তোমাকে এইরূপে আত্মময়, বাঙ্ময়, ইন্দ্রিয়ময়, বীর্য্যময়, ভোক্তৃত্বময় ও রসময় করছেন, তবেই তো তোমার নালিশ দূর হবে, আর "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ" বলতে হ'বে না।

তিনি যে এসর্ব করছেন, এগুলি আমি পাচ্ছি ঠিক—কিন্তু তিনি দিচ্ছেন, তাই আমি পাচ্ছি। আমার বুকে এই ফাঁক তিনিই পূরণ করছেন, বা বুজিয়ে দিচ্ছেন—এটি যদি আমি দেখতে পাই, তবেই হবে আমার আত্মময় হওয়া, ইন্দ্রিয়ময় হওয়া, রসময় হওয়া ও প্রাণময় হওয়া। এইটিই আমার যা কিছু 'পবি'—it is nothing but realisation of পরম দেবতা (ইহাই পরম দেবতা জ্ঞান)। এইটি দেখার জন্যই দরকার হয় 'বহ্নি' বা 'বহিরগ্নি' প্রজ্জ্বালন।

এই আত্মময়তা ও প্রাণময়তা দেখলেই দেখা হবে জ্যান্ত মায়ের কোলে জ্যান্ত পুত্রের বসা। এই আত্মময়তা, প্রাণময়তা ইত্যাদি যা-কিছু কথা বললাম, এই গুলি যদি বাইরে ও এখানে ফুটে উঠে তার নাম হবে তোমার বেদকে জেলে তোলা, এবং তখনই ঘুচবে আমার নিরাশ্রয়তা।

বেদময়ী চণ্ডিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা

মা যেমন ক'রে আমাকে ফুটিয়ে তুলেছেন, আমিও তেমনই ক'রেই 'বহিঃ'কে বা 'বহ্নি'কে আত্মময়, ইন্দ্রিয়ময় ও প্রাণময় ক'রে তুলব। যে উপায়ে এটি সম্ভব, তার নাম হ'ল মন্ত্র পড়া। মা যেমন আমাকে 'মন্ত্র' পড়ে ফুটিয়েছেন আমিও তেমনই মাকে মন্ত্র পড়ে জাগাব। ফুল দেখে মুখে বলছি তুমিই ফুটছে; কিন্তু ফুটাতে হ'বে এই ফুলকে ফুলদেবতা ক'রে, আর সেই ফুল হবে তখন আত্মময়,

বাঙ্ময়, ইন্দ্রিয়ময়, ভোক্তৃত্বময়, বীর্য্যময় ও রসময়। এটিকে আমরা বলি 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করা। মায়ের বেলায় যেমন পুঁজি হ'ল 'মন্ত্র', আমার বেলাও পুঁজি হবে 'মন্ত্র'। এই মন্ত্রওয়ালা পুরুষ হওয়াকে 'মনু'হওয়া বলেছে। যদি কেউ এখন বলে আমার ভগবতী দেখা যাচ্ছে না, তা হ'লে তাকে আমি কি উত্তর দেব?—তুমি 'মন্ত্রময় পুরুষ' হওনি।

তবে যদি বল 'গুরুর দয়া হ'লে সম্ভব হবে' তা হ'লে বলতে হয় এ হ'ল এক vicious circle (অলাতিচক্রবৎ যুক্তি)। যেমন ডাক্তারেরা বলে, মাথা খারাপ হ'লে পেট খারাপ হয় এবং পেট খারাপ হ'লে মাথা খারাপ হয়, তেমনি তোমার আগ্রহ হ'লে গুরুর দয়া হবে, অথবা গুরুর দয়া হ'লে তোমার আগ্রহ হবে।

—শ্রীগুরুবাণী, রবিবার, ২৪-৬-১৯৪৫

—০:*:০—

তৃতীয় অধ্যায়

মন্ত্রশক্তিরূপিনী চণ্ডিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

চণ্ডীদ্রষ্টা বা মন্ত্রমূর্ত্তিদ্রষ্টা মনু

[চুম্বকঃ—মনুর পুত্র 'মানব' দেখবে 'জগৎ' মন্ত্রশক্তির বা বিদ্যুৎ শক্তির খেলা মাত্র। 'মন্ত্র' বা 'কথা'ই রূপ ও রস বা প্রাণশক্তির রচয়িতা। সূর্য্যলোকও রূপ এবং রসেরই অভিব্যক্তি। ভগবতীর নাম আনন্দময়ী কেন? এই তত্ত্ব সাধকের প্রাপ্তব্য। এই চিন্ময়ী শক্তির দ্রষ্টার নাম 'মানব।' 'মন্ত্র' কিরূপ? মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষই 'মনু' আর মনুত্ব দ্রষ্টার নাম 'মানব।' সমগ্র চণ্ডীতত্ত্ব 'মনু' শব্দটির অন্তর্নিহিত। চণ্ডিকার এই স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ দর্শনের সার্থকতা'। 'মনু' শব্দের 'ম' ও 'নু' অক্ষর দুইটির অন্তর্গত অর্থ।

চণ্ডী ও বেদ একই তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মন্ত্র গুরুর নিকট কিরূপে গ্রহণীয়? ব্রহ্মজ্ঞান অর্থে 'ম'তে বা ব্রহ্মে নতিময় বা স্তুতিময় হওয়া—'নবদুর্গা' হওয়া। 'সুরথ রাজা' ও 'সমাধি বৈশ্য' —এই উপাখ্যানের অন্তর্নিহিত রহস্য। মানব জীবনের লক্ষ্য— নিবিড় মাতৃবক্ষে নিবিড় সোমপায়ী পুত্ররূপে আত্মপরিচয়।]

মনুপুত্র মানবের জগদ্দর্শনের বৈশিষ্ট্য

তুমি মানুষ হ'য়ে জন্মেছ মানেই তুমি মনুর পুত্র—মনুর আত্মজ— মনুর টুকরা। মনু হ'ল ব্রহ্মার পুত্র—মন্ত্রময় পুরুষ। তা হ'লে তোমার কাজ হ'ল বাইরে যে বিপুল আত্মশক্তি দেখতে পাচ্ছ, এটা যে অনাত্ম নয়—মন্ত্রশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি—এটা দেখা। মন্ত্র মানে এমন একটি 'কথা', যাতে চলছে একটা হৃদয়ের খেলা বা রূপ ও রসের প্রকাশ। একটা হার্দ্দ তেজ তাতে থাকবেই। রেডিওতে যেমন

আলো ও শব্দ যুগপৎ প্রকাশ করে, তেমনি চেতনরূপ এই তেজ রূপ ও রস ফুটাতে ফুটাতে চলে। ওর ধর্ম্মই এই। যেটি ফুটে উঠল অর্থাৎ বৈখরী, সেটিকে তোমরা 'শব্দ' ব'লে গ্রহণ করছ। কিন্তু ওটি মাত্র শব্দ বা কথা নয়। 'কথা' এমন একটি জিনিষ যে সেটি একদম বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎই যে স্থূলজগৎ, এ কথাটা তোমরা জান। বিজ্ঞান শিখিয়েছে, এ জগৎটাতে energy বা শক্তি ছাড়া আর কিছুই নেই, এর প্রতি পদার্থই তেজের ঘূর্ণাবর্ত্ত। সুতরাং কথা মানেই বিদ্যুৎ আর বিদ্যুৎ মানেই স্থূলজগৎ। কথাটিই রূপ ধরে; কথা দ্বারা যে রূপ প্রকাশ হয় তা নয়—কথাটিই construct (রচনা) করছে রূপকে। কথাটির এক পিঠে ফুটছে এই স্থূলজগৎ, আর এক পিঠে চলছে রসের খেলা। এই যে কথা দ্বারা 'রূপ' ও 'রস' আলোড়িত হ'ল, এ কিসের রস? এ 'প্রাণ', যাঁকে বলে বেঁচে থাকা। এ যদি এক দিকে 'ভূতমাত্রা' আর এক দিকে 'প্রজ্ঞামাত্রা' না নেয়, তা হ'লে তোমার বেঁচে থাকা হয় না।

সূর্য্যলোকেও জীব আছে। তাদেরও 'তেজ' আছে, তার নাম 'রস'। তোমরা সূর্য্যের জ্যোতি যা দেখ, সেটা হ'ল ভূতজ্যোতি। কিন্তু আসল যে জ্যোতি সেটি হ'ল "কোটিসূর্য্যসমপ্রভ—কোটিচন্দ্র-সমশীতল"।

'ভগবতী' হলেন স্বয়ং রূপময়ী; সে স্বয়ম্‌রূপ কি, তা ভাষায় বলা যায় না। 'রূপ' মানে প্রকাশ, 'প্রকাশ' মানে দীপ্তি, 'দীপ্তি' মানে আনন্দ। যত 'প্রকাশ' তত আনন্দ। 'আনন্দ' মানে সুখ-দুঃখপ্রকাশহীনতা।

এইগুলি তোমাকে পেতে হবে। এইগুলি কল্পনা নয়; তোমাকে ঠিক তাই হতে হবে। তদ্ধর্ম্ম তোমাতে খেলা করবে—তুমি তাই হ'য়ে যাবে। এর নাম দেবতা প্রকাশ। এগুলি নিবিড় ভাবে তোমাকে পেতেই হবে!

'মানব' নামের সার্থকতা

তা হ'লে মানব হ'ল সে, যে (জড়) শক্তিকে না দেখে দেখবে এই চিন্ময়ী শক্তিকে। (জড়) শক্তি কিছুই নয়—এ একেবারে এঁরই subservient (অধীন)—এঁরই দ্যুতি—এঁরই প্রকাশ—এঁরই আনন্দ। আমের গায়ে যেমন ছাল পড়ে যায়, তেমনই এ যেন একটি ছাল পড়ে আছে।

তোমার প্রথায় শিক্ষাই হ'ল 'ইনিই সব'। তা হ'লে যদি কিছু বাইরে পড়ে থাকে তো, 'ইনিই সব' এই কথা বলা একটা গোঁজামিল দেওয়া কথা; অর্থাৎ তুমি তা হ'লে চিন্তনীয় ভগবানকে পেলে, কিন্তু practical (ব্যবহারিক) ভগবানকে পেলে না। বাইরে কিছু পড়ে থাকলেই ওর নাম হ'ল 'গ্রাসিনী শক্তি'; ও তোমাকে অধীন ক'রে তুলবে। ওকে বলে subjective (আত্ম-ভৌতিক)—তদনুসারে যেন একটা কিছু হচ্ছে। কিন্তু একটা কিছু তো আছে যা তদনুসারে হয় না। তা হ'লে নিশ্চয়ই objective (ভৌতিক) একটা কিছু আছে। প্রাণ আমার যা খুসী তা করল, আর অমনি সেটি একটি চেহারা নিয়ে চলল। এই যে শক্তি, এটি যখন স্থূলত্ব প্রাপ্ত হবে, তখন তার নাম 'মন্ত্র'। তখন তুমি যদি বল 'ঘর', তা হ'লে মাঠের মাঝে একটি ঘর হবে। এই মন্ত্রকে যে চিনেছে, তার নাম 'মনু'; আর এই মনুত্বকে যে চিনেছে তার নাম 'মানব'। স্বাধীন ওই গতিটিকে চেন; ইচ্ছাময়ী মায়ের—প্রাণময়ী মায়ের—কামময়ী মায়ের এই গতি। সকল রচনাই যে তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে, এটা যদি তুমি দেখতে না পাও, তবে তুমি কেমন ক'রে ইন্দ্র হবে?

মন্ত্র ও মন্ত্রশক্তি

'মানুষ' মানে, যে মন্ত্রত্বের ধর্ম্ম বা মন্ত্রশক্তি পেয়েছে। মনুষ্য নামের সার্থকতা এখানে। তা হ'লে মানুষ হ'ল যে গৌরীকে

চিনেছে। "গৌরী মিমায় সলিলানি তক্ষতি"—গৌরী বাক্যকে গড়িয়ে গড়িয়ে সব রচনা করছেন। খালি কথায় একটি বুকের প্রকাশ! কি অপূর্ব্ব প্রকাশ! চন্দ্র হ'ল, সূর্য্য হ'ল, নক্ষত্র হ'ল আকাশ হ'ল—খালি এক একটি কথা! এ মা তোর এমন রে! রূপের উপর রূপ ফুটিয়ে চলে! এ না দেখলে তোমার চণ্ডী পড়া হবে না। এটি যতই দেখতে থাকবে, ততই ইন্দ্রিয়, যশ, বীর্য্য, সামর্থ্য ইত্যাদি তোমাতে ফুটতে থাকবে। তাঁকে চিনলে তবে তোমার নাম হবে 'মানব' বা মন্ত্রময় পুরুষ বা মনুর তনয়। 'মকারাদি নুকারান্তঃ'—এই 'মনু' শব্দটির মধ্যে গোটা চণ্ডী রয়েছে। চণ্ডী তা হ'লে হ'ল মনুর বিস্তার। মন্ত্র কি মূর্ত্তিতে খেলা করছে তার নাম চণ্ডী। তোমার একটি কথায় মধুকৈটভ বধ হয়, মহিষাসুর বধ হয়, শুম্ভনিশুম্ভ বধ হয়, দেবতারা 'হবির্ভুজঃ' হয় আর তোমার বিশ্ব খুলে দাঁড়ায়। কি ভাবে হয় সেটা দেখার নাম 'চণ্ডী'। তোমার এমন একটি কথার নাম মন্ত্র, আর ওই যে প্রবাহ ওটি হ'ল মন্ত্রের মন্ত্রত্ব। এ গৌরী মা চিন্তনীয় নয়, ধ্যেয় নয়, এর স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম হ'ল রূপপ্রকাশ। দর্শনশাস্ত্র বিশ্লেষণ ক'রে বলেছে এটা তত্ত্ব, এটা তন্মাত্রা, ইত্যাদি। আমি বলছি ও সব চিন্তাধারা মাথা থেকে দূর ক'রে দাও। একটি কথার নাম আর কিছু নয়—এক সঙ্গে মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ ও শুম্ভনিশুম্ভ বধ।

মনুষ্যত্বলাভ কিরূপে হয়

সব প্রকাশের গোড়ায় 'ম' আর ডগে 'নু'; 'ম' মানে যেখানে সব প্রলীন ও জাত হয়, আর 'নু' মানে স্তুতি। যে ফুটে উঠল, সে আর কিছু নয়—ওই 'ম'এরই স্তোতা। "ওগো মা" ব'লে যে কথাটি আমি বলি, তুমি বল—ওই কথাটি স্থূল 'মনু' হ'য়ে জন্মায়। এক পিঠে পরম অনির্ব্বচনীয় (ম) আর এক পিঠে হ'ল স্তূয়মান্ (নু)।

এ যদি না হয় তো 'ম' হ'য়ে যায় মৃত্যু, আর 'নু'—কিছু নয়। তখন তুমি আন্দাজে আন্দাজে বলবে ভগবান্। তুমি যে ব্রহ্মে প্রলীন হবে সর্ব্বত্র, তার মানে তোমার হাত পা তো দূরের কথা, যত দূর তোমার মন প্রাণ পর্য্যন্ত যেতে পারবে তত দূর 'মা' রয়েছে, আর স্তুতি মানে ওর অবাধ স্বীকার "আঃ তুমি মা! আঃ আমি"! এমনি ভাবে দেখে দেখে যখন যেতে পারবে, তখন তুমি হ'লে 'মনু'। যে 'মানব' হয় সে চণ্ডীপাঠ করলে 'মনুষ্যত্ব' লাভ করে—'মন্ত্র' প'ড়ে—'বজ্র' ফুটিয়ে, "ওষ্ঠাপিধানা নকুলী দন্তৈঃ পরিবৃতা পবি"।

এই যা বললাম, তার ভিতরের ব্যাপারটি কি?—চণ্ডী জানলে 'বেদ' হবে, আবার বেদ হ'লে 'চণ্ডী' হবে; 'চণ্ডী' মানে 'বেদ'। যা বললাম এরই আকার—এরই moulding—এরই ছাঁচ হ'ল 'চণ্ডী'। এই আলো যদি না পাও তো আমি ব'লব, তুমি ব্যর্থতায় ভরে আছ এখনও। এ কি বই লিখে শিখাব? এর নাম মন্ত্রদান—এর নাম দীক্ষা—এর নাম উদ্ধার! তোমাদের কত বড় ধন আছে. তোমরা তা জানতে না। কিন্তু অযোগ্যকে এই জ্ঞান দেওয়া হবে না। কী রত্ন লাভ করলাম! এই ভাবে সমাদরে যে একে বুকে ধরে না রাখে, সেই অযোগ্য। ফর্ ফর্ ক'রে ব'লে বেড়াবার জন্য এই সব জ্ঞান দিচ্ছি না—ব্যবহার করবার জন্যই দিচ্ছি। এ জ্ঞান এমন অদ্ভুত যে "নিজে কীর্ত্তিমান হব" এই কামনা যার থাকবে, তার 'নু' কেটে গেল; সে আর পারবে না ওখানে ঢুকতে। এই জন্য গুরুর চরণে নত হওয়া—এইটি তোমাদের দরকার।

'মানুষ' হ'ল সে, যে অসুর জয় করে মনের দ্বারা, অর্থাৎ 'কথা'র দ্বারা। জীবন যদি বাঁচাতে চাও তবে 'মানুষ' হও। "হাম্ কেও-কেটা নয়"—এইটা হ'ল আসুরিক ভাব। 'ব্রহ্মজ্ঞানি' মানে হ'ল

ব্রহ্মে একেবারে নতিময়—স্তুতিময় হওয়া। এই যে 'নু' বা নত হওয়া বললাম—যে মাকে প্রণাম করার কথা বললাম, এ কি যে সে মা? তুমি থাকবে কাঙ্গাল, আর সে থাকবে রাজরাজেশ্বরী হ'য়ে সিংহাসনে বসে! এই কি মায়ের ধর্ম্ম? নু' মানে 'নবতি' —'নবদুর্গা'। তুমি 'দুর্গা' বলতে না বলতেই তুমি নিজে 'দুর্গা' হ'য়ে 'দুর্গা' বলতে থাকবে—'মা' বলতে না বলতেই 'নবদুর্গা হ'য়ে সোম পান করতে থাকবে। ও আসতে না আসতেই তুমি দুর্গা হ'য়ে যাচ্ছ—এই রকম হ'ল 'নতি'; তুমি হ'লে কাঙ্গাল, আর ও হ'ল রাজরাজেশ্বরী—এই রকম 'নতি' নয়। তুমি যতই চলতে থাকবে, ততই তুমি দেখবে আমি "মায়ের মত হ'য়ে মায়ে এসে পড়েছি"—এর নাম 'নবদুর্গা'। এইবারে 'প্রণত' হওয়া কথাটি বুঝতে পেরেছ? আগে বললাম যা, তা স্পষ্ট ক'রে ধারণা কর; তারপর তাঁ'তে 'প্রণত' হও, তার পর হ'ল 'নবামি'। দুর্গা বলতে গিয়ে 'দুর্গা' হ'য়ে গেলাম, 'কালী' বলতে গিয়ে কালী' হ'য়ে গেলাম— এই রকম সব। আমার আলো—আমার ধারা—কোন্ দিক দিয়ে ছুটছে, এটি তোমাদের মাথায় ঢুকছে? তোমাদের এই সব কথা বলছি শুধু মানুষ করবার জন্য।

সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য

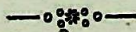
'চণ্ডীর' প্রথম উপাখ্যান হ'ল 'সুরথ' রাজা ও সমাধি 'বৈশ্য' 'মেধস্' ঋষির কাছ থেকে উপদেশ নিয়েছিল। ভগবৎ লাভের দু'টো পা—"দেবাব ব্রহ্মণো রূপে।" প্রকাশ মানেই হ'ল 'দুটো পা:—(১) তস্মিন্ বিশতি, (২) তস্মিন্ রমতে; অর্থাৎ ব্রহ্ম হ'য়ে যাব এবং ব্রহ্মবৎ রমণ করব। 'তস্মিন্ বিশতি'—এই হ'ল বৈশ্য; আর 'তস্মিন্ রমতে'—এই হ'ল সুরথ রাজা। 'আপ্তকাম হ'য়ে রমণ করব'—এই হ'ল সুরথ। একটি হ'ল তাঁর অঙ্গেই তাঁতে সম্যক্

রূপে অধিষ্ঠিত হওয়া ; আর একটি হ'ল 'মন্থ' হওয়া অর্থাৎ মন্ত্রময় হওয়া অর্থাৎ আপ্তকাম হওয়া। একদিকে সে একদম 'মা' ; আর এক দিকে সে 'রমতে'—আপ্তকাম হ'য়ে। কেমন ক'রে আপ্তকাম হতে হয়? মন্ত্র পড়ে'। "দন্তৈঃ পরিবৃতা পবি" ফুটিয়েছে এই বজ্রকে।

জীবনের উদ্দেশ্য

অতীব গভীর রহস্যময় বিদ্যা আজ তোমাদের কাছে প্রকাশ করলাম। জীবনের উদ্দেশ্য বা বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছ? কোথায় যেতে হবে—এটি তোমাদের চোখে আজ ফুটে উঠেছে? এইবার বলতো "কামেন কাম ম আগন্ হৃদয়াৎ হৃদয়ংপরি"—কত মায়ের বুকের বাছুর হ'য়ে এই কথাটি বলতে হয় বা এই কথাটি মুখ দিয়ে বা'র হয়! এর ভিতর অভাবের জ্বালা pass করবার (চলবার) জায়গা আছে? এক নিবিড় বুকের নিবিড় রস-পানকারীর হ'ল এই কথা। এক নিবিড় বুক থেকে সোম ঝরছে, আর সেই সোমপায়ীর এই কথা! একটি সত্য ভূমিতে—একটি realityর ভূমিতে—তোমাদের নিয়ে যাবার জন্য চলেছি এটি মালুম হচ্ছে? স্বর্গের আলো এইবার প্রকাশ হচ্ছে?

—শ্রীগুরুবাণী, রবিবার, ৪-২-১৯৪৫



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রদ্রষ্টার চণ্ডীপূজা

[চুম্বক :—মন্ত্রদ্বারা পূজা কিরূপ? ঈশ্বরত্ব, আমিত্ব ও জগৎ—এই ত্রিতত্ত্ব একসঙ্গে ফুটতে দেখলে হয় মন্ত্রময় পুরুষ বা মনু। 'মনু' শব্দের 'নু'কারের অর্থ—নব রূপ ধরা। ভগবতী নব রূপ ধরে আনন্দময়ী হন। 'ম'কার থেকে উৎপন্ন 'রূপ' ও 'পুর'। তৎদ্রষ্টাই মন্ত্রদ্বারা পূজক হওয়ার যোগ্য। চণ্ডিকা বা দুর্গারূপের প্রতি অংশই চণ্ডিকা বা দুর্গা। এই দেবীর পূজা হয় হ্রীঁ মন্ত্রে। এই মন্ত্র পড়া মানে 'হংসে' চড়া। 'হংস' শব্দের নিরুক্তি—হনন ও সোমপ্রকাশ। চণ্ডীর প্রথম চরিতের ঋষি ব্রহ্মা কেন? প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মন্ত্র। মার্কণ্ডেয়কে কেন 'বেদজিহ্ব' বলা হয়? প্রত্যক্ষ ভগবতী দর্শন কিরূপ?]

মন্ত্রপ্রকাশ কা'কে বলে? "মকারাদি নুকারান্তঃ" অর্থাৎ 'ম'কার থেকে 'নু'কার পর্য্যন্ত প্রকাশ যার ভিতর তার নাম মন্ত্র। রাত্রে তুমি ঘুমিয়েছিলে, তখন তোমার জগৎ ছিল না। যেখানে তুমি ও তোমার জগৎ প্রলীন হ'য়ে ছিল সেই হ'ল 'ম'কার। তা' থেকে জেগে তুমি আবার ফুটলে। যিনি ফুটালেন তিনিই হ'লেন ঈশ্বরী, আর তিনিই সঙ্গে সঙ্গে নিজেই জগৎরূপে ফুটলেন। এই হ'ল জগৎ, তুমি ও ঈশ্বরী। যে এই তিনটিকে প্রতি মন্ত্রে যুগপৎ ফুটাতে পারে সে হ'ল মন্ত্রময় পুরুষ। সে দেখে, যা-কিছু ফুটছে তা এই তিনটির সমবায় ছাড়া আর কিছু নয়। তখন সে হয় ব্রহ্মা, আর তার মন্ত্রাবলম্বনে পূজা হয়। এর মানে ব্রহ্মাকে আগে ক'রে পূজা করা। মন্ত্রপ্রকাশ, আমি প্রকাশ এবং যে প্রকাশ হচ্ছে বা যাতে সব প্রলীন হচ্ছে এই তিনটি একসঙ্গে মন্ত্রাবলম্বনে দেখা—এই হ'ল জ্যান্ত বিজ্ঞান। এমন ক'রে ফুটবার শক্তি যাঁতে রয়েছে, তাঁকেই তোমরা পূজা করেছ 'দুর্গা' বা 'চণ্ডিকা' বলে। এর আসল

নাম হ'ল 'চণ্ডিকা'। 'ম' অর্থাৎ যেখান থেকে সব বেরুচ্ছে, তার ভিতর তালগোল বেঁধে ঈশ্বরত্ব, আমিত্ব, জগৎ—সব রয়েছে। আর নু' অর্থে, যে আবার ফুটে বেরুল—নবত্ব প্রাপ্ত হ'ল। ইনি আত্মমহিমায় আপনি ফুটলেন বা আপনি আপনাকে বরণ করলেন বা স্তব করলেন বা 'নূত' হ'লেন।

একখানা ভাল কাপড় পরে' তুমি নিজে নিজে বল না কি, "বাঃ বেশ মানিয়েছে!" তুমি নিজে নিজের স্তব কর, বা নিজের তৃপ্তিতে মসগুল হও কি না দেখতো! ইনিও যেখান থেকে বেরুলেন, আবার সেইখানেই স্তুতি করলেন। 'তৃপ্তি' মানে তর্পিত হওয়া। যিনি আপনি সাজলেন, তিনি আপনি তৃপ্তিভোগ করলেন। এর নাম 'নত হওয়া' বা 'নব রূপ ধরা'। কে কার স্তব করবে? পণ্ডিতেরা এঁকে ভাগ করতে গিয়ে মরে। এ অংশটাই করুক আর ও অংশটাই করুক—'ও কে?'—এটা দেখতে হবে।

চণ্ডিকার রূপপ্রকাশ ও তৎদ্রষ্টা পুরুষ

প্রতি প্রকাশে 'ঈশ্বরী', 'আমি' ও 'জগৎপ্রকাশ'—আর তার দু'টা সীমায় 'ম' ও 'নু'। তুমি যেমন গহনা পরে' বিভোর হও, মাও আমার তেমনি আপনার দ্বারা আপনি বিভোর হন। একটি বিজ্ঞান হ'ল—ফুটে উঠল; আর একটি বিজ্ঞান হ'ল—'ফুটে' উঠলেই স্তব করতেই হবে। যেমন পয়সা আসাও যা, আর আনন্দ হওয়াও তাই। ভোক্তা, ভোগ্য ও মহেশ্বর—এই তিনটি নিয়েই যা-কিছু প্রকাশ হচ্ছে। এই জন্যই রূপকে এত অভ্যর্থনা করা। "ওহে রূপ! তুমি আমার সর্ব্বস্ব এবং ভগবতীর সর্ব্বস্ব!" 'রূপ ফুটেছে' মানে, আমাকে যে বেড়েছে, ভগবতীকেও সেই বেড়েছে।

'রূপ' শব্দটাকে উল্টালে হয় 'পুর'। যাঁহাতক ফোটা অমনি হ'য়ে গেল একটা 'পুর'। এইবার 'দুর্গা' বল। 'ম'কার থেকে

যাঁহাতক বেরুল, এইটার নাম দিলাম 'রূপং', আর 'স্থ'তে যাঁহাতক অনুপ্রবিষ্ট হ'ল, অমনি স্তুতি আরম্ভ হ'ল; তার নাম দিলাম 'পুর'। তাতে আমি মুড়েছি ও ভগবতী মুড়েছে। 'আকাশ' দেখ্‌লাম—কেমন সুন্দর! কে থাকে আকাশে?—এরূপে কে আছে?—ভগবতী। এইরূপ দর্শনে অভ্যস্ত যে পুরুষ, সে-ই মন্ত্রদ্বারা পূজা করতে পারে। নচেৎ সে ভাবের পুরুষ মাত্র।

চণ্ডিকা দর্শনের উপায়

মায়ের আমার এইরূপ শক্তি ব'লে মাকে আমরা বলি 'চণ্ডিকা'। যদি এইরূপ ক'রে 'দুর্গা' বলতে পার, তা' হ'লে দুর্গা দেখতে বাকি থাকবে? দুর্গার সবটা দেখা হয় না; কেউ কখনও দুর্গার সবটা দেখেনি তাই। কিন্তু উনি এমনই অদ্ভুত যে ওর হাতটাই ধর, আর পা-টাই ধর, সেখানটায়ই সব আছে—হাত, পা, মুখ, চোখ, নাক! যেমন electricityর (তড়িতের) বেলায় দেখ, একটা অংশ স্পর্শ করলেই main forceএর (মুখ্য শক্তির) গোটা velocity (বেগ) এসে পৌঁছায়, তেমনি মায়ের আমার একটি অংশ স্পর্শ করলেই সবটা এসে যায়।

কেমন ক'রে মাকে ছুঁবে?—মন্ত্রের দ্বারা, "ন তু ভাবেন।" মন্ত্রই সাক্ষাৎ মা, আমার স্বয়ং ঈশ্বরী—আমাতে শুদ্ধ একেবারে touched হচ্ছে না কি? ঈশ্বরী, আমি ও বিশ্ব, এই তিন বিভক্ত ভাবের সমাবেশ দেখা হচ্ছে নাকি? যার এই বিজ্ঞান, তার নাম হ'ল হ্রীঁ—ঐ হৃদয়! ব্রহ্মাকে অগ্রসর ক'রে এঁর পূজা করতে হয়।

যখন একটা লোক থেকে আর একটা লোকে যাও, কিসে ক'রে যাও?—'বাক্'। যে লোকেই গিয়ে থাক, সেটায় গিয়ে পড়লে 'মন্ত্রে'। সে'দিন বলেছিলাম 'কথা', আজ বললাম 'মন্ত্র'। এই যে মন্ত্রে চড়ে যাওয়া, এটাকে বলে 'হংস'। চণ্ডী পাঠের নিয়ম হ'ল—মন্ত্রের অর্থবোধ থাকা চাই।

'ম'—যে অবস্থায় মা আমার সবটা খেয়ে নিয়েছেন—সব খেয়ে নিয়ে আপনার ভিতর পুরে নিয়ে ব'সে আছেন। 'হং'—সব হনন ক'রে নিয়ে বসে থাকা; সঃ'—চন্দ্রমা বা সোম প্রকাশ। তা হ'লে যার এক পিঠে 'হং'—অর্থাৎ সব নিহিত আছে, তার আর এক পিঠে যা প্রকাশ হচ্ছে, তার নাম 'সঃ'। যেখানটায় সব গোঁজা আছে—লক্ষণটা তার ঘোর কৃষ্ণ রূপ—সেখানটা ঈশ্বরী; আর যেটা ফুটে উঠল সেটা হ'ল বিশ্ব। আর মাঝে চলেছে ভোগ, যেমন এখানটায়—"হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণী রূপধারিণী" মা।

চণ্ডীর প্রথম চরিতে 'মহাকালী' হ'লেন দেবতা, যেখানে সব গোঁজা আছে। যার মাথার ভিতর ব্রহ্মত্ব ফুটল, সে হ'ল 'ব্রহ্মা'। আর যে পুরুষ মহাকালীর দ্রষ্টৃত্ব দেখছে, সে পুরুষ ব্রহ্মত্বলাভ করে; এইজন্য ব্রহ্মা হ'লেন 'ঋষি'। ইনিই সব হ'য়ে ফুটছেন—এই কথাগুলিই মহাকালীর ভিতর থেকে বেরুচ্ছে, এই হ'ল 'বাক্‌প্রকাশ'। তাকে দেখতে দেখতে যে বাক্‌প্রকাশ, তার নাম 'মন্ত্র'। আমা থেকে যে কথা বেরুচ্ছে, সেটা হ'ল ভাবপ্রকাশ।

চণ্ডিকাপূজায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা

"তোমার কিছুই আমার জানা হয়নি, মা।"—এই ভাবটা থাকলে তবে তোমার পূজা করা হবে। যদি ইনি আলো জেলে তোমার পূজা গ্রহণ করেন, তবেই সুপ্রভাত! 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করতে হয় 'হংসবতী' মন্ত্রে :—

"ওঁ হংসঃ শুচিষৎ বসুরন্তরীক্ষসদ্‌
হোতা বেদিষৎ অতিথির্দুরোণসৎ
নৃষৎ বরসৎ ঋতসৎ ব্যোমসৎ
অব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥" (কঠ)

ওই হাঁসে চড়ে' পূজা করতে হবে। 'হংস' বাদ দিয়েই তুই কাঙ্গাল হয়েছিস।

এই যে বাণী দিচ্ছি, এ আর কারও কথা নয়—যাঁর কথা তাঁর নাম 'জাতবেদা'—প্রত্যক্ষ ঈশ্বরী। এ কথাটি অর্থময় ক'রে দেখার নাম 'বেদ'। 'বেদ' বললেই প্রত্যক্ষতা বুঝায়। মার্কণ্ডেয়র অন্য নাম 'বেদজিহ্ব' ; ইনি বেদকে রূপের ছাঁচে ফুটিয়ে তুলেন। সুতরাং 'চণ্ডী' আর কিছু নয়, বেদকে ফুটিয়ে তোলা—'রূপ' ফুটিয়ে তোলা।

আমি প্রত্যক্ষ ভগবতীকে দর্শন করতে চাই। বেদরূপ আলো নিয়ে মাকে যে তুলছি বা দেখছি, এই কথাটা নিয়ে জড়াতে হবে। যা নিয়ে জড়াবে আর যাতে জড়াবে, তার নাম হ'ল 'হৃদয়'। হৃদয়ে হৃদয় নিয়ে হৃদয়কে জড়াবে বা পূজা করবে। প্রত্যক্ষ ভগবতী মানে কি? এই যে দুনিয়া দেখছ—কা'কে দেখছ এইরূপে?—ভগবতীকে তো? আমার নখ থেকে চুলের ডগ পর্য্যন্ত যেমন আমি ছড়িয়ে আছি, ভগবতীও তেমনি এই দুনিয়ায় সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছেন। এইরূপে যে দিন দেখবে, সেই দিন তোমার 'সত্য প্রতিষ্ঠা' পূর্ণতায় জ্বল্ জ্বল্ করবে। হাঁসে চড়ে আছ কি না দেখ। হাঁস থেকে নেমে হাঁস চরালে ব্রাহ্মণ হ'তে পারবে না।

—শ্রীগুরুবাণী, রবিবার, ২৫-৯-১৯৪৫।

—০:*:০—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রশক্তি সমারূঢ়া কামময়ী চণ্ডিকা

[চুম্বক :—গুরুর উপদেশের গুরুত্ব—বিষ্ণুত্ব দর্শনের আবশ্যকতা। নিজদেহকে ভগবদ্দেহরূপে পূজনের বিধান কেন? ভগবতীর রূপ-ধারণ করা মানে তাঁর 'পুর' রচনা করা। জ্ঞানদেবতা নিজেরই

ব্যাপ্তির দ্রষ্টা। 'পুরন্দর' তদন্তরস্থ বেদযজ্ঞের দ্রষ্টা, আর অসুর তার আশ্রিত ভোক্তা। 'পুরন্দর' যজ্ঞেশ্বরকেই দেখে; নচেৎ সে হয় অসুরাক্রান্ত। মহেশ্বরের ত্রিশূলাঘাত কিরূপ ?—ত্রিবৃৎমূর্ত্তি ধরা অর্থাৎ বিষ্ণু, ইন্দ্র ও অসুরের সৃজন, অর্থাৎ যজ্ঞময় হওয়া। জ্ঞানদেবতা নিরেট বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করেন—মন্ত্র বা ঋক্‌রূপ ইচ্ছাশক্তিদ্বারা। মন্ত্রশক্তি অসাধারণ পরিপ্লাবনময়ী; তা'তে বিশ্বের সর্ব্বস্ব নিহিত। এই পরিপ্লাবন মন্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। এর ভিতর সাধকের লক্ষ্য যশ, তেজ, বীর্য্যাদি। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে অর্গলা স্তুতি পাঠ করতে হয়। দেবীর রূপমহিমার অপূর্ব্বত্ব। খাঁটি দুর্গাপূজা কিরূপে সম্ভব ? অর্গলা স্তুতির অর্থ—খিলখোলা ও রূপ-দর্শন। "মায়ের কামনা পূরণে আমার কামনা পূরণ"—এটি দর্শনে সাধকজীবনের সার্থকতা। পুত্র হৃদয়ে কামনা জাগরণে মাতৃ হৃদয়ের তৃপ্তি। হৃদয়ের প্রতি ক্ষুদ্র কামনায় কামময়ী মাতৃমূর্ত্তি-দর্শনের সার্থকতা।]

জ্ঞানদেবতার বিষ্ণুত্ব দর্শন

মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে তোমাদের উপদেশ দিতে দিতে যেখানে এনেছি, এর চেয়ে পরম উপদেশ আর নেই। সিদ্ধ ও সাধ্যদের ও এই উপদেশ। সাধ্য দেবতারাও এই মন্ত্রশক্তির সাধনা করে। এর প্রধান জিনিষ হ'ল জ্ঞানস্বরূপা পরমা মায়ের বিষ্ণুত্ব। যে কথা আমি অনবরত বলছি এবং তোমরা অনবরত ছেড়ে দিচ্ছ—নিজের যাগযজ্ঞ দেখে তাঁর বিস্তার দেখ।

এই যে সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, দেখি জ্ঞানস্বরূপ দেবতা জাগলেন। এখানে যিনি জ্ঞানস্বরূপ তিনিই এই বিশ্বরূপ ধারণ ক'রে রয়েছেন। যেমন একটা ফুল বা ফল এই জ্ঞানস্বরূপ দেবতার রূপ, 'আমি'ও তেমনি তাঁর একটা রূপ। যেমন ওখানে তাঁর নাম হয়েছে সূর্য্য, চন্দ্র, দেবতা, তেমনি এখানেও তাঁর নাম হয়েছে অমুক চন্দ্র অমুক। সত্যি সত্যি কে এমন হয়েছে দেখ। এই কারণে যখন পূজা বা জপ করতে উপদেশ দিই,

তখন এই শরীরটাকে তাঁর শরীর ব'লে ধারণা ক'রে পূজা বা জপ করতে বলি।

বিষ্ণুত্ব, ইন্দ্রত্ব ও অসুরত্ব

একটা 'রূপ' ধরা মানে কি? সেখানে তিনি একটা 'পুর' নির্ম্মাণ করেছেন, যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি, এবং সেই পুরে তিনি বিরাজ করছেন, অর্থাৎ তিনি রূপ ধরে 'পুর' নির্ম্মাণ করেছেন। এ রূপটা নিজেই হয়েছেন; সে 'পুরে' তুমি আছ, আমি আছি, বিশ্ব আছে। যিনি এই 'রূপ' ধরেছেন, তিনি এই 'পুর'কে জানছেন। একে 'পুর' বলে কেন? এটা কোন একটা জিনিষে 'পূরিত' বা ভর্ত্তি হয়েছে, অর্থাৎ এটা শূন্য বা ফাঁকা নয়। যেমন এই বালিশটা তুলায় ভর্ত্তি, এইজন্য এটা তুলার 'পুর'। তা হ'লে 'পুর'টা তাতে ভর্ত্তি!

এইবার এঁর কাজ দেখ:—(১) তিনি নিজেই হয়েছেন এবং অনবরত দেখছেন, "এই পুরে আমি বাস করছি"। তুমিও এ পুরটি অনুবরত দেখছ—এই হ'ল সাধারণ জীব। (২) এর ভিতর যে বেদযজ্ঞ চলছে, এটা যে দর্শন করে সে হ'ল 'ইন্দ্র'। আর (৩) তুমি 'অসুর' যেন এর আশ্রিত। কিন্তু ইন্দ্র বা 'পুরন্দর' দেখছে যিনি সব হয়েছেন, তিনিই যজ্ঞ করছেন এবং ভোগ করছেন। আমি যখন বলি, দেখ, এটা জ্ঞানের হাত, জ্ঞানের পা, এবং তোমরা যখন ঐ রূপ দেখ, তখন তোমরা 'ইন্দ্র' বা "ইদং দ্রষ্টা"। এটা হাত—ভূতের হাত নয়, বিষ্ণুর হাত—যিনি ব্যেপে রয়েছেন এমন ক'রে, সেই দেবতার হাত। জ্ঞানদেবতা ব্যাপ্তিস্বরূপ. তিনিই এ রূপ ধরেছেন এবং আমি তাঁকে দেখে দেখে চলছি। এটা করতে পারা যায় তো?

তুমি যেমন ইচ্ছা কর, তেমনই পাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি এঁ থেকে কি আদায় করতে চাও? ওই কামময় দেবতা হ'লেন যজ্ঞেশ্বর পুরুষ। তুমি সকালে ওঠে যখন দেখলে গাছ, পাতা,

তখন বললে "হে যজ্ঞেশ্বর পুরুষ! তুমিই গাছ, তুমিই পাতা"। ইন্দ্র 'পুর' ভোগ করছে, তাই ওর নাম 'পুরন্দর'। কিন্তু ইন্দ্র সব সময়ে ওটি মায়ের 'রূপ' ব'লে ভোগ করতে পারে না ব'লে, অসুর ইন্দ্রকে আক্রমণ করে। তখন সে আর কিছু দেখে না—দেখে শুধু গাছ, মাটি ইত্যাদি। ইন্দ্র-অসুরের এই বিবাদ চিরকেলে।

তা হ'লে আমরা তিনটে জিনিষ পেলাম :—(১) বিষ্ণু—জ্ঞান-দেবতার ব্যাপ্তিমূর্ত্তি ; (২) 'ইন্দ্র'—ইদং দ্রষ্টা, যে সব 'ম'—জোড়া দেখে ; (৩) 'অসুর'—যে দেবতাদেরও হারিয়ে দেয়। যখন তুমি মর্ত্ত্যের মানব হ'য়ে ঘুরে বেড়াও, তখন তুমি 'অসুর'। ব্রাহ্মণের পথ হ'ল, সব 'ম' জোড়া দিয়ে দেখা—'আহা মা! তুমি এইরূপ জগৎমূর্ত্তি ধারণ করেছ!" তিনি যজ্ঞ করছেন, তার মানে তিনি বিষ্ণুকে, ইন্দ্রকে ও অসুরকে তৈরী করেছেন—অর্থাৎ মহেশ্বর ত্রিশূল মেরেছেন। 'মহেশ্বর' হ'লেন সেই ঈশিত্ব শক্তি, যা দ্বারা ইনি সব ত্রিধা বিভক্ত করেন ; এর দ্বারাই তো ভোগ চলছে! এক দিকে অসুর তৈরী হ'ল ; আর ত্রিশূল মারা হ'লে যখন সোম প্লাবন বেরিয়েছে—সোমপ্রবাহ চলছে—তখনই 'ইন্দ্র' তৈরী হ'ল। এই সোম এত তীব্র যে এর দ্বারা এই কঠিন নিরেট জগৎ তৈরী হয়েছে। কথা যাই বললাম, তা একেবারে এইরূপ হ'য়ে গেল। ওই মহেশ্বরের কথাই বলছি—যিনি ত্রিশূল মেরেছেন। তাঁর চেহারা কত নিবিড়! যে জ্ঞানের মত স্বচ্ছপাতলা, সেই হ'য়ে যায় এই নিরেট জগৎ! এই হ'ল তাঁর বজ্রশক্তি—যাঁর কামনা বা দেখা বা বলা মাত্রই সব হ'য়ে যায় 'ত্রিবৃৎ', আর হ'য়ে যায় পাথর বা 'পুর'। তাতে রইল 'ইন্দ্র' বা 'আমি', আর যজ্ঞ চলতে লাগল। ওই গতিকে বলি 'অহি'—যা বিদ্যুৎবৎ, আর তাই 'সসর্পরি'! তাই চণ্ডীতে বলা হয়েছে :—"ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি। মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥"

ভগবৎ কামনা ও 'ঋক্' মূর্ত্তি

এমন বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ যে দেবতা, তিনি কি ক'রে এমন নিরেট হ'লেন, ঘট্ ক'রে বিষ্ণু হলেন, যজ্ঞ করলেন, আর তোমাকে ছাপিয়ে জগৎ মূর্ত্তি ধরলেন! এ কি জপ তপ ক'রে হবে?—না, এই জ্ঞানটা ফুটলে তবে জপ তপ হবে? "কি ক'রে এমনটি করছ, দেবতা?" "বৎস! আমাতে বস; ও সব করার আর কোন মূল্য নেই; আমার ইচ্ছায়ই সব হয়।" যে শক্তি দ্বারা এ রকমটি হয়, তার নাম 'ইচ্ছা', যা উদিত হওয়া মাত্রই এইরূপ ঘটনা ঘটে। এই হ'ল basic principle—এই মূল বিজ্ঞান। "কোথায় পাব মা এমন ইচ্ছাশক্তি?—আমাদের ইচ্ছা তো সব ব্যর্থ হ'য়ে যায়"! "আমার ইচ্ছার্ত্তিকে দেখনি বাবা?—এ হ'ল বাক্য', 'মন্ত্র' বা 'ঋক্'। এই যে আমার ইচ্ছা, এ প্রদীপ্ত হচ্ছে নিত্য।"

ওঁর বেরুনো মানেই হয়, যশ বীর্য্যাদি সব জ্বলে উঠা। যেমন মায়ের রূপের ভিতর আছেন শুধু তিনিই, তেমনই মন্ত্রের ভিতর আছে এই সবই। ইন্দ্রত্ব, বিষ্ণুত্ব, জীবত্ব, যা দিয়ে গড়া, তাকে বলি 'মন্ত্র'। 'মন্ত্র' মানেই হ'ল, এটি এই সব দিয়ে গঠিত। সুতরাং আমার একটা 'দুর্গা' বলা কি পরিপ্লাবন ঘটাতে পারে বল দেখি! সকৃৎ উচ্চারিত মন্ত্র একবার বললে যা হবে, অনন্তকাল ধরে' মন্ত্র জপ করেও এর বেশী হবে না।

পরিপ্লাবনময়ী মন্ত্রশক্তি

এই যে পরিপ্লাবন করবার ক্ষমতা, এটা হ'ল ওঁর স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম, যা চেষ্টা ক'রে করতে হয় না, যেমন প্রদীপ জ্বলল আর অমনি ঘরটা আলো হ'ল। সুতরাং মন্ত্র পড়বার যদি এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান না আসে, তা হ'লে মন্ত্র পড়া হ'ল না। এই স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মেই সব তৈরী হ'য়ে রয়েছে—আমার কিছু করতে হয় না।

আমার কিছু না করেও সব হচ্ছে ; যেমন সূর্য্য—ওকে কি রৌদ্র ছড়াতে হচ্ছে? আমার এই সব 'হওয়ার' ভিতর যেটা সেরা 'হওয়া'—পরম 'হওয়া'—তাতে চোখ দাও। সে হওয়াটা কি? যশ, তেজ, বীর্য্য, ইন্দ্রিয় সামর্থ্য, অন্নাদ্য ও রস। 'আমি' সব হয়েছি—মাটি, কাঠ, আগুন, বাতাস, জল ; কিন্তু ওসব রস—সব ভোগ—সব প্রাণবন্ত ; মরা ভোগ আমার নেই। এর ভিতরকার সারাংশটি দেখ, যেটি চমকপ্রদ, আমার যে তৃপ্তিতে 'আমি' তৈরী হ'য়ে এ সব করি, সেটি হ'ল এদের সংহতি (combination)।

যশ, তেজ, বীর্য্য, ইন্দ্রিয় সামর্থ্য, অন্নাদ্য ও রস—এই সবটাকে স্মৃতিতে ফুটিয়ে রেখে—'দুর্গা' ব'লে ফুটিয়ে রেখে—আমরা চণ্ডী পাঠ করি, "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।" ওমা! তোমার রূপ ধরার ভিতর এত আছে! যে রূপের কথা শুনে আমরা পালিয়ে আসি, এখন দেখি সে রূপের ভিতর এত রয়েছে! 'রূপ' মানে 'পুর'—'যজ্ঞ'। পণ্ডিতেরা বলে ওকে 'স্বরূপ'। দেখ দেখি কী অমৃতকে কোথায় সঙ্কুচিত ক'রে ফেলেছে! 'রূপ' এত বড় জিনিষ যা আমার চেহারা ধরেছে ; নিজে এতে ব'সে ব'সে একে নগণ্য বলছি—কিন্তু এর এত বড় শক্তি! আমার থাকাটায় তাঁর লীলা জল্ জল্ করছে। এত বড় মহিমা এমন ক'রে বিরাজ করছে! এইটে ঠিক ক'রে রাখবার জন্য আমরা গোড়াতেই বলি "রূপং দেহি, জয়ং দেহি—"

দেবীর রূপমহিমা

একজন ঋষির মুখে মা বলেছেন 'এতানি রূপাণি অমৃতস্য অমৃতানি'। আমার বেদমূর্ত্তি দেখবি? তা হ'লে আমার বুকের যে পরম রস—যে বেদনার বা রসের রস দিয়ে তোদের ফুটিয়ে ধরেছি—তার চাইতেও যা অপূর্ব্ব, সেটি হ'ল 'তুই'—আমার একটি 'রূপ'! কোথায় আমাকে খুঁজতে যাচ্ছিস্? যদি এইরূপ ক'রে রূপের কদর দিতে না

পারিস্, তো চিরদিন তোর জগৎ মাটিই থাকবে—এই কারাগারই থাকবে। ওরে! আমি কি তোদের জন্য এই কারাগার তৈরী করেছি?—না। এ আমার প্রাণের গতি—প্রাণের উদ্বেলন! "ওরে আমার! ওরে আমার" ব'লে এই অনন্তগতি দুর্গামূর্ত্তি—অগ্নিমালিনী রূপ!

মা! তুমি তো ধন্য আছই; কিন্তু তোমার চেয়েও ধন্য তোমার কোলের ওই ছেলেটি, যে তোমার সমস্ত প্রাণকে আকর্ষণ করছে! কী আদর এখানে (নিজের দেহ দেখাইয়া) ফেলতে হবে—কী আদরে প্রাণ বা ভগবতী জল্ জল্ করছে—এইটে দেখবার জন্য এই উপদেশ। এইটে দেখলে খাঁটি দুর্গা পূজা করতে পারবে; নইলে দুর্গা মাটিরই থেকে যাবে। খালি কে বেরুচ্ছে, দেখ। তোমার 'ম'—জোড়া হয়নি ব'লে পূজা হয় না—খালি 'ম'টা জুড়ে পূজা কর। "রূপং দেহি, জয়ং দেহি"—এর নাম হ'ল 'অর্গলা', অর্থাৎ খিল খোলা। ঘরের খিলটা একবার খোল তো মা, ভিতরে কি আছে দেখি। দেখলাম 'রূপং'।

দেবী উপাসনার প্রকৃষ্ট প্রণালী

তা হ'লে এখানকার বিশেষ উপদেশ হ'ল—পূজাটা যাতে 'ম' জু'ড়ে করতে পার, সে দিকে দেখ—শুধু 'ভাবে' বিচলিত হ'য়ো না। যখন পূজা করতে যাবে দেখতে হবে, "আমার জীবনের কি সার্থকতা লাভ করতে চলেছি—কি প্রাপ্তির আশায় অগ্রসর হচ্ছি"। সে আশা কি তা বলছি:—"সে আশা এমন জিনিষ যে সেটা পূরণ শুধু আমার হয় না—আমার পূরণ হ'লে তোমারও পূরণ হয়। সেইটি আজ আমার 'বেদ'—তুমিও তৃপ্ত হবে, আমিও তৃপ্ত হব। খালি আমি তৃপ্ত হ'লে—খালি আমার কামনা পূরণ হ'লে—সে তো অসুর হব!"

"যৎ কামং কোময়মানা ইদং কুন্মসি তে হবিঃ।
তন্ন সর্ব্বং সমৃদ্ধতাম্ যদেতৎ হবিষোবিহি॥"

এত বড় হৃদয়ের কথা শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আমার হৃদয়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা উঠছে, আজ দেখছি তাতে তোমার তৃপ্তি—তোমার যজ্ঞের হবি পোষণ করছি। আগে মনে হচ্ছিল, এ সব আমার কামনা —মাগ-ছেলে ব'লে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব আমার কামনা, আমারই তৃপ্তির জন্য। কিন্তু আজ দেখছি তোমার বুকে দাঁড়িয়ে, "আমার যে এ সব চাওয়া সেও তোমারই তৃপ্তি"! কী অপূর্ব্ব! মা যতক্ষণ দূরে ততক্ষণ পণ্ডিতদের গজ্‌গজানি শুনতে হয়।

"তৎ সর্ব্বং সমৃদ্ধতাম্—যদেতৎ হবিবোবিহি"। যখন তোমার জন্য চলেছি, দেবি, তখন বলি "সব সমৃদ্ধ হোক্, এবং এই সমৃদ্ধ হবি তুমি খাও মা!" কী অপূর্ব্ব কথা, বুঝে দেখ! আমি কাঁদলাম একটা পয়সা বা কাপড়ের জন্য বা একটা রোগের জন্য। বাহির থেকে দেখতে এগুলি ছোট জিনিষ। কিন্তু জানবে ও সেই কামময়ী মা, হোক্ না তার চেহারা ছোট—"ইদং জুহ্মসি তে হবিঃ"। কোথায় এর সুরু দেখ—যাকে বলি জীবনের darkest spot (সব চেয়ে কালো দাগ) সেখান থেকে! নিজেরাই বলি, "মা বলতে যাচ্ছিস্ একটা ক্ষুদ্র কামনা নিয়ে"! আর আজ গুরুর চোখ দেখ; এ না হ'লে কি জগদীশ্বরী দর্শন হয়? নইলে বললে "ঈশাবাস্যমিদম্ সর্ব্বম্"; আর দেখলে ভগবতী কাপড়ের মত সব ঘিরে আছে! তা নয়; আমার বুকে যা-কিছু উঠুক, এর source (উৎপত্তি) হ'ল ওঁর সঙ্গে যুক্ত; তাকে ওঁর সঙ্গে জুড়ে রাখতে হবে। যে 'নাম-রূপ' হেয়, তাকে অমৃতের অমৃত ব'লে বর্ণনা করছি! যে কামনা বা আকাঙ্খাকে আমার বুকে ঘৃণ্য বলি, তাকে আজ মায়ের আকাঙ্খা বলছি!—কী অপূর্ব্ব!

—শ্রীগুরুবাণী, রবিবার, ৩০-৯-১৯৪৫



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চণ্ডীতত্ত্বে বিশিষ্ট মন্ত্রদ্বয়

[চুম্বক :—মন্ত্র দুটি কি কি? তাদের মাহাত্ম্য। মন্ত্রপ্রয়োগ-প্রণালী। যথার্থ প্রয়োগ ও তার ফল। মূল উপদেশ—চেতনতত্ত্বে প্রবিষ্ট হওয়াই মুক্তি ও বিভূতি।]

মহিষমর্দ্দিনী ও চামুণ্ডা মন্ত্র

দুইটা মহামন্ত্র দুই পূজায় শিখিয়েছি। এ দুইটি না করতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই। দুর্গোৎসবে দিয়েছি "ওঁ মহিষ-মর্দ্দিনী নমঃ", আর বিশ্বমাতা পূজায় দিলাম চামুণ্ডা মন্ত্র "ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ"। এ মহামন্ত্র অপূর্ব্ব! এ দুই মন্ত্রের অর্থবোধ যার হয়েছে, সে পুরুষের অপ্রাপ্য আর কিছু থাকে না। চেতনকে 'কামদা' ব'লে নিতেই হবে; চেতনকে 'প্রাণ' ব'লে নিতেই হবে; আর চেতনকে 'গুরু' ব'লে নিতেই হবে। 'গুরু' মানেই নিয়ন্তা, যিনি পরিচালনা করেন—'গুরু' মানেই ঈশ্বর।

মন্ত্রপ্রয়োগ প্রণালী

এ দুটি মন্ত্রে কি বিশেষত্ব দেখ? তুমি অনাত্ম বুদ্ধিতে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছ, তোমার ভগবতীকে ডাকবার ইচ্ছা জাগে না। ডাকতে গেলেও কি হবে? দাঁত দিয়ে বেরুচ্ছে বটে, কিন্তু তোমার গা'ময় যে নোংরা! তাই ওটি করবার আগে "মহিষমর্দ্দিনী" মন্ত্র প্রয়োগ করতে হয়। ভগবতীর এই মন্ত্ররূপে আবির্ভাব মাত্র 'মহিষ' (খণ্ডিত-মহিমা বা ক্ষুদ্রত্ব) দূর হ'য়ে যায়। মা যেমন 'চোরা'র কাঁধে পা দিয়ে চাপ দিয়ে আছেন ও আঘাত হানছেন, তেমনি ক'রে তোমার বাঁ পা'য়ের উপর জোর দিয়ে ব'সে "ওঁ মহিষ-মর্দ্দিনী নমঃ" এ মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ কর, তোমার জাড্য তা

হ'লে কোথায় পালিয়ে যাবে! স্মরণে নিলেই ঐঁর (গুরুর) অর্থবোধের ক্ষুদ্রতা চলে যায়—প্রত্যক্ষতায় আসে যে জীবত্বরূপ মহিষাসুরের বুক মা চেপে ধরে আছেন।

মন্ত্রমহিমা

এ দুটি মন্ত্র দুটি রত্ন। তবে এর প্রয়োগ জানা চাই। না জানলে ওদের কোন মূল্য নাই—শব্দ মাত্র। যখনই নিজেকে দুর্ব্বল, কাতর বা বিপন্ন মনে করবে, তখনই মহিষমর্দ্দিনী মন্ত্র ঐ রূপে উচ্চারণ করবে, ও চণ্ডিকার আবাহন করবে, আর কাজে অগ্রসর হবে। জীবত্বের লক্ষণ হ'ল যাচাই করা। এর যাচাই করতে কখনও যাবে না—"আমি এত ডাকলাম, তবু কেন হ'ল না? হয়তো প্রয়োগ করতে জানি না।" কিন্তু এ ব্যর্থ হওয়ার নয়। যদি হয়, তো বুঝতে হবে, ভুল করছ—ডাকা হচ্ছে না। দুবার-দশবার যদি দেখ হয়নি, আবার ডাকবে। তখন দেখবে প্রয়োগ ঠিক এসে যাচ্ছে—হতাশ ভাব আর থাকবে না। এ না এসে যায় না—না দিয়ে যায় না। কেন না, যিনি দেন তিনি হলেন এই 'গুরু'। মানুষ যদি মহাদেবের মত কাঙ্গাল হয়, ধুকুড়ি কাঁধে দিয়েও সে হয় রাজরাজেশ্বর, যখন জানে এ ছাড়া আর কেউ দেয় না।

আত্মবোধ কথাটার মূল্য আর কিছু নয়, ঘুরে চিন্ময় তত্ত্বে এসে হাজির হওয়া। আসল কথা হ'ল তোমার চেতনাকে দেখতে হবে—যে কৌশলেই পার। চেতনতত্ত্বে প্রবিষ্ট হওয়াই মুক্তি, এবং যা মুক্তি তাই বিভূতি।

—শ্রীগুরুবাণী, রবিবার, ৫-১-১৯৪১।

—

চতুর্থ অধ্যায়

অনুভূতি ও সম্ভূতি শক্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

চণ্ডিকার 'তনু' বা অনুভূতি মূর্ত্তি

[**চুম্বক :**—ভগবতীতে আশ্রয় বোধের সার্থকতা। 'নিজবোধ' নামক তত্ত্বের অপূর্ব্ব মহিমা ; ইনিই পরম দেবতা। অন্তর আকাশে জ্ঞানের অবাধতা—সুখস্বরূপতা। বাম চোখের হিসাবে আত্মপ্রবঞ্চনা। দক্ষিণ চোখের দৃষ্টিহীনতা। প্রতি প্রাপ্তিতে বা ভোগে আত্মদেবতাকেই ভোগ্যরূপে পাওয়া হয়। শুধু কথার বিনিময়েই কামময় পুরুষের প্রাপ্তি হয়। অনুভূতি ক্ষেত্রে বলা, শোনা ও দেখার অভিন্নত্ব। অনুভূতির তিনটি স্তর অতিক্রম করার পর সম্ভূতি ক্ষেত্রে প্রবেশ। প্রথম স্তরে তত্ত্ব ও তন্মাত্রার যুগপৎ জ্ঞান। দ্বিতীয় স্তরে যুগপৎ ক্রিয়া ও আস্বাদন বা ভোগ। চেতনক্ষেত্রে ও ভোগক্ষেত্রে ভোগের পার্থক্য। তৃতীয় স্তরে ক্রিয়া ও বস্তুগত প্রাপ্তি ; কর্ম্মমুক্তি বা সংস্কার মুক্তি। কল্পতরু মূর্ত্তিতে ভগবতীর জীবত্ব রচনা বা তনুসৃষ্টি। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে জড়-বিজ্ঞান ও চেতন-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। স্থিতি' মানে পঞ্চরস ভোগ। ভগবতীকে সঙ্গে রেখে ভোগ কর—ঋষিদের বাণী। তনুর লয় মানে সুখস্বরূপা মায়ের কোলে নিদ্রা। পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তনের উদ্দেশ্য 'তনু'কে ক্রমে ভগবতীর স্বরূপধর্ম্মে ধর্ম্মী করা। "ভগবতী ও 'তনু' পরস্পর পরস্পরকে যুগপৎ ভজনা করে"—এর তাৎপর্য্য। ভগবতীর সম্ভূতি ও অনুভূতি মূর্ত্তিদ্বয়ের সঙ্গম ক্ষেত্র। প্রতি সৃষ্ট পদার্থই সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক। প্রতি অস্তিত্বে 'সম্ভূতি' ও 'বিনাশ'। বাক্য উচ্চারণ ও বাক্য শ্রবণ মানে 'আমি' ও 'ভগবতী'র যুগপৎ প্রস্ফোটন। 'যেখানে তুমি সেখানেই ভগবতী'—এটি না দেখার ফল। সাধক জীবনে মাতৃ ভাবের তিনটি ক্রম। গুরুর তৃপ্তি 'স্বহস্তে' আত্মজ্ঞান দানে।]

ভগবতীতে আশ্রয়বোধ

"ভগবতি! এই যে তুমি রয়েছ, আর তোমাতে রয়েছি আমি! নমস্তে"—এই ক্ষণটায় এটা ঠিক হ'লেই হ'ল। ব্যস্—আর দরকার নেই! এই হ'ল সাধনা—এই ব্রহ্মানন্দ! এই মুহূর্ত্তে হয়তো আমার দারুণ বিপ্লব হ'য়ে গেছে, কিন্তু এ পিঠে "ঠিক আছি—ঠিক আছি, এই যে তুমি, ভগবতি!"—এই ভাবে যে ডিগ্‌বাজী খেতে না শিখেছে, তার ব্রহ্মতত্ত্বে কোন অধিকারই হয়নি। এ তত্ত্ব মানেই হ'ল একান্ত পরমাশ্রয় যা, তাতে ভরপুর হ'য়ে যাওয়া। যার বুকে আশ্রয় বোধ ফুটেছে, সে কি আর নিরাশ্রয়তার স্বপন দেখবে?

নিজবোধ ও সর্ব্বাত্মা

'নিজবোধ" ব'লে যে অপূর্ব্ব উপদেশ দিচ্ছি, নিজে যখন তা স্মরণ করি, তখন লোমহর্ষণ হয়। এর ফল হ'ল "তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষসে"—যতক্ষণ না দেহটা থেকে বা'র হই, ততটুকুই যা দেরী, নইলে আমি তো পেয়েই গেছি! এ আনন্দ যদি ভরপুর ক'রে না রাখে, তো "পেয়েছি" বলছি বটে, কিন্তু ওর গরিমা, তেজ, গৌরব, মহিমা এখনও ফুটেনি; পেয়েছি বটে, কিন্তু তার জ্যোতি বা আলো এখনও পাইনি। অনন্ত সুখের আগার যাঁর স্বরূপ, আমার নিজত্বকেও তাই ব'লে বলতে আমায় যিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন, বিন্দুমাত্র গোলাম নই ব'লে একেবারে যাঁর খোলা হুকুম—এই পরিচয়ে পরিচিত হই যাঁতে, এই যে আমার পরম দেবতা! এই যে জ্ঞান খুলে দিয়েছেন, সে জ্ঞানে আবার ময়লার ছোপ লাগে কি ক'রে?

'সুখ' মানে পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে—সুলভ অন্তরাকাশ বা সর্ব্বাত্মা—যেখানে আর কিছু নেই, শুধু অবাধ জ্ঞান। জ্ঞানই শুধু দাঁড়িয়ে নয়, এই চেহারাটি ধরার সার্থকতাটি পর্য্যন্ত সেখানে আছে। সে

জ্ঞান শত জ্বালা মিশ্রিতই হউক, শত দুঃখ মিশ্রিত হউক, সমগ্র সুখের একান্ত সার্থকতায় ভরা হ'ল ওই অবাধ জ্ঞানস্বরূপা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের আধিপত্য থেকে আরম্ভ ক'রে দীনাদপি দীনের দারিদ্র্য পর্য্যন্ত, কান্না থেকে আরম্ভ ক'রে হাসি ফুটানো পর্য্যন্ত, আবার মুখের কথায় যেখানে ব্রহ্মাণ্ড গড়ছে ভাঙ্গছে সেখান থেকে আরম্ভ ক'রে এই সর্ব্বংসহা মাটি পর্য্যন্ত—সমস্ত নিয়ে পিঠ পেতে পড়ে' আছেন—তাঁতে যা খুসী তাই কর, এমন অবাধ! এ অবাধতার পূর্ণ আগার। এমনি অবাধ যে দেখতে গেলে আপনাকেও অবাধ হ'য়ে যেতে হয়! এ কী ভয়ঙ্কর তেজ—এ কী ভয়ঙ্কর সার্থকতা! এই অবাধতার ত্রিসীমায় যদি পড়েছ—নিজবোধ যদি ওতে ঠেকেছে তো অমনি সুখস্বরূপতা এসে গেল। এত বড় তেজের ক্ষেত্রে তুমি পড়েছ যে এখানে 'আমি'—'তুমি'র হিসাব নেই!

অনুভূতিময় জীবের সহিত সম্ভূতিময়ী বিশ্বেশ্বরীর সম্বন্ধ

এত বড় যে স্রোত (আত্মপ্রবাহ), তাকে চাপা দিয়ে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছ! চার পয়সা গেল আর পাঁচ পয়সা এল—সারা জীবন এই হিসাবটাই তোমার মাথায় গজ্ গজ্ করছে। তোমার বাম চক্ষের হিসাবেই তো গেলে! দক্ষিণ চক্ষে যে পুরুষ রয়েছে—মহাজনের লাঠি বা বলবানের অত্যাচারের আকারেই হউক, আর সুখের আকারেই হউক—যে দেনেওয়ালা মালিক, যে ছাড়া আর কেউ কিছু দেয় না—সেই পুরুষে তুমি চোখ দিচ্ছ কই?

আত্মবোধ সংযুক্ত হ'লে তবে দেখা যায়, শোনা যায় আর তা না হ'লে দেখাও যায় না, শোনাও যায় না। যাঁর একটু খানি নিয়ে "আমি" "আমি" ক'রছ— সে টুকুর ভিতর যেখানে যত শক্তি বা সার্থকতা, যত কিছু সৃষ্টিস্থিতিলয়, এবং খাওয়া পরা, জাগা

ঘুমানো—সব কিছুতেই এঁকে ছাড়া আর কাউকেও পাচ্ছ না। বাইরে উদ্দীপক কারণ যত রকম বস্তুগত—সৃষ্টিগত—থাক না কেন, তুমি যা কিছু পাচ্ছ তা তোমার আত্মদেবতা ছাড়া আর কাউকে নয়। তুমি যখন ভাত খাও, ওঁকেই খাও; যখন স্ত্রী বা পুত্র দেখ, তখন ওঁকেই স্ত্রী বা পুত্ররূপে সাজাও। ওঁতেই সব সাজানো রয়েছে—এর জন্য কোন machine খুঁজতে হয় না, capital খুঁজতে হয় না, labour বা manager বা engineer দরকার হয় না।

তুমি কামময় পুরুষ, তোমার দরকার হয় শুধু 'বলা'; আর কামময়ীর বুকে যা ফুটে, তা শুধু 'কথা'। এখানে যেমন জিনিষ exchange করা চলে, ওখানেও তেমনি exchange হয়! এই মায়ের কোলে interchange করবার জিনিষ হ'ল, দীপ্তি বা জ্যোতি, কাম বা ভাব। পৃথিবীতে তোমরা টাকা দ্বারা exchange ক'রে থাক; আর ওখানে exchange করতে হয় 'কথা'র দ্বারা। মায়ের বুকে দাঁড়িয়ে মায়ের চোখে চোখ দিয়ে কথা বললেই সে জিনিষটি পাবে। মহাজন যেমন একটা slip সই ক'রে পাঠালেই মাল আসে, তেমনি ওখানে কথারূপ slip দিলেই কাম্য বস্তু এসে হাজির হয়; যেমন যেই বললে 'দেবী', অমনি দেবী এসে বলবেন "কি চাই?" জগতের একটা নগণ্য কীট তুমি, আর সেই দেবী হ'লেন ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী—তবু তোমাতে আর তাঁতে এই রকম প্রগাঢ় সম্বন্ধ! যেমন জলে হাত নেড়ে ঢেউ তুলো, তেমনি তোমার জিভ্ নেড়ে, অর্থাৎ হৃদয় নেড়ে, অর্থাৎ আত্মা নেড়ে—নিজে তাই হ'য়ে তুমি যা চাও তুলে নাও—ভোগ কর! 'নিজে তাই হওয়া'—এটা এমন কিছু নয়। কথা বললেই তাই হ'য়ে যাচ্ছ, শুধু দেখে নাও! 'পাখী' বললে পাখী এসে যাচ্ছে কিনা দেখ। ঠিক বল, আর দেখ সেইরূপ চেহারাটা হচ্ছে কিনা। তোমার ভাষা বেরুচ্ছে, আর সেই রকম হ'য়ে যাচ্ছ—যেমন জলে হাত

নাড়লেই ঢেউ উঠে। বলা মানেই পেয়ে যাওয়া—মা আমার এমনি কল্পতরু! এইটা জেনে নেবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দরকার।

সম্ভূতি ক্ষেত্রে প্রবেশের স্তরত্রয়

'বলছি আর পেয়ে যাচ্ছি'—এ কেন তবে হয় না? এ চোখটা ফুটছে না ব'লে। দেখাই রূপ, আর রূপই দেখা; বলাই শোনা এবং শোনাই বলা—এইটা দেখতে হবে। যে পাশ দিয়ে দেখতে যাচ্ছ, তারই counterpart—শোনা—আপনিই ফুটে উঠছে। তেমনি দেখলাম, শুনলাম না; বললাম, পেলাম না—এ হয় না। তোমরা সম্ভূতি ক্ষেত্রে ইহা দেখতে পাও না, অনুভূতি ক্ষেত্রে এখনও পাওয়া হয়নি ব'লে। অনুভূতি ক্ষেত্রে কখন পাবে? এ পাওয়ার তিনটি স্তর আছে :—

১। তুমি না শু'নে কথা কইতে পার? তুমি দেখছ কিন্তু রূপ পাওনি, এমন কখনও হয়? দেখা আর রূপ পাওয়া, বলা আর শোনা, গন্ধ আর ঘ্রাণ পাওয়া, রস ও আস্বাদন, এই রূপ উভয়মুখী প্রকাশ আত্মতত্ত্বে এক সঙ্গে গাঁথা রয়েছে। এর এপাশে 'তত্ত্ব' ওপাশে 'তন্মাত্রা'; এপাশে 'ক্রিয়া' আর ওপাশে 'অনুভূতি' যুগপৎ হচ্ছে। এটা আরও ঠিক ক'রে বলতে গেলে, 'পাশে' বললেও যেন ভুল হয়। একটি ক্রিয়া হয়েছে মানে ক্রিয়া ও অনুভূতি এক-সঙ্গে ফুটছে। দেখা, শোনা, বলা—সব এক জাতীয়। শুনতে গেলেই বলা হয়, আর দেখতে গেলেই রূপ ফুটে। এইটার উপলব্ধি হ'ল প্রথম স্তর। এইটা মনে ক'রে বার কয়েক দেখা মাত্র এতে সিদ্ধ হওয়া কিছু শক্ত নয়! বলছি আর শুনছি, চেতনের এই প্রথম অবস্থাটি দেখে নাও—এই প্রথম খেলাটিতে অভ্যস্ত হও। খালি এটা চোখে ঠেকছে আর হাসছ। চিন্ময় তত্ত্বের কি অপূর্ব্ব ব্যাপার! যেখান থেকেই ঢেউ তুলতে যাও, তোমার

খানিকটা পাওয়া হয়! কিন্তু বিজ্ঞানটি হ'ল এই যে মা খানিকটা সেজে উঠেছেন আর তুমিও তাই হচ্ছ বা পাচ্ছ। এটি যারা দিন কতক লক্ষ্য করে, তাদের পূর্ণ অনুভূতি এনে দেয়। পূর্ণ অনুভূতি কা'কে বলে? আমটা ভারি মিষ্টি—এ বলা মাত্রই সবটা—আমের রূপ ও তার মিষ্টতা—এই উভয়েরই ছায়া এসে যাচ্ছে। যতটুকু ছায়া আসছে, এইটি হ'ল প্রথমাবস্থা।

২। দ্বিতীয় স্তরে হবে ঐ অবস্থার 'আস্বাদন'। তাতে খাওয়ার স্মৃতি জড়িয়ে আমটাকে মিষ্টি বলতে বাধ্য হ'লে; মিষ্টি বল্লেছ কি মিষ্টত্ব ফুটে উঠবে। প্রথম হ'ল admission, তারপর হ'ল স্বপ্ন ক্ষেত্রের মত ভোগ পেয়ে গেলে। স্বপ্ন ক্ষেত্রে, ব'লে দিয়েছি, জিনিষ নেই তবু ভোগ হ'য়ে যাচ্ছে—অনন্তে অনন্তে। চেতন ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু মন্ত্রের চোটেই ভোগ। পুনঃপুনঃ দেখার অভ্যাস চাই, তবেই ভোগ ঠিক ফুটে উঠবে। মনে কর কেউ তোমাকে ভয়ঙ্কর আঘাত দিয়েছে। তুমি হয়তো সে কথা ভুলেই গেছ, কিন্তু যাঁহাতক সেটাকে ঠোক্কর দিয়ে মনে করিয়ে দিই, অমনি সেই তো অপমানের স্মৃতি পূর্ণমাত্রায় জ্বলে উঠে' তোমায় রাগিয়ে তুলে, আর তার সবটা ভোগ তোমার স্মরণে ফুটে উঠে। তেমনি সকল বস্তুরই নাম ফুটা মাত্র ভোগ হ'তে থাকে। তবে স্বপ্ন আর এই চেতন ক্ষেত্রের মধ্যে তফাৎ এই যে স্বপ্নে ভগবান্ যদি এনে দেন, তবেই ভোগ হয়, তাতে স্বাধীনতা নেই; আর এখানে কিন্তু স্বাধীনতা আছে। যেমনি 'আম' বললে, অমনি ভোগ হ'তে লাগল। এই চেতন ক্ষেত্রেই সব লুকিয়ে রয়েছে। আম নেই, তবু আমের রসে ভর্ত্তি হ'লে; পুত্র নেই, তবু পুত্রের রস বেরুল—শুধু বললেই হ'ল। অভ্যাস দ্বারা এতে আরও confirmed হ'তে থাকবে। প্রথম স্তরে অভ্যাসের ফলে যেমন বলছ আর হচ্ছে; দ্বিতীয় স্তরে তেমনি অভ্যাসের ফল হয়, বললেই ভোগটা এসে যাচ্ছে।

৩। যখন এই ভোগ পাওয়াটা পুরোদস্তুর হ'তে থাকবে, তখন তুমি তৃতীয় স্তরে ঢুকবে আর তোমার কর্ম্ম বদলাতে থাকবে। তার মানে এইখানেই স্ত্রীপুত্র, টাকাকড়ি—সব পাবে। এবার যদি স্ত্রীর দরকার হয়, তোমাকে স্ত্রীর জন্য ছুটতে হবে না; এই খানে স্ত্রী বললেই তাকে দেখতে পাবে। লক্ষ্মী এখানেই আছে; খালি বললেই হ'ল, অমনি এসে গেল লক্ষ্মী! এটা তপস্যা ক'রে পেতে হয় না—নেড়ে ঢেউ তুললেই হয়—বললেই হয়। এই কর্ম্ম-মুক্তি সব চেয়ে বড় মুক্তি। মা আমাদের এই অধিকারের সিংহাসন দিয়ে ব'সে আছেন।

দেবীর সৃষ্টিস্থিতিলয়ভাব ও তার উদ্দেশ্য

তোমার এই ক্ষুদ্র জীবত্বটি গড়তে গিয়ে মাকে সমস্ত ভাণ্ডার নিয়ে দাঁড়াতে হ'য়েছে। নিজবোধের যত শক্তি—ঈশ্বরত্বের যত সিদ্ধি—সব পুঁজি নিয়ে নিজবোধের ত্রিপাদ ভূমিতে দাঁড়িয়ে তবে 'জীব' ব'লে তোমাকে তৈরী করেছেন। তিনি বলেন—"আমার বাচ্ছাটি বিয়োব। সেই জন্য আমি এমন ভাঁড়ার নিয়ে বা'র হয়েছি যে বাচ্ছাটি যা চাইবে তাই যেন ঢেলে দিতে পারি।" এরই নাম 'দেহ' তৈরী করা, 'সন্তান' তৈরী করা, 'তনু' তৈরী করা; এসব একই কথা। একটি দেহ তৈরী করতে গিয়ে মায়ের কল্পতরু সেজে বসতে হয়। রাজা যখন কল্পতরু হন, তার রাজত্বের সমগ্র পুঁজি নিয়ে বসেন, ও যে যা চায় তাই দেন। **Just hear and be amazed.** তেমনি ভগবতী এই দেহটি তৈরী করবার জন্য গোড়ায় ব'সে রয়েছেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র সুখের ভাণ্ডার নিয়ে! তাই যদি হবে, তবে যা খুসী তা পাও না কেন? তোমার চাইতে জানা হয়নি ব'লে। তুমি চাইতে গেলে সাড়ে তিন পোয়া ব'লেই চাও; কেন না এর বেশী কিছুর সম্বন্ধে তোমার ধারণা নেই।

জড় বিজ্ঞানের কথা হ'ল—ওটা থেকে একটা ঢেউ বেরুল—ওটা থেকে এটা কেটে বেরিয়ে পড়ল—তার মানে সৃষ্টি হ'ল। আর চেতন বিজ্ঞানে এরই নাম হ'ল 'সন্তান' তৈরী করা—যাতে প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয়রূপ নিজত্বের অংশ দিয়ে এই সন্তানের সঙ্গে আদান প্রদান চলতে পারে। ভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করেছেন—এর মানে কি? যে সৃষ্টিকর্ত্তাকে চেনেনি, তার মনে হবে এটা বুঝি একটা অচেতনের খেলা—mechanically হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে সৃষ্টি-কর্ত্তাকে বা চিন্ময়ীকে চিনেছে, সে ব'লবে, "এই যে আমার মা—সাক্ষাৎ ভগবতী! যাঁ থেকে সন্তান ফুটছে!" একথা যার না ফুটবে, সে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কি কইবে? 'সৃষ্টি' হ'ল মানে ছেলে তৈরী হ'ল, অথবা গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হ'লে যেমন ম্যা-ম্যা ক'রে কেঁদে উঠে, তেমনি response (সাড়া) ফুটে উঠল।

'স্থিতি' মানে কি?—মায়ের দুধ খাওয়া। এটা হ'ল ভোগ ক্ষেত্র। এই যে ভাত ডাল প্রভৃতি খাবার খাচ্ছ, এ আর কিছু নয়, খালি মা তোমাকে বুকে ক'রে মাই দিচ্ছেন—হরেক রকম রস বা অনুভূতি দিচ্ছেন। মা যখন মাইয়ের বোঁটা মুখে দেন, তখন সেই সঙ্গে আসে দেহের সমগ্র উপাদান। সমগ্র বিশ্বের সুখদ্বার এই। এই পাঁচটা তন্মাত্রা দিয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সুখ থেকে আরম্ভ ক'রে বিষ্ঠার ভিতরের কৃমির সুখ পর্য্যন্ত সর্ব্ব সুখ তৈরী। সবারই উপাদান ওই পঞ্চতন্মাত্রা—সাক্ষাৎ গৌরী, শঙ্করী! জিনিষগুলি হ'ল ওই পঞ্চ রসেরই মাপের তারতম্য মাত্র।

জগতের সব অন্ধকার হ'য়ে গেছে; বলছে—এটা ছাড়, ওটা ছাড়; বলে না, মাকে নিয়ে direct ব্যবহার কর। 'মাকে নিয়ে ভোগ কর'—ঋষিদের একথাটা একেবারে ধামাচাপা দিয়েছে। ওরা বলছে, "ওই যে চৈতন্য—চিন্ময়, ওদিকেই

যাও", as if মা ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে! যা কিছু কর—খাও, পর, বেড়াও—মাকে নিয়েই কর। ব্রহ্মদর্শনই এইরূপ—"আমার চোখে যা আসছে, সব দেখব "মায়েরই দুধ"। এ দর্শন হ'লে, ডুবে কখনও মরতে পার? যে বলে "মায়ের দুধ", সে ডুব জলে পড়লেও মরবে না—তাকে ভাসিয়ে তু'লে নেবে। তা হ'লে বেঁচে থাকা মানে মায়ের দুধ খাওয়া।

'লয়' বা মৃত্যু হ'ল মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়া। এইরূপ ভাবে মায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নিয়ে এই 'তন্ত্র' অর্থাৎ 'সন্তান' প্রতিপালিত হচ্ছে। তুমি মনে করছ শৈশব থেকে আজ পর্য্যন্ত তোমার দু'টা হাত, দু'টা পা—সব যেমন তেমনি ঠিক আছে; কিন্তু ৬০।৭০ বৎসর ধ'রে এই তনুটাতে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন চলছে;—শৈশব থেকে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মায়ের কালশক্তি একে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই শক্তি তোমাতেই রয়েছে। যদি নিজেকে ভাল ক'রে চেন, তা হ'লে দেখবে, মায়ের যে শক্তি, তোমারও সেই শক্তি। এই রকমে তোমাতে নিজের সমগ্র ঐশ্বর্য্য দেখাবার জন্য পাগল হ'য়ে যিনি আছেন, তাঁর নাম 'সুখস্বরূপা' মা। এই মা খালি নিজের সুখেই ঢল-ঢল, এমন নয়। যাকে আলাদা ক'রে দেখতে বাধ্য হয়েছেন, সেই তনুকে—তোমাকে—যতক্ষণ না নিজ-স্বরূপের ধর্ম্মে ধর্ম্মী ক'রে দেখতে পান, ততক্ষণের জন্য জগৎ ব্যবহাররূপ একটা স্নেহের আবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে তোমার চক্ষুদান করছেন। এটা খালি তোমার চোখ ফুটাবার এক ব্যাপার। এ না হ'লে কি ক'রে চলবে? মা যদি ইচ্ছা করেন, তোমায় চরম সীমায় টেনে তুলতে, তবে যে তুমি **disappear** করবে—অচেতন হ'য়ে প'ড়ে থাকবে। কিন্তু মায়ের উদ্দেশ্য এটি নয়। তিনি যে 'তন্ত্র' তৈরী করবেন, তাকে দেখিয়ে দিবেন মায়েতে যা আছে তাতেও তাই আছে। তিনি বললে তবে তুমি হও—রাজা 'কি বাঁদর। সুতরাং

যতক্ষণ না এই 'হওয়ার' বিজ্ঞানটি তোমাতে transmit ক'রে দেখিয়ে দিতে পারেন, ততক্ষণ তিনি কেমন ক'রে বলবেন যে তোমাকে সব দিয়েছেন ? তা হ'লে চিরদিন যে তোমাকে থাকতে হয় মুক্তিহীন পুরুষ হ'য়ে ! তোমাকে তার স্বরূপধর্ম্মে ধর্ম্মী না করা পর্য্যন্ত শুধু যে তোমার মুক্তি নেই তা নয়, ভগবতীরও মুক্তি নেই।

"ভগবতীরও মুক্তি নেই যতক্ষণ না আমায় মুক্ত করেন—" একথা তিনিই আমাদিগকে বলতে দেন। গীতায় মা বলছেন— "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" যখন ভগবতীকে তুমি ডাকছ, এর মানে বুঝে নিতে হবে ভগবতীও তোমাকে অমন ক'রেই ডাকছেন। তোমার দিক থেকে তুমি যে ডাকছ, ওটা ভগবতীর দিক থেকে ভগবতীরও ডাক। ওই একই জায়গায় ভগবতী ও তুমি—স্বরূপভাব ও শক্তি। এই দুই মূর্ত্তি ধ'রে যে চেতন তত্ত্বটি রয়েছে, এই চেতনে "কথা কইলেই হয় শোনা"—এই principleটি apply ক'রে দেখলে এই হবে না কি যে, "আমি ডাকছি ভগবতীকে মানে ভগবতী ডাকছেন আমাকে ?" দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখ, যেমন দুই জনেই দুই জনকে খুঁজছে ; তারপর হঠাৎ যখন দু'জনই দু'জনের সামনে এসে পড়েছে, তখন দু'জনেই একসঙ্গে ব'লে উঠে, "এই যে তুমি !" তেমনি ভগবতীকেও ডাকার বেলায়। সুতরাং one-sided ভগবান্ off-hand কখনও ব'ল না।

সম্ভূতি ও অনুভূতির সঙ্গমক্ষেত্র

ভগবৎ ক্ষেত্রে না ব'সে 'ভগবান্' বলা ভুল। ঈশ্বরী ক্ষেত্রে ব'সে তবে তুমি 'মা' বল—ভগবান্ বল। তখন যাঁহাতক বলবে 'মা', অমনি response আসবে 'এই যে আমি, বাবা'—"Instantly (তৎক্ষণাৎ) দু'জনেরই respon se (সাড়া) হবে ; এর মানে হবে —মায়ের "সম্ভূতি" মূর্ত্তিতে প্রকাশ, আর তোমার "অনুভূতি"

মূর্ত্তিতে ভোগ। যেমন তোমার দেহটি সম্ভূতিময়, তেমনি তা অনুভূতিময়ও হ'য়ে রয়েছে। এখন ভাব where you meet (কোথায় তোমাদের সঙ্গমস্থল)। শরীরটা তৈরী করছেন মা, আর দখল করছ তুমি। দু'জনের দু'টা—'সম্ভূতি' ও 'অনুভূতি' একসঙ্গে meet করছে এখানে। সম্ভূতি মানে পাওয়া in yourself (তোমাতে) অর্থাৎ একেবারে তাই হওয়া। এখানেই মাতাপুত্রের সঙ্গম হ'য়েছে। এবার জগৎ ব্যাপারে চোখ দিয়ে দেখ দু'মুখো দু'জনের সঙ্গম ছাড়া কোন unit আছে? যে জিনিষ নিজেই তৈরী করে, আবার নিজেই ভোগ করে, সে হ'ল 'দু'মুখো', বহির্ম্মুখে তৈরী করে বা বা'র করে, আর অন্তর্ম্মুখে ভোগের দিকে চলে।

প্রতি সৃষ্ট তনুর নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম

'তৈরী' করা মানে হ'ল বা'র ক'রে দেওয়া, আর 'ভোগ করা' মানে আত্মসাৎ করা। তুমি ভোগের ভিতর দিয়ে চললে—খেতে গেলে রসগোল্লা, আর তার কত আদর করলে; কিন্তু রসগোল্লার যদি মুখ থাকত, সে ব'লত, "ওমা! আর যে আমি নেই!—আমি যে ফুরিয়ে গেলাম!" সে দেখে শুধু তার মৃত্যু। তেমনি তোমরা যা কিছু ভোগ ক'রছ—টাকা ব'ল, স্ত্রী ব'ল—ঐ গুলি ফুরিয়ে গেলে হয় মৃত্যু। "সৃষ্টি হয়েছে" মানে তাতে ভোগ আছে, এবং ভোগ আছে মানে লয় আছে। তুমি যেখানে যা কিছু pick-up (গ্রহণ) করছ, তাতে 'সৃষ্টি স্থিতি লয়' এই তিনটি অবস্থা ওতঃপ্রোতভাবে একসঙ্গে গ্রথিত আছে। এ ভিন্ন কোন existence কখনও ফুটতে পারে না। সুতরাং একে one-sided (পক্ষপাত) ভাবে নেবার তোমার ক্ষমতা নেই।

এটা প্রমাণিত বিজ্ঞান—জড়ে পর্য্যন্ত, খালি চেতনতত্ত্বে নয়। জড় বিজ্ঞানে যদি আজ পর্য্যন্ত প্রমাণ না হ'য়েও থাকে তো কাল হবে। তুমি নিজের existence feel (অস্তিত্ব অনুভব) ক'রছ

মানেই ভগবতীর existence feel করছ; তার মানেই তাতে 'সম্ভূতি' আছে ও 'অনুভূতি' আছে। 'অনুভূতি' মানেই হ'ল তাতে 'লয়' আছে—যেটা ভোগ কর সেটা আম্বন্বে 'লয়' বা বিনাশ' হ'য়ে যায়। তাই অনুভূতি মানেই 'বিনাশ'।

প্রতি বাক্য উচ্চারণে দেবী ও তৎতনুর যুগপৎ প্রস্ফোটন

ভগবানকে ডাকছি মানে হবে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" অর্থাৎ "যে মুহূর্ত্তে জীব আমাকে যেমন ভাবে দেখছে আমিও সেই মুহূর্ত্তে ঐরূপ ভাবেই তাকে চাইছি"; এটা একটা দু'তরফা action. এই হ'ল একটা 'সঙ্গম'; অর্থাৎ বাক্য উচ্চারণ এবং বাক্য শ্রবণ—রূপদর্শন এবং রূপ হওয়া—এ উভয় ক্রিয়া একসঙ্গে হ'ল। তত্ত্ব হিসাবে যেমন দেখা শোনা যুগপৎ ফোটে, তেমনি আমার ভগবতী ডাকা মানে আমি ও ভগবতী যুগপৎ ফুটি।

এমন যে তত্ত্ব, তা থেকে কত দূরে পড়ে থাক যখন ভগবতী-হারা হ'য়ে থাক! যদি বা মান, তাও বল "সাড়া পাও না, তুমি নিরাশ—হতাশ্বাস, ভগবতী অনির্দ্দিষ্ট—আলাদা, ইত্যাদি।" এ যে শ্মশান জ্বেলে ব'সে আছ!—এর ত্রিসীমানায় ভগবতীর আসবার রাস্তা নেই। আবার এই দুঃখময় ক্ষেত্রে ভগবতী আবিষ্কার করার জন্য কত engineer, কত surveyor, কত sappers, কত miners লাগিয়েছ, যন্ত্রাদি ঘাড়ে ক'রে কত মাপ জোপ ক'রে রাস্তা তৈরী করছ কিন্তু দেখতে পাচ্ছ না, যেখানে তুমি ব'সে আছ সেইখানেই মাও ব'সে আছেন; সে জন্য বন জঙ্গল কেটে রাস্তা বা'র করতে হয় না।

ছেলে যতদিন ছোট থাকে, ততদিন সে মায়ের কাছে সব জিনিষ কিনে দিবার জন্য আবদার করে। সে সব মায়ের কিনে দিবার ক্ষমতা আছে কিনা তা সে ভাবে না। এই হ'ল প্রথমাবস্থা। তারপর ছেলে যখন বড় হয়, আর দেখে যে মায়ের সবই আছে—ইচ্ছা

করলেই সব দিতে পারে, তখন সে মায়ের দিকে চেয়ে বলে, "মা. তুমি আমার পক্ষে ভাল মনে ক'রে যা দিবে, তাই নিবো।" এই হ'ল জীবের জীবত্ব-গলানো বৃত্তি। এই অবস্থায় জীব মায়ের দিকে চেয়ে অবাক হ'য়ে বলে, "তুমি মা, এইটা দিচ্ছ? তবে এইটাই বুঝি আমার পক্ষে ভাল; তা বেশ! তাই দাও।" এই হ'ল দ্বিতীয়াবস্থা। আর তৃতীয়াবস্থা হবে, "মায়ের যে দিক দিয়ে তৃপ্তি আমারও সেই দিক দিয়ে তৃপ্তি;—মায়ের সুখ ও আমার সুখ এতে কোন স্বাতন্ত্র্য নেই।" এটি হ'ল ঋষির অবস্থা। এ অবস্থায় দুইয়েরই কামনা এক এবং যুগপৎ ফুটে উঠে।

এই আত্মতত্ত্ব যে ভাবে দর্শনের কথা কয়দিন বললাম, এপথে তোমরা চলতে পারছ? আমি attainment এর (প্রাপ্তির) কথা শুনতে চাই না। আমি চাই জানতে এইটা করবার জন্য তোমাদের spontaneous (স্বতঃসিদ্ধ) ঝোঁক এসেছে কিনা? তোমরা খেটে খুটে যা পার, বা'র ক'রে নিতে হয় নাও গিয়ে; কিন্তু আমি তাতে তৃপ্ত হব না। মা যশোদা যেমন প্রভাস যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে স্বহস্তে নিজের ননী খাইয়েই তৃপ্ত হয়েছিলেন, তেমনি আমিও যে স্বীয় জিনিষটি তোমাদের নিজ হস্তে খাওয়াব, তাতেই হবে আমার তৃপ্তি।

—শ্রীগুরুবাণী, রবিবার ১৬-৩-১৯৪১

—০:*:০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চণ্ডিকার সম্ভূতিমূর্ত্তি চামুণ্ডা

[চুম্বক :—"চেতনাই পরম কল্যাণময় ও সর্ব্বশক্তিধর ভগবান" —ঋষিদের এই নির্দ্দেশই সাধনার ভিত্তি। এই চেতনাই আত্মবোধরূপে পরিগৃহীত হ'লে জ্যান্ত ভগবান হ'য়ে দাঁড়ায়। এঁর বিশ্বম্ভরা মূর্ত্তি দর্শনে শরণাগত ভাবের উদ্ভব। বিশ্বকে যুগপৎ জ্ঞানমূর্ত্তি ও আত্মমূর্ত্তি ব'লে দর্শন করা ঋষির উপদেশের সারমর্ম্ম। সৃষ্টি বা সম্ভূতির অনুকরণ—অনুভূতি বা গ্রহণ। সম্ভূতি বিনা অনুভূতি অসম্ভব। মহাকালের কলন দ্বারা পদার্থসমূহের পরিবর্ত্তন, এবং জীব চৈতন্যে তদনুভূতির বাধ্যতা। 'জ্ঞানমূর্ত্তি' মানে সম্ভূতির বুকে অনুভূতি। 'অনুভূতি' নিজত্বের শুধু একটা অধীনতার ছবি নয়। সম্ভূতিময়ীকে দেখে অনুভব বা ভোগ করার ফল—দেবত্ব প্রাপ্তি; আর না দেখে ভোগ করার ফল—অসুরত্ব বা পরাধীনতা প্রাপ্তি। সম্ভূতিময়ী ভগবতী ও অনুভূতিময় 'আমি'র সহাবস্থান। ত্রিবিধ মুক্তি দ্বারা দেবত্বলাভ; শেষে মহাকালের বুকে চামুণ্ডা দর্শন ও তাঁতে আত্মসমর্পণ। মানব জীবনের ভিতর সম্ভূতিময়ী মায়ের আবর্ত্তন লীলার প্রত্যক্ষতা। মুক্তির উদ্দেশ্য—১। মৃত্যুঞ্জয় হওয়া, ২। অমৃতত্ব বা সম্ভূতিময়ত্ব লাভ করা। কর্ম্মময় ও ভোগময় অনুভূতির তলায় সম্ভূতির প্রকাশ। সম্ভূতির দৃষ্টান্ত। সম্ভূতিরূপিণী মহাশক্তি বা চামুণ্ডাকে প্রত্যক্ষ করা যায় কি? আত্মবোধের আপাদমস্তক বিস্তৃত দিকটাই সম্ভূতিময়ী অক্রমদ্রষ্টা ভগবতী; আর হৃদয়গুহায় অনুপ্রবিষ্ট অনুভূতিময় ক্রমদ্রষ্টাই নিজবোধরূপী 'আমি'। আপাদমস্তক বিস্তৃত সম্ভূতিমূর্ত্তিই চামুণ্ডা। অন্তরাকাশে প্রবিষ্ট দু'জন সত্যপায়ী পুরুষ কে কে?—'চামুণ্ডা' ও 'আমি'। এই চামুণ্ডা আত্মবোধের বাইরে ভীষণা ও অন্তরে সৌম্যা। আত্মবোধে আমিত্বের বিলয়। ভগবানে আমিত্বের লয় এবং আমিত্বে ভগবানের লয়, এই দু'য়ের পার্থক্য। সম্ভূতিরূপিণীকে দেখার আর একটি ফল—'আমার' কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান তাঁতে হস্তান্তরিত হওয়া। সম্ভূতিরূপিণী চামুণ্ডার দর্শনই জীবন, আর অদর্শনই মৃত্যু।]

ঋষিবাণী—চেতনাই সর্ব্বশক্তিধর ভগবান্

জীবনটাকে seriously (গুরুভাবে) নিজের হাতে তুলে নিতে হবে, এবং নিজের পরম কল্যাণের দিকে পরিচালিত করতে হবে। এটা করতে গেলে আপাতকল্যাণ ব'লে তোমার ছোটখাট কল্যাণগুলি উপেক্ষিত হ'য়ে যাবে। এই যে জীবনের পরম কল্যাণ, সে সম্বন্ধে চিন্তা করতে গেলে দেখা যায় যে, এটা যে খুব কঠিন ব্যাপার তা নয়। পরম কল্যাণ সম্বন্ধে ঋষিরা যা দেখেছেন ও ব'লে গেছেন, তাকে সংক্ষেপ ক'রে নিলে দেখা যায় যে একমাত্র চেতনাই সর্ব্বতশ্চক্ষু হয়েছেন। এটি দেখাই হ'ল পরম কল্যাণ; অর্থাৎ যা কিছু দেখছি, চেতনা বা জ্ঞান ছাড়া আর কাউকে দেখছি না। শুধু এইটুকুই হ'লেই সাধনা হ'য়ে যায়। তা হ'লে "জ্ঞানকে ছাড়া আর কাউকে দেখছি না" এর মানে হ'য়ে যায়, এই জ্ঞানদেবতাই ভগবান্। কেন? এতে দেখছি হরেক রকম মূর্ত্তি—হরেক রকম বৈচিত্র্য—তৈরী হয়েছে। যিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই এত রকমারি হয়েছেন। তার মানে হ'ল তাঁর বিশ্বমূর্ত্তি ধরবার capacity (সামর্থ্য) আছে। তা হ'লে তিনি অনন্ত মূর্ত্তি ধ'রে, অনন্ত শক্তি সেজে, চির জাগ্রত ও চির আনন্দময় হ'য়ে বিরাজ করছেন। সুতরাং তিনি নিশ্চয় ভগবান্।

তারপর সেই জ্ঞানস্বরূপে আপনাকে পূর্ণমাত্রায় ডুবাবার জন্য আত্মবোধরূপে তাঁর পরিগ্রহণ আবশ্যক। কেননা ইনি যতক্ষণ না আত্মবোধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হন, ততক্ষণ পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান হয় না। এটি হ'লে, আপন অস্তিত্ব তিনি ছাড়া আর কেউ নয় ব'লে দেখা যায় এবং পূর্ণ প্রত্যক্ষতা এসে যায়। আপনাকে এ জ্ঞানটায় তোলাও যা, আর ব্যাপ্ত ভগবান্ বলাও তাই—আত্মবোধ ভিন্ন জ্ঞানস্বরূপের প্রাণময় মহিমার উপলব্ধি হয় না।

চেতনার বিশ্বম্ভরা মূর্ত্তিদর্শন ও তার ফল

আসল কথা এই, জ্ঞানদেবতাই যে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন আর ইনিই একাই সব হন—এরূপ ধারণা নিয়ে আসতে হবে। এই ধারণা হ'লেই আপনা হ'তে তাঁর শরণাগত হ'য়ে পড়তে হয়। এতবড় মহিমা দেখে ক্ষুদ্র জীব এমন কেউ কোথাও থাকতে পারে না, যে মাথা নমিত না ক'রে থাকতে পারে। তা হ'লে 'জ্ঞান' ব'লে বিশ্বকে জানতে হবে, এবং 'জ্ঞান' মানে সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বাত্মা, এটা বুঝতে হবে। 'সর্ব্বাত্মা' মানে হ'ল সব নিজত্ব—এমন কোথাও কিছু নেই, যা তিনি 'নিজে' না হয়েছেন। সুতরাং এই নিজস্বরূপ ভাব এবং সব নিজেই হয়েছেন, এই সর্ব্বময় ভাব তাঁতে আছে। 'সর্ব্বময়' ভাব মানে খালি চেহারা নয়, প্রাণশক্তি এবং সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক বিপুল খেলাও বটে। সমস্তটা মিলে হ'ল এক ঘোর 'বিশ্বম্ভরা' মূর্ত্তি। যাঁহাতক এই বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি জ্ঞানস্বরূপ দেবতার দর্শন হয়, তখনই আর শরণাগত না হ'য়ে থাকার যো নেই। রাজসাপকে দেখলে যেমন অন্য সব ছোট ছোট সাপ আপনিই তার পেটের ভিতর প্রবেশ করে, তেমনি এই বিশ্বম্ভরা মূর্ত্তিকে দেখলে, আপদ থাক বা না থাক, সম্পদ থাক বা না থাক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিজত্বকে আর আলাদা ক'রে রাখতে পারা যায় না।

এই জন্যই ঋষি খুব সহজসিদ্ধ পন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন, এই বিশ্বকে জ্ঞানের মূর্ত্তি ব'লে দেখতে। "স এব পুরস্তাৎ, স এব পশ্চাৎ, স এব উত্তরতঃ, স এব দক্ষিণতঃ, স এব উপরিষ্টাৎ, স এব অধস্তাৎ, স এব অন্তরতঃ, স এব বাহ্যতঃ, স এব ইদং সর্ব্বম্।" এইরূপে প্রথমেই বিশ্বকে তন্ময় ও জ্ঞানময় ক'রে দেখ। সত্য সত্যই তোমাকেই সর্ব্বত্র দেখছি—তুমি ছাড়া আর কাউকেও দেখছি না"—এইটি আগে ক'রে নিবে। তারপর দেখতে হবে নিজেকেও

এইরূপ সকল দিকেই দেখছ—দেখতে হবে তোমাকে সর্ব্বত্র দেখতে গিয়ে দেখতে পাই নিজেই সর্ব্বত্র রয়েছি"—"অহমেব পুরস্তাৎ, অহমেব পশ্চাৎ, ইত্যাদি"। "আমি যেখানে রয়েছি তুমিও সেই খানেই রয়েছ; আবার তুমি যেখানে আমিও সেখানে।" এই যে দর্শন—এর পরিচয় হ'ল আত্মতত্ত্বের পরিচয়—"আত্মা এব পুরস্তাৎ, আত্মা এব পশ্চাৎ," ইত্যাদি। আত্মতত্ত্ব হ'ল এমন জিনিষ যে যদি বলি "তুমি রয়েছ", তবে "আমিও রয়েছি।"

উত্তর ও দক্ষিণ-মেরুর কথা তোমাদের বলেছি। সেখানে সৃষ্টি বা সম্ভূতি এবং তার গ্রহণ বা 'অনুভূতি' এই দুই ক্রিয়াই চলছে। 'সম্ভূতি' ও 'অনুভূতি' এই দু'টা এসে যেখানে meet করে, তাকে বলে 'পদার্থ'। 'সম্ভূতি' রচনা করে, আর 'অনুভূতি' গ্রহণ করে যাকে, তাই 'পদার্থ'। ব'লে দিয়েছি যে এটা শুধু অনুভূতির ব্যাপার নয়; 'অনুভব করলাম' মানেই সৃষ্টিও করলাম—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই ত্রিবিধ জ্ঞানক্রিয়া ফুটে উঠল। তবে 'সম্ভূতি' স্বীকার করবার কি প্রয়োজন? সম্ভূতিকে বাদ দিয়ে অনুভূতি যদি হয়, তবে তুমিই হ'য়ে যাও নিজেই ঈশ্বর! সুতরাং 'সম্ভূতি' ব'লে একটা কিছু আছে, আর অনুভূতিতে তার একটা অনুকরণ তৈরী হয়। "জাহাজটা ডুবে গেল" ব'লে তোমার যে অনুভূতি, তার পিছনে ঠায় একটা জাহাজ জ্ঞান আছে। সেটা হ'ল সম্ভূতি'—কেননা তুমি তো আর জাহাজ তৈরী ক'রে ডুবিয়ে দিলে না? 'সম্ভূতি'তে না থাকলে, তুমি কিছু কল্পনা করতে পার না। "জগৎ ব্যাপারবর্জ্জম্।" জিনিষ নেই, অথচ তার অনুভূতি হ'ল—এরূপ হয় না। তবে দু'টা তিনটে জিনিষ ভেঙ্গে একটা করতে পার।

মহাকালের কলন ও তার পরিণতি

স্মৃতি ব'লে যা আছে—যার নাম 'সৃষ্টিক্ষেত্র' বা 'ব্রহ্ম'—সেটি কালচক্রে ঘুরে ঘুরে আসছে। ব'সে ব'সে তুমি কল্পনা করতে পারতে

না, যদি মহাকালের স্রোত এরূপে ঘুরে ঘুরে না এসে তোমায় subconsciously (অৰ্দ্ধচৈতন্যভাবে) উদ্রিক্ত না করত। খালি স্থিতিশীল জগৎ রয়েছে, আর সেটা তোমায় উদ্রিক্ত করছে ও তাতে তোমার জ্ঞান হচ্ছে—এ ধারণা ঠিক নয়। এক বিপুল মহাকালশক্তি জগৎকে আবর্ত্তিত করছে, তার নাম হ'ল 'ব্রহ্মার স্মৃতি' ফুটছে। 'স্মরণ' ব'লে যে একটা জ্ঞানক্রিয়া, সেটাও 'কাল।' মহাকালের নর্ত্তনের বা কলনের যে ধাক্কা আসছে, তা দ্বারা সমস্ত পদার্থ পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। তারই impression তুমি পাচ্ছ, বা তাই তুমি অনুভব করছ। কিন্তু শুধু বাহ্য impression দেখলে যথেষ্ট দেখা হ'ল না। এই বিপুল মহাকালের বুকে এক মহাশক্তি আপনা হ'তে খেলে যাচ্ছে এবং ছড়িয়ে যাচ্ছে; আর তোমরা তাকে অনুভব করতে বাধ্য হচ্ছ নিজেদের capacity বা কর্ম্মানুসারে। সুতরাং সম্ভূতি ভিন্ন অনুভূতি হয় না। "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"—যেমনটি আছে তেমন পরিচালিত হচ্ছে—পরিবর্ত্তিত হচ্ছে; আর স্মৃতিতে তাই ফুটছে।

তোমার জন্ম ও তাই; যেমন ক'রে যাচ্ছ, তেমনি পরিকল্পিত হচ্ছে; আর এ জিনিষের after-effect হ'ল তোমার পুনর্জ্জন্ম। সুতরাং তুমি একবারও মনে করতে পার না যে তুমি যা খুসী ভোগ ক'রে যাচ্ছ, অথচ ভগবানকে দেখছ না—শুধু তোমারই জ্ঞানক্রিয়া ফুটছে, ভগবানের জ্ঞানক্রিয়া এখানে নেই। জ্ঞান বলতে গেলে যে 'নিজে'—শুধু এইটা এসে পড়ে, তা নয়। এখানে ভগবান্ আছেন আর 'আমি' আছি; এবং এখানে যেমন ভগবানের মহাকালস্রোত 'সম্ভূতি' আকারে বইছে, তাঁরই বুকে 'আমি' 'অনুভূতি' আকারে ভোগ করছি।

এইটা দেখে প্রাণ বলে উঠে "হে ভগবতি! সম্ভূতি রূপে এই যে তুমি আমার নজরে ধরা পড়ে যাচ্ছ—এ সৌভাগ্য আমায়

দিচ্ছ! এর ফল কি খালি তোমাকে দেখা—এ-পর্য্যন্তই? তুমি মহাশক্তি ঘুরছ, আর আমি তোমার বুকে রয়েছি—এই ত এক জনের দুরতিক্রম্য প্রভাবের দ্বারা এক অধীনতার ছবি মাত্র দেখালে! কিন্তু তা ছাড়া আর কি কিছু ফল নেই?"—আছে, এ দেখার ফল অভিনব, অসীম, অমূল্য—তুমি চাও বা না চাও! ওই যে অনুভব করছ, তা ভগবতীকে দেখে করা আর না দেখে করা, এর ফল আকাশ পাতাল তফাৎ। একই অনুভূতি—এঁকে দেখে করলে হয় দেবতা, আর না দেখে করলে হয় অসুর! অসুরত্ব যেখানে সেখানে অনাত্মভূমিতে ঠেলে নিয়ে যায়। "অসুরভূমি কেন বলেছ, ভগবতি, তা বুঝেছি। ওখানে তোমাকে তো দেখা যায় না; কিন্তু এখন তোমাকে নজরে ঠেকছে বিপুল। তুমি যেখানে সম্ভূতিময়ী, সেখানেই আমি অনুভূতিময়; যেখানে আমি অনুভূতিময়, সেখানেই তুমিও সম্ভূতিময়ী। এমনি ভাবে আমার নিজত্বের এবং আমার ভোগের স্থান তোমারই বুকে, কিন্তু এঁটা দেখলে দেবতা কেমন ক'রে হব?"

ত্রিবিধ মুক্তি ও তার লক্ষ্য

এটা আমি বুঝিয়ে দিয়েছি 'ত্রিবিধ মুক্তি' ব'লে। প্রথম হ'ল 'জ্ঞানমুক্তি' বা 'প্রকৃতি মুক্তি'—এতে আর জগৎ ঠেকেছে না অচেতন ব'লে। তারপর একে দেখতে হবে বিপুলা 'চামুণ্ডা' মহাদেবীর দিগদিগন্তব্যাপী শক্তিপ্রকাশ রূপে; এই হ'ল দ্বিতীয় মুক্তি বা দক্ষিণা মুক্তি। তারপর দেখবে এই জ্যোতিস্বরূপা শক্তি চলেছেন—আলোর মত—যেমন তেমনি রয়েছেন, অথচ লাবণ্য ছড়িয়ে খেলা করছেন। আত্মস্বরূপ মহাকাল নিজে রয়েছেন, আবার কালরূপে ফর্ ফর্ ক'রে চলেছেন। এই হ'ল তৃতীয় মুক্তি বা কর্ম্মমুক্তি।

তুমি ভাবছ তুমি যেমন মানুষ ছিলে তেমনি ব'সে আছ। ভাল ক'রে যদি নিজের অনুভূতির ভিতর চেয়ে দেখ তো দেখবে,

তোমার আয়ুসূর্য্য অস্তাচলমুখী হয়েছে; আর এর ভিতর কত সূর্য্য উঠল আর অস্তমিত হ'ল। তোমার শৈশবাবস্থা, যৌবনাবস্থা প্রৌঢ়াবস্থা কোথায় গেল? এর ভিতর দিয়ে কি সম্ভূতিরূপিণী মাকে দেখা যাচ্ছে না?

মুক্তি ত্রিবিধ হউক আর পঞ্চবিধই হউক, এর আসল কথা হ'ল, মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া আর অমৃতের ভোক্তা হওয়া। 'অসম্ভূতি' মানে হ'ল 'অবিদ্যা বা বিনাশ', আর সম্ভূতি মানে বিদ্যা' বা 'অমৃত'। অনুভূতির তলায় তলায় পরিত্রাণত্ব ও অমৃতের অনুভোক্তৃত্ব। একটা দেখে তদধীন ভোক্তা হওয়ার নাম অনুভোক্তৃত্ব। কর্ম্ম ও অনুভূতি—এই হ'ল ভোগ। 'অনুভব' মানে activity বা কর্ম্মও বটে, আর একটা আস্বাদ বা ভোগও বটে।

সম্ভূতিরূপিণী মহাশক্তি চামুণ্ডা ও নিজবোধরূপী 'আমি'

সম্ভূতির একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সমুদ্রে জাহাজ চলেছে, তার সঙ্গে কাছি দিয়ে launch ও গাধাবোট বাঁধা আছে; সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। হঠাৎ ঝড় উঠল—কাছিটা ছিঁড়ে গেল। তখন ধাক্কা ও প্রতিধাক্কা খেয়ে launchও ডুবল, গাধাবোটও ডুবল। তেমনি তুমিও launchএর ন্যায় কতকগুলি গাধাবোট জুড়ে নিয়ে চলেছ। সেগুলি হ'ল তোমার (সাংসারিক) কর্ত্তব্য। স্ত্রী জুড়েছ, পুত্র জুড়েছ, আরও কত কি! যতক্ষণ কয়লা আছে, ততক্ষণ steam ছাড়ছ আর চলেছ। যাঁহাতক ঝড় উঠল আর কাছি কেটে গেল, তখন কোথায় বা launch আর কোথায় বা সে সব গাধাবোট! এই experience মাথার উপর ঝুলছে, তবু তোমরা এই 'মহাকালশক্তি'কে দেখছ না বা seriously (গুরুভাবে) নিচ্ছ না।

তুমি হয়ত ব'লবে—এই যে সম্ভূতিরূপে মহাকালশক্তি আঁকলেন, আমি নিজের কাছে নিজে যেমন visible, এঁকে এইরকম visible

ক'রে পেলে, আপনাকে তো অত বকতে হয় না! এই রকম ক'রে "বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী" ও "বিচিত্র-খট্টাঙ্গ-ধরা" মা যদি আমার কাছে visible হন, তা হ'লে তো আপনাকে উপদেশও দিতে হয় না! আমার ইচ্ছা নেই, চেষ্টা নেই, কাম নেই, বুদ্ধি নেই—এসব কথা হচ্ছে না; যে কারণেই হউক আমার চোখ বাইরে আছে। কিন্তু ওই রকম প্রত্যক্ষতাই যদি আমার বুকের তলায় দিতে পারেন, তা হ'লে এই বিপুল কালাগ্নির বুকে আমার মত কোন্ পোকা ঝাঁপ দিয়ে না পড়বে—তা ভালবেসেই হোক বা অন্য যে কারণে হোক?

এই চিন্ময়ী মহাদেবীকে যে ভাবে কামনা করলে, ঠিক সেই ভাবে তাঁকে দেখবার জন্যই এই সব আলোচনা। এজন্য বলেছি, তোমার আত্মবোধের যে অংশে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বিধৃত, সেই অংশই তোমার ভগবতী; আর তোমার আত্মবোধের যে অংশে হৃদয়, এটি হ'লে তুমি। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত তুমি নিজে—না, আর কেউ? 'নিজে'—এইটি তোমার আছে, খালি তুমি ধরতে পার না। যে জ্ঞানদেবতা তোমার 'নিজস্বরূপ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত, ইনিই তোমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু হাত পা—এসব তুমি 'নিজে'ই—একথা তুমি স্বীকার ক'রতে পারছ না—এগুলি তোমার 'পর' ব'লে মনে হচ্ছে; অথচ তুমি বল, তোমার নিজের হাত, নিজের পা। আবার এই যে সব 'নিজের' বলছ, তাও তোমাকে 'ক্রমদ্রষ্টা' হ'য়ে ভোগ করতে হচ্ছে। এগুলি দেখছ বটে, কিন্তু দেখার সময় একেবারে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যে 'নিজে', এই পর্য্যন্ত তুমি নিজেই বিস্তৃত, এ কথাটা জেনেও পাটা, হাতটা, মাথাটা পর.পর আলাদা আলাদা ক'রেই ভোগ ক'রে যাচ্ছ। এই 'ক্রমদ্রষ্টা নিজে'টি হৃদয়গুহায় প্রবিষ্ট 'নিজে'—হৃদয়ের ছেঁদায় অনুপ্রবিষ্ট এই অনুভূতিময় নিজবোধটি হ'লে তুমি। আর যে

'নিজবোধ' পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সে হ'ল সম্ভূতিময় 'নিজবোধ' বা ভগবতী। তা হ'লে এই যে 'নিজবোধ' ইনি নিজেই সম্ভূতি ও অনুভূতি, এই দু'টাই হন আবার নিজে দু'টা হন ও না।

আপাদমস্তক বিস্তৃত এই যে নিজবোধ ইনিই হ'লেন সাক্ষাৎ চামুণ্ডা। এই শরীরটা তাঁর সম্ভূতি—অর্থাৎ কালের বিপুল স্রোত এতে চলছে। তার মানে এই নয় যে ইনি এতে নেই, তবু স্রোত চলছে। ইনি যেমন তেমনি রয়েছেন, অথচ কাল-স্রোতস্বরূপেও বর্ত্তমান। তোমার শরীরের পরিবর্ত্তন, তোমার অনুভূতির পরিবর্ত্তন বা ভোগের পরিবর্ত্তন—সবই করছেন ওই "স্মৃতিময়ী"—মহাকালশক্তি। ওঁর বুকেই বইছে যত সব পরিবর্ত্তনের স্রোত।

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।"

"ঋতং পিবন্তৌ"—দ্বিবচনে কথাটা বলা হ'ল, কেননা দু'জনে সত্যপানে রত। "সুকৃতস্য লোকে"—যিনি সুকৃত বা জ্ঞানী পুরুষ অর্থাৎ ঋষি, তাঁর চোখে একথাটি ধরা পড়ে যাচ্ছে। "গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে"—এই দেহ বা হৃদয়রূপ গুহায় দু'জন সত্যপায়ী রয়েছেন—এক জন ওই মা 'চামুণ্ডা' আর এক জন হ'লে তুমি। তিনি purposely তোমার জন্য হৃদয়গুহা তৈরী ক'রে ফুটে রয়েছেন, যাতে ক'রে তুমি এই সত্য পান করতে পার। যেমন গোটা স্তনেই দুধ আছে, কিন্তু সে দুধ যেমন বোঁটা দিয়েই খেতে হয়, তেমনি ওই মহাদেবীর স্তনবৃন্ত হ'ল এই অন্তরাকাশ বা হৃদয়াকাশ যেখানে তুমি 'নিজে'—'নিজে' ব'লে ভোগ কর। তুমি যে বল 'নিজে', ওটা নিজত্বের অনুভোগ মাত্র। যেমন 'স্মৃতি' রয়েছে ব'লে 'অনুস্মৃতি' হচ্ছে, তেমনি আসল 'নিজবোধ' অথচ নিজ-বোধরূপী সম্ভূতিময় দেবতা রয়েছেন ব'লে, তুমি 'নিজে' ব'লে

অনুভোগ করতে পারছ। তোমার 'নিজে' ব'লে ওই বোঁটাটি হ'ল তোমার হৃদয়, যেখানে তুমি অনুভোক্তা হয়েছ।

চামুণ্ডা দর্শন

এই যে মহতী চামুণ্ডাশক্তি, এঁকে বাইরে যখন দেখছিলাম, তখন তিনি ভীষণা। আবার এঁকে যেই 'নিজের' ভিতরে পুরে নিলাম, অমনি দেখি ওঁরই নিজবোধে—সেই জন্মস্থিতিমৃত্যু ধরা রয়েছে—সেই কর্ম্মচক্রই চলেছে—সেই ক্রিয়া বিবর্ত্তনই দেখা যাচ্ছে কিন্তু মহাশক্তির ওই ভীষণত্ব আর মালুমে আসছে না। আত্মবোধে ঢুকে তিনি যেন একেবারে পোষা পাখী হ'য়ে গেলেন—এই পোষা মা এখানে শুধুই খাওয়াচ্ছেন। আত্মবোধের বাইরে এঁকেই দেখি 'করালিনী কালী।' তখন "ত্বমেব উর্দ্ধত্বাৎ, ত্বমেব অধস্তাৎ, ত্বমেব পুরস্তাৎ, ত্বমেব পশ্চাৎ, ত্বমেব সর্ব্বতঃ" বলে ওঁকে দেখা যাচ্ছে। বিপুল করাল কাল—তাতেই আমি—এই জ্ঞানটাকে engulf ক'রে নিজের ভিতর ঢুকিয়ে নিলে ও অনাত্মজ্ঞানের বা'র হ'য়ে গেলে দেখি— অহমেব উর্দ্ধত্বাৎ, অহমেব অধস্তাৎ, অহমেব পুরস্তাৎ, অহমেব পশ্চাৎ, অহমেব সর্ব্বতঃ।" এই দু'টা দেখা ঘন হ'য়ে গেলে, অমনি আত্মরূপে প্রত্যক্ষা মা—জ্যান্ত মা—এসে দেখা দিলেন। তখন দেখি আত্মৈব উর্দ্ধত্বাৎ, আত্মৈব অধস্তাৎ, আত্মৈব পুরস্তাৎ, আত্মৈব পশ্চাৎ, আত্মৈব সর্ব্বতঃ।" এঁকে যখন দেখলাম তখন আমি ব'লে দুধ-খেকো খোকাটিকে আর খুঁজে পাচ্ছি না। সে খোকা এখন পড়ে গেছে এবং তার স্থানে দাঁড়িয়েছে 'কালী'! মহাকালতত্ত্বের যে বাহ্যভূমি সেখান থেকে আমি গুর-গুর ক'রে আত্মবোধে এসে, যেখানে এলে আমিত্ব disappear ক'রে আর শুধু উনিই থাকেন—সেই নিজবোধে দাঁড়ালাম, যে নিজবোধ পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

একটু আগে যে বাইরে পিট্-পিট্ করছিল, সেই নিজত্বই এখন পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এর মানে এ নয় যে আমি

ছোট্ট ছিলাম, আর এখন ভগবান্ হ'য়ে গেলাম। আসল কথা, ভগবান্ এইখানেই ছিলেন, আর আমি শুধু তাতে গ্রস্ত হ'য়ে গেলাম। কিন্তু ভগবান্ যদি আমাতে গ্রস্ত হ'য়ে যান, তার ফলে হয় আমার অসুরত্ব প্রাপ্তি।

আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। এই যে কালচক্রের বিবর্ত্তন আমায় ঘুরাচ্ছে, ফিরাচ্ছে, চালাচ্ছে—এইটা দেখলে আমার কর্ত্তৃত্ব জ্ঞানটা ওঁর হাতে এসে পড়ে; তখন দেখতে পাই তিনিই সব করছেন। তা হ'লে সংসার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যটা বদলে গিয়ে ভগবতীকেই ডাকার কর্ত্তব্যটা এসে যায়। আমাকে কর্ত্তা সাজিয়ে সাজিয়ে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, তার ভিতর দিয়ে দিয়ে আমাকে তিনি এমন জায়গায় এনে ফেলেছেন, যেখান থেকে আজ তাঁকেই দেখতে দিচ্ছেন—যিনি নিজে আপনার মহতী তনু আপনিই বিস্তার ক'রে ধরেছেন!

যিনি আড়াল থাকলে তার মানে হয় 'মৃত্যু', তাঁর ব্যক্ততায় আসার নাম 'জীবন' হ'ল না? তা হ'লে যখন আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে"—এই বলে দেখি তার মানে যেখানে যত 'মরণ' আছে সবই বেঁচে উঠে। "মা আমার ওটাকে—এই দৃষ্টিটাকে একেবারে সত্যের ক'রে দিয়ে দাও! আমরা যে ভীত—মৃত্যুগ্রস্ত!"

—শ্রীগুরুবাণী, বুধবার, ১৯-৩-১৯৪১

—০:*:০—

পঞ্চম অধ্যায়

অসুরতত্ত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

চণ্ডিকার স্থূল ও সূক্ষ্মমূর্ত্তির সমন্বয়

বা অসুরত্ব, নরত্ব ও দেবত্বের সমীকরণ

[চুম্বক :—প্রলয় বা পাতালে প্রবেশ কিরূপে হয়? প্রলয়ের পর যে জাগরণ, এটি হয় ভগবৎশক্তিদ্বারা। এই শক্তির নাম বরাহ। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু কে? এই অসুরদ্বয়ের কবল থেকে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায়? প্রহ্লাদ ও তার জন্মবৃত্তান্ত। বড় অসুর হিরণ্যকশিপু ও ক্ষুদ্র অসুর জীব। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের 'হরি' কে এবং কিরূপ? হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ ও জীবের প্রহ্লাদে তারতম্য। ভগবানের বরাহমূর্ত্তি ও নৃসিংহ মূর্ত্তি। চেতনের ত্রিমূর্ত্তি—দেবত্ব, নরত্ব ও অসুরত্ব। সাংখ্যবর্ণিত আত্মত্বের ত্রিবিধ অধিকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম। অসুরকে জ্যেষ্ঠ আর দেবতাকে কনিষ্ঠ বলা হয় কেন? পূর্ণানন্দ ও ক্ষুদ্রানন্দ। শিব ও জীবের ব্যোম-ভোলা ভাবে পার্থক্য। ঋষিপদবাচ্য কে? কৌমার্য্য ও ঋষিত্ব। কৌমার্য্যের পূর্ণত্ব কিরূপে হয়? আপ্ত-কামত্বের উদ্দেশ্য—পরাভক্তির উদয়। সিদ্ধ পুরুষ ও মুক্ত পুরুষে পার্থক্য। পরমানন্দ লাভের উপায়—ক্ষুদ্রানন্দকে পরমানন্দের প্রকাশ ব'লে গ্রহণ। দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের একীকরণ। পুরাণ বর্ণিত স্ফটিক স্তম্ভের অন্তর্নিহিত অর্থ। সর্ব্ব দৃশ্যের মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য 'চেতন'; আর তারই স্বরূপ হ'ল সর্ব্বানন্দ। একার্ণবে বিলীন কিরূপে হ'তে হয়। সর্ব্বানন্দ ও একার্ণবে পার্থক্য কি? স্থূলত্বের সার্থকতা। চিন্ময়ী সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ও স্থূলাদপি স্থূল। ভগবৎ লাভের পন্থা দু'টির মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়? ভগবানকে ভোগ করা ও ডাকা একই কথা। ভগবৎ আবির্ভূতি কিরূপে সম্ভব? দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনেরই সমীকরণ। চামুণ্ডা দর্শন কিরূপে হয়।]

প্রলয় ও বরাহশক্তির আবির্ভূতি

"আমি দেহী" ও "দেহ আমার"—এই জ্ঞানটুকু আঁকড়ে ধ'রে সাধারণ মানুষ জীবন যাপন করে; এবং এই দেহটি কেমন ক'রে চলছে, আর এতে কে চলছে—এসব কথা ছেড়ে দিয়ে এই দেহে পূর্ণ-মাত্রায় নিজের অধিকার রয়েছে, এই ভাব নিয়ে কর্ম্ম করে ও ঘুমিয়ে পড়ে। তখন সে যেন সমস্ত পৃথিবী নিজের ভিতর পুরে "পাতালে প্রবেশ" করে ও ঘোর অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সমস্ত দিন তার দেহজ্ঞানই প্রবল থাকে ব'লে সেই জ্ঞানেই সমাচ্ছন্ন হ'য়ে সে ঘুমুতে যায়। এরই নাম প্রলয় হওয়া—পাতালে প্রবেশ করা।

এটিকে আবার পরিচালনা করবার জন্য যে আয়োজন হয়, তার নাম হয় 'সৃষ্টি'। এই সৃষ্টিক্রিয়াটি করবার জন্য ভগবানকে কর্ম্মমূর্ত্তিতে প্রবেশ করতে হয়। তিনি কর্ম্মমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হ'য়ে ওই প্রলয়-স্থান পাতালপুর থেকে এই আচ্ছন্ন ভাবটি ভেঙ্গে দিলে, তবে তোমার জাগরণ হয়। সৃষ্টির ভিতরে কর্ম্মশক্তি ঠেলা দিয়ে না জাগালে, সে ঘুম চিরঘুম হ'য়ে যায়। এটি সকলের জীবনে নিত্য প্রত্যক্ষ বরস্বরূপ—আশীর্ব্বাদ স্বরূপ।

তুমি সমস্তদিন খেটে খুটে আস বটে; কিন্তু ঘুমের বেলায় তোমার কিছু নেই—সব প্রলয় হ'য়ে গেল; তুমি আছ কি নেই—এমন কোন বোধ পর্য্যন্তও রইল না। সেখানে যদি তিনি তোমাকে না জাগাতেন, তবে তুমি কেমন ক'রে জাগতে? তাতে যে তোমার কর্ত্তৃত্ব নেই! আত্মার যদি শক্তি থাকে সেখান থেকে উঠে তোমাকে জাগরণময় করবার, তবেই তুমি জেগে উঠতে পার—নইলে তোমার ঘুম চির ঘুমে পরিণত হয়। মৃত্যুর বেলাও তাই।

তা'হলে এই যে দানটি—সকালবেলা ঘুম থেকে তোমার জেগে উঠা—এর ভিতর একটি বিশিষ্ট ভগবৎমুখাপেক্ষিতার ভাব দেখা যাচ্ছে। এক পুরুষ এখানটায় ব'সে তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয় এবং আবার তোমাকে কর্ম্মময় করে। এটি লক্ষ্য ক'রে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'বরাহ'। এই 'বরাহ' মূর্ত্তিতে বা যজ্ঞমূর্ত্তিতে এসে, পৃথিবী বা পাতাল বা অন্ধকার বা প্রলয় ভেদ ক'রে, ভগবান্ আমাদের জাগিয়ে তোলেন। এরই নাম হ'ল—আমি যে অসুরগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, তার হাত থেকে আমাকে বরাহরূপী ভগবানের উদ্ধার করা। এই ভাবে অসুরকে মেরে ফেলা হ'লে, তখন আবার দেহে কর্ম্ম চলতে লাগল। কিন্তু আচ্ছন্নতারূপ অসুরটাই হয়েছে ঘুম, তা জানতাম না; তাই জেগে উঠেও ওই বরদ পুরুষকে ধরতে পারলাম না। আমায় কে জাগালে তার হিসাবই নেই। তিনি আমায় না তুললে যে আমার সবই ফুরিয়ে যেতো, একথাটা মাথায়ই আনি না। নিত্য অভ্যাস হ'য়ে গেছে ব'লে, এই যে আমার সব একেবারে ফুরিয়ে যায়, আর এক দেবতা এসে আবার সব ফুটিয়ে দিয়ে যায়—এটা খেয়ালই করি না। কর্ত্তা দেখি না ব'লে জেগে উঠেই, আগে যেমন নিজেই কর্ত্তা ও ভোক্তা সেজেছিলাম, তখনও তেমনি ভাবে কর্ত্তা সেজে আবার কর্ম্ম ক'রতে আরম্ভ করি।

হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু

এই যে দু'টা ভাব—(১) দেহজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে পাতালে বা প্রলয়ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়া, আর (২) সেখান থেকে জেগে উঠে "আমিই কর্ত্তা, আমিই ভোক্তা, আমিই সব—আমি ছাড়া কোথায় আর কে আছে?" এই জ্ঞানে ব্যুত্থিত হওয়া, এই দু'টা ভাবকে শাস্ত্রে নাম দিয়েছে—'হিরণ্যাক্ষ' ও হিরণ্যকশিপু।' এরা দুই ভাই অসুর। হিরণ্যাক্ষ হ'ল "সমগ্র দেহটি আমার—এই জ্ঞান" আর

হিরণ্যকশিপু হ'ল 'আমিই এই সমগ্রের কর্ত্তা—এই জ্ঞান। এই দুই অসুর দ্বারা তুমি অহর্নিশ পরিচালিত হচ্ছ। ভগবান্ যজ্ঞমূর্ত্তিতে বা বরাহমূর্ত্তিতে তোমাকে রোজ জাগিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তুমি দেখতে পাও না, কে জাগিয়ে দিচ্ছেন, এবং কেনই বা জাগিয়ে দিচ্ছেন আর যাঁহাতক জাগিয়ে দিচ্ছেন অমনি নিজ দেহের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে! তখন নিজের এই দেহের ব্যবহার করতে গিয়ে মনে হয় "আমিই দেহ"। "আমার দেহ"—"আমার দেহ" করতে করতে এটা হ'য়ে যায় "আমিই দেহ।" কাজেই 'আমি' যে চিন্ময়, এ ভাবটি আর থাকে না। নিজের এই যে দেহভাবাত্মক পরম বিমূঢ়তা, তার নাম "হিরণ্যাক্ষ।" ব্যবহারের কথাই বলছি; দেহ-শুদ্ধ নিয়ে—নিজের দেহাত্মকভাবময় মূঢ়মূর্ত্তি নিয়ে—যখন পূর্ণমাত্রায় ডুবে যাই তখন হই 'হিরণ্যাক্ষ'—প্রলীন পাতালবাসী। আবার যেই জেগে উঠি—মূঢ়তা ভেঙ্গে গেলে কর্ম্মক্ষেত্রে যেই সঞ্চরণ করতে যাই অমনি দেখি, "আমিই কর্ত্তা"—"আমিই ভোক্তা।" তখন আবার যাতে 'হিরণ্যকশিপু' হই, সেই পথেই চলতে থাকি, তার মানেই, ওই 'বরাহ' দেবতাকে—যজ্ঞময় পুরুষকে, অথবা যজ্ঞেশ্বরীকে—দুর্গাকে —সিংহবাহিনীকে—তখন দেখি না।

এই দুই বিমূঢ়তার বা অসুরের হাত থেকে উদ্ধার পেতে হ'লে আমাকে কি করতে হবে?—যখন কাজ করব, তখন দেখব সত্যি আমি কর্ত্তাও নই, ভোক্তাও নই; আর সত্যি সত্যি 'দেহী' এই নামে যে 'আমি', ওটা একটা আসুরিক ভাব—ওটা কর্ত্তা নয়, আসল কর্ত্তা হ'ল স্বয়ং ঈশ্বরী। এই জ্ঞানে যদি কর্ম্মক্ষেত্রে বা যজ্ঞক্ষেত্রে জেগে থাকি, তবেই যখন ঘুমাব তখন আর পাতালপুরে আমার প্রবেশ হবে না। তখন আমার যে আসল কর্ত্তা তাঁকেই দেখব; তখন দেখব, তাঁরই এ সমস্ত প্রকাশ—তাঁরই এই স্থূল বিশ্বমূর্ত্তি।

অবশ্য স্থূল বিশ্বমূর্ত্তি বলাও যা 'দেহ' বলাও তাই; তিনিই এই স্থূল বিশ্ব সাজেন, এবং তিনিই কর্ত্তা ও ভোক্তারূপে বিরাজ করেন। এই দু'টা পাদ দেখতে পেলেই চিন্ময় দেবতাকে স্বীকার করা হয়—মেনে নেওয়া হয়—পাওয়া হয়।

প্রহ্লাদের জন্ম

এর স্বীকৃতি যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ জীব কখনও আনন্দ লাভ করতে পারে না—আনন্দময়ীকে পেতে পারে না। অথচ আমরা প্রতি পদে পদে আনন্দ ভোগ করি। আমাদের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্মের ভিতর দিয়েই আনন্দ জাত হয়; এরই নাম 'প্রহ্লাদে'র জন্ম। 'আনন্দ' জাত হচ্ছে মানে 'প্রহ্লাদ' জাত হচ্ছে।

'হিরণ্যকশিপু' খুব বড় একজন অসুর ছিল, সে হ'য়েছিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একজন কর্ত্তা। বিষ্ণুকে মারবার জন্য সে সর্ব্বত্র তার খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছিল; কিন্তু ওকে বাধ্য করতে পারেনি। আমরা হ'লাম ছোট ছোট অসুর—বিষ্ণুর খোঁজ খবরই রাখিনে। ওই যে বড় অসুর 'হিরণ্যকশিপু', ওর ছেলে হ'ল আনন্দে জাত প্রহ্লাদ, বড় হরিভক্ত। যে আনন্দে জাত হচ্ছে সে আনন্দময়ীরই পুত্র—একথাটা আমরা জানি না বা আমাদের খেয়ালেই আসে না। কিন্তু 'হিরণ্যকশিপু' ছিল এক ভাগ্যবান অসুর; তাই তার খেয়ালে এসেছিল যে 'প্রহ্লাদ' আনন্দময়ীর পুত্র।

একদিন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুই যে হরি—হরি করছিস্, সে কে এবং কোথায় থাকে?" প্রহ্লাদ বললে, "বাবা! ইনি সর্ব্বব্যাপী আনন্দস্বরূপ সর্ব্বভূতস্থ আত্মা। তাঁকে দেখা আমি বিন্দুমাত্র আয়াসসাধ্য ব'লে মনে করি না; যেখানেই যাও না কেন, তাঁর মূর্ত্তি দেখবে 'আনন্দ'। সর্ব্বভূতের মূল হ'ল এই আনন্দ মূর্ত্তি"। কিন্তু আমাদের 'প্রহ্লাদ'কে অর্থাৎ আনন্দকে

এমন কথা জিজ্ঞেসও করি না। আর আমাদের যে 'প্রহ্লাদ' সে কি 'হরি—হরি' করে? করে, কেন না 'প্রহ্লাদ' কখনও হরি ছাড়া থাকে না। তবে আমরা তা শুনি না—আমাদের সে কানই নেই। আমাদের দর্শন শ্রবণাদি যা কিছু প্রকাশ, প্রত্যেকটি আনন্দস্বরূপকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের এই কান অভিশপ্ত ও লুকানো।—নইলে 'প্রহ্লাদ' যে অনবরত বিষ্ণু-বিষ্ণু করছে, ও তা শুনত—বুঝতে পারত। আমাদের 'প্রহ্লাদ' কাকে দেখিয়ে দিচ্ছে—কাকে mean করছে—আমরা তা বুঝতেই পারি না; আমরা বিষ্ণুর অনুসন্ধিৎসু নই, সুতরাং হিরণ্যকশিপুর মত অসুর নই। আমরা যদি আমাদের 'আনন্দ'কে হিরণ্যকশিপুর মত জিজ্ঞেস করি "তোর বিষ্ণু কে এবং কোথায়?" তবে সে তা দেখিয়ে দেয় কি? 'আনন্দ' শব্দটি হয়েছে 'নদ্' ধাতু থেকে—নদতি ইতি নন্দনম্। ভগবান্ থেকে সর্ব্বদা আনন্দ ক্ষরিত হচ্ছে। ভগবান্ কোথায়? আনন্দ প্রকাশই যে ভগবানের প্রকাশ; একথাটা আমাদের প্রাণে একবারও জাগে না। যদি জাগত তো আমাদের প্রহ্লাদও বলত—"ওই আনন্দই ভগবান", আর আনন্দ নিজেই ব'লে উঠত, "আমি সব জায়গায়ই আছি"। ভগবান্ 'বরাহ' রূপে—যজ্ঞমূর্ত্তিতে—কর্ম্মশক্তি রূপে মারলেন 'হিরণ্যাক্ষ'কে; আর 'নরসিংহ' রূপে মারলেন 'হিরণ্যকশিপু'কে। 'নরসিংহ' মানে হ'ল যার আধখানা 'নর' আর আধখানা 'সিংহ'—নীচের দিকটা মানুষের মত আর উপরের দিকটা সিংহের মত—নীচের দিকটা নরযজ্ঞস্বরূপ, আর উপরের দিকটা ব্রহ্মযজ্ঞস্বরূপ।

আত্মার ত্রিমূর্ত্তি

চেতন তত্ত্বে আত্মা তিনটে entity নিয়ে বিরাজ করেন:-(১) দেবত্ব, (২) নরত্ব, (৩) অসুরত্ব। 'দেবত্ব' হ'ল তিনি নিজেই প্রকাশ—এই জ্ঞানটি নিয়ে যখন থাকেন। 'অসুরত্ব' হ'ল, যখন তিনি একদম

ভুলে যান—যা' বললাম দেবত্বের বেলায়। আর 'নরত্ব' হ'ল, যখন তিনি এই দুই অবস্থাকে—দেবত্ব ও অসুরত্বকে—যুক্ত ক'রে তার একদিকে দেবময় ও আর একদিকে অসুরময় দেখেন। দেবত্ব ও অসুরত্ব এই দু'টা ভাব যেখানে জড় বা সংহত হ'য়ে থাকে —সন্ধি প্রাপ্ত হয়—সেখানটাকে বলা হয় 'নর'। অসুরকে ধরে ভগবানের কাছে নিয়ে যাওয়া, আর ভগবানকে ধরে অসুরের কাছে নিয়ে আসা—এই রকম যাদের কর্ম্ম, তাঁরাই 'নর'। নয়তি ইতি নরঃ। এই সংযোগটি যে করে, অর্থাৎ যে কর্ম্মময় মূর্ত্তি ও যজ্ঞময় মূর্ত্তি অবলম্বন ক'রে অসুর ও দেবতা উভয়ের সংযোগ ঘটায়, সে 'নর'। এই 'নর'—হয় উঠে চলে যায় দেবক্ষেত্রে, নয় নেবে আসে অসুরক্ষেত্রে। এই জন্য এক হিসাবে দেবতাদের চাইতেও মানুষের দর বেশী।

সাংখ্যদর্শনে ঠিক এই রকম কথাই বলা আছে। আত্মত্বের অধিকার তিন রকম—উত্তম, মধ্যম ও অধম। তার মধ্যে উত্তম অধিকার মানুষের, মধ্যম অধিকার দেবতার, এবং অধম অধিকার অসুরের। মানুষের অধিকার উত্তম হ'ল, কেননা সে অসুর ও দেবতার সমন্বয় ক'রে নিতে পারে। দেবতা অসুরের শত্রু, এবং অসুরও দেবতার শত্রু; এই দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তিকে মিলিয়ে ধরে 'নর'। মিলিয়ে নেবার এই অধিকার কি দেবতাকে দেওয়া সম্ভব হ'ত? না। কেন না, দেবতা হ'ল আলো আর অসুর হ'ল অন্ধকার। আলো এলেই অন্ধকার সরে যায় এবং অন্ধকার হ'লে আলো আর দেখা যায় না। এই আলো ও অন্ধকার মিশিয়ে এক করে মানুষ। তাই এই দু'টির সংযোগ বজায় রাখবার জন্যই মানুষের সৃষ্টি। এই কারণে নরক্ষেত্রেরই প্রাধান্য। সুতরাং মনুষ্য জীবনটি ক'ত বড় একটা pivot (কীলক) স্বরূপ বা ধরে রাখবার ক্ষেত্র, জগৎ প্রকাশে একথাটি ভেবে দেখতে হয়।

মানুষ অসুরকে প্রশ্রয় দিলে অসুরের রাজ্য বেড়ে যেতে পারে; আবার মানুষ কর্ম্মের দ্বারা অসুরকে ভগবৎসংযুক্তও ক'রে নিতে পারে। কাজেই মনুষ্যত্বক্ষেত্রটি কর্ম্মময়তার ক্ষেত্র—বড় কষ্টের—বড় পরিশ্রমের ক্ষেত্র। অসুরক্ষেত্র ও দেবক্ষেত্র—এ দু'টা কর্ম্মময়তার ক্ষেত্র নয়—ভোগক্ষেত্র। আমি যদি 'মানুষ' ব'লে নিজের পরিচয় দিতে চাই তা হ'লে আমার প্রথম কাজ হবে এই দেবাসুরের সম্মিলন ক'রে নেওয়া। এই হ'ল উপনিষদের উপদেশ।

পূর্ণানন্দ শিব ও ক্ষুদ্রানন্দ জীব

তোমরা মনে কর, অসুরকে ধ্বংস করাই তো ভাল; কিন্তু তা নয়। অসুর সৃষ্টির প্রাধান্যের কথা উপনিষদে বলা হয়েছে, "অসুরাঃ বৈ জ্যেষ্ঠাঃ দেবাঃ কনিয়াংসঃ।" অসুর জ্যেষ্ঠ আর দেবতা কনিষ্ঠ কেন? অসুর ক্ষেত্রটি হ'ল স্থূলক্ষেত্র; এটি যতক্ষণ না প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ 'আনন্দ' মূর্ত্ত হয় না—মোহাচ্ছন্ন হওয়া হয় না—নেশায় বিভোর হওয়া হয় না। 'আনন্দ' এইরূপ বিভোর না হ'লে আপনার বৈচিত্র্যকে বিভোর করতে পারে না। পূর্ণানন্দময় যে শিব, তিনি তো নেশায় বিভোর; সেখানে সর্ব্ববৈচিত্র্যের—একীভূত সমূহ আনন্দ—সর্ব্বরসের সার। বৈশিষ্ট্যে তোমাকে তাই পেতে হবে।

স্থূল ক্ষেত্রে আর পরমতত্ত্ব ক্ষেত্রে আনন্দের কি তফাৎ? স্থূলক্ষেত্রে হ'ল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশিষ্ট বিশিষ্ট আনন্দ; আর পরমতত্ত্বক্ষেত্র সর্ব্বরসের সার—অর্থাৎ সর্ব্ববিধ রস এখান থেকেই উঠতে পারে। সর্ব্বত্র যদি ফুটিয়ে দেখা না থাকে তো 'সর্ব্বরসের সার'—এ কথাটিরও কোন মূল্য থাকে না। সর্ব্বরসের যে সার, এটি ভাঙ্গলে তবে বিশিষ্ট রসগুলি বেরোয়। এই জন্যই ওর দাম। নতুবা সে আনন্দও কোন আকার পায় না এবং এ আনন্দও কোন আকার পায় না। একদিকে একীভূত সার, সমরসময় আনন্দ, আর এক দিকে বিশিষ্ট

বিশিষ্ট বিষম বৈচিত্র্যময় আনন্দ—এই উভয় মেরুকে নিতে হবে। আনন্দের পূর্ণতা নিতে হ'লে এই ভাবেই নিতে হয়। সমরসে মহাদেব বিভোর হ'য়ে, 'ব্যোম ভোলানাথ' হ'য়ে আছেন; আর এখানে ওকে ক্ষুদ্র আনন্দে বিভোর হ'য়ে 'ব্যোম ভোলানাথ' সাজতে হবে। এখানে 'ব্যোম ভোলানাথ' হ'তে গেলে অসুর হ'য়ে পাতালে যেতে হয়; কেন না, এখানে 'ব্যোম ভোলানাথ' ক্ষুদ্রানন্দে বিভোর হ'য়ে নিজেকে ভুলে পাতালবাসী হয়েছেন। এই জন্য যেমন অসুর মহাদেবের প্রিয় তেমনি অসুর আবার মহাদেবের ভক্ত। অসুরের এ ভাবও একজাতীয় হরিজ্ঞান।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মা ক্ষুদ্র একটা কিছু নিয়ে বিমূঢ় হ'য়ে আর সব ভুলে থাকে, তাই সে 'ব্যোম ভোলা'। মহাদেবও ঠিক এমনি ক'রে সব ভুলে থাকেন, তাই তিনি 'ব্যোম ভোলা'। কিন্তু তিনি সব ভুললে কি হবে—সমস্ত বিশ্বটা পেয়ে পেটে পুরে তবে ভুলে থাকেন। আর তুমি ছোট্ট একটায় ভুলে থাক, আর চারিদিকে বিশ্বটা তোমার বাইরে পড়ে থাকে। এই জন্য তোমাতে ও তাঁতে এত ফারাক। এই 'ব্যোম ভোলা' ভাব তাতে আছে ব'লেই অসুরেরও দাম আছে। তার খারাপ দিকটা ছেড়ে দাও। অসুরের এই মূর্তিটি—শিবের মত ডুবে থাকা ভাবটি—তোমায় পেতে হবে। তোমাকে যদি এটি পেতেই হয়—এটি যদি তোমার প্রাপ্তব্য—তো কেমন ক'রে পাবে?—যেমন ক'রে ভগবান্ পেয়েছেন। খালি টুকরাগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে তোমরা সবাই অসুর হ'য়ে রয়েছ। তুমি যতক্ষণ 'তুমি' নও 'তিনি,' ততক্ষণ তিনি যুগপৎ এই অসুরত্বে ভুলে আছেন আবার তাঁর সঙ্গে যত কিছু আছে, সে সব তিনি ভুলে গিয়েও ভুলে যাননি। আর তিনি 'মানুষ' হ'য়ে দেবত্ব ও অসুরত্ব দু'টাই পেটে পুরে নিয়েছেন ব'লে, 'অসুর' অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্বের দ্রষ্টা হ'য়েও তিনি হননি। এইরূপে

সমগ্র অসুরত্ব ও দেবত্ব নিয়ে তিনি বসে রয়েছেন। শুধু এই টুকু দেখে ব্রহ্মতত্ত্বে কি দোষ রয়েছে, তা' বিচার করতে গেলে হবে না। যুগপৎ বহু দেবতার, বহু অসুরের আর বহু মানুষের সঙ্গে যাঁর সংযোগ রয়েছে—আবার যিনি যুগপৎ দেবতা-অসুর-মনুষ্য সেজেছেন এবং দেবতা-অসুর-মানুষ খেয়ে ব'সে আছেন—কোন্ দিক দিয়ে তাঁর বর্ণনা করব—কোন্ দিক দিয়ে তাঁকে মাপব? তাঁকে দেবতা বললেও হবে না, মানুষ বললেও হবে না, অসুর বললেও হবে না। সবটা এক সঙ্গে মাথায় এসে যাওয়া চাই। বাইরে যে মা দাঁড়িয়েছেন অসুরনাশিনী মূর্ত্তিতে ওঁরই পায়ের তলায় অসুর রয়েছে। আবার ওই মা-ই ঐ অসুর সেজেছেন—ওই মা আবার দেবতা ও মানুষ সেজেছেন। ওই মা আবার অসুরকে মেরে আনন্দ করছেন! এই মা কেমন রে বাবা! চেতনক্ষেত্রটি এক অদ্ভুত ক্ষেত্র নয় কি?

কৌমার্য্য ও ঋষিত্ব

যারা এইরূপে সমগ্রের দ্রষ্টা হয়, তারাই প্রকৃত দ্রষ্টা—তারাই ঋষিপদ বাচ্য। চেতনস্বরূপ পরম অমৃতের সমগ্র প্রকাশটি যার নজরে পড়ছে, সে সর্ব্বত্র 'মাত্র একটা' দেখে—চেতন গতির বিভিন্নতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না—"এটা নয়, ওটা" এরূপ বিচার ক'রে চলে না। তার নিকট সব জিনিষ এক সঙ্গে হাজির হয়। এমন পুরুষের নাম 'ঋষি' বা দ্রষ্টা পুরুষ।

সাধন জগতে শিব ও শক্তিতত্ত্ব অবলম্বন ক'রে সাধক কেমন ক'রে 'কুমার' বা মন্ত্রচৈতন্যময় পুরুষ হয়? 'কুমার হয়েছে' মানে নিজের বাক্য দ্বারা যা কিছু প্রকাশ হয়, সেখানকার সমগ্র দেবশক্তি তৎক্ষণাৎ তার অধীন হ'য়ে চলেছে; কিন্তু মাত্র এটুকু নয়, আরো একটু আছে। যেখানে যেখানে যা' যা' আবশ্যক, আর যেটা সে পেতে চায় তাই ওই দেবশক্তি নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সংগ্রহ ক'রে নিতে

পারে। কিন্তু এই কুমারের নাম তখন ও 'ঋষি' হবে না, যদি না তার সঙ্গে সঙ্গে এই বোধের অধিকারের বা ব্যবহার দ্বারা সে পরমদেবতাকে সর্ব্বক্ষেত্রে চিনে নিতে পারে। সে ওই শক্তিদ্বারা মনোমত ভোগ সকল পেতে বা তৈরী করতে পারে; কিন্তু মাত্র ওই পর্য্যন্ত যদি তার শক্তি প্রয়োগের সীমা থাকে, তবে সে পুরুষ আর 'ঋষি' হবে না। তা হ'লে সে ওই দেবশক্তির অপপ্রয়োগ ক'রে ফেলবে আর তাতেই তার পতন ঘটবে। এই জন্য তোমাকে ঋষিত্ব পর্য্যন্ত যেতে হবে—কুমারের phaseটা ওইখানেই পরিসমাপ্ত হ'লে চলবে না। ঋষিত্ব হ'ল কৌমার্য্যের পরবর্ত্তী অবস্থা। চেতন গতি কি ভাবে কোন্ পর্য্যন্ত যায়, এখানে সেই phaseটা দেখাচ্ছি।

ওই দেবশক্তি পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে নজর খুলে রাখতে হবে যে ওই শক্তি দেখতে ভিন্ন ভিন্ন দেবশক্তি বটে, কিন্তু মূলতঃ ওই পরমাত্মাই। 'কুমার' দেখে যে সে নিজেই সব—আত্মা থেকেই সব জাত হচ্ছে; পরমাত্মত্ব দর্শনে এই শিক্ষাটি হয়। কিন্তু এই শিক্ষা পেয়েও যদি পরমাত্মত্ব চোখে না পড়ে, তা হ'লে কৌমার্য্য পূর্ণতায় পর্য্যবসিত হ'তে পারে না। এইরূপ পর্য্যবসিত হ'তে হ'লে, আর একটি জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। সেটি হচ্ছে, আমার যে এই শক্তি আছে, আর আমা থেকেই বা'র করছি, এটি মনে করতে হবে—নিজেই হই, নিজেই ভোগ করি, নিজে থেকেই বা'র করি, আবার নিজেতেই গুড়িয়ে নিই। কিন্তু এই 'নিজে' যে 'পরমাত্মা নিজে', এদিকে নজর থাকা চাই। এই জ্ঞানটির লক্ষ্য হ'ল আত্মত্বের মহিমা কত বড়, এটি দর্শন করা এবং তাতে পূর্ণ হ'য়ে যাওয়া। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে যা' ইচ্ছা তাই ভোগ করতে পারলাম। 'আমি আপ্তকাম হলাম', এর উদ্দেশ্য এই হবে না যে আমি খুব ক'রে লুচি সন্দেশ খেতে পারলাম; লুচি সন্দেশ খাওয়া যায় বটে, কিন্তু ও ক্ষেত্রে কি তা পাওয়া

যায়? ভোগের অংশে জোর দেওয়ার জন্য ভগবান আপ্তকামত্ব দেননি। উনি কী মহান্?—এটি দর্শন দ্বারা আত্মতত্ত্বে পরাভক্তির উদয়—এই হ'ল আসল জিনিষ। কেন না, এইটুকু হ'লে আর 'কুমার' থাকতে হয় না—ভগবৎ সাযুজ্য লাভ হয়—তোমার entity (সত্তা) পরমাত্মত্বে মিশে যায়।

কৌমারী শক্তি প্রাপ্তির পর এদিকটা যার যত ফুটে যেতে থাকে, সে পুরুষ তত যথার্থ মুক্তপুরুষপদবাচ্য হয়। নতুবা, যার শুধু ভোগের দিকেই লক্ষ্য থাকে, সে সিদ্ধ পুরুষ হ'তে পারে বটে, কিন্তু তাকে 'মুক্তপুরুষ', এইরূপ আখ্যা দেওয়া যায় না। আপ্তকামত্ব ও সিদ্ধত্ব এই দু'টি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে সিদ্ধ পুরুষের চাইবার মত যে সব জিনিষ থাকে, সে গুলি সে চাইবামাত্রই পায়। তার অন্তরে কামনার যে ভিন্ন ভিন্ন ধারা আছে, যেমন আম খাব—জাম খাব—লিচু খাব, ইত্যাদি, সে সব ধারা একেবারে মিলিয়ে গেল—"সমুদ্র-মাপো প্রবিশন্তি যদ্বৎ"—এমন হ'বে না। যে 'মুক্ত পুরুষ' তার বেলা সমস্ত কামনার ধারা মিলিয়ে যায় একটি ধারায়; আর তার বেলাই "সমুদ্রমাপো প্রবিশন্তি যদ্বৎ" (গীতা ২।৭০)—এই বাক্যটির প্রয়োগ ঠিক হয়। সে দেখবে "আমিই তো দেবতা—দেবত্ব ছেড়ে অসুরত্ব পেতে চাই কেন? আমিই তো অসুর—অসুরত্ব ছেড়ে দেবত্ব পেতে চাই কেন?" কেন না, তখন অসুর, দেবতা প্রভৃতি যত কিছু সব একেতেই সে দেখছে—সব একরূপে বিরাজ করছে। সিদ্ধপুরুষে আনন্দের বৈচিত্র্যের তরঙ্গ থাকে; কিন্তু মুক্তপুরুষের বেলা আনন্দের সাম্য অবস্থায় চলে যাওয়া হয়।

পরমানন্দ লাভের উপায়

এই কথাটি বলতে গিয়ে বলা হ'ল—আমাদের প্রত্যেক আনন্দকে জিজ্ঞেস করতে হ'বে, "ওরে প্রহ্লাদ! তুই যে হরি হরি

করছিস, তোর সে হরি কই? তুই কি সেই হরিরই প্রকাশ?" প্রতি কামনা পূরণে তোমার যে তৃপ্তি হয়, তাকেও তোমার জিজ্ঞেস করতে হবে, "ওরে তৃপ্তি! তোর ভগবান্ কই? তোর যে ভগবান্, তুই কি সেই ভগবানেরই প্রকাশ? আর সত্যি সত্যি সেই তুই-ই কি এই তৃপ্তির আকারে ফুটে উঠেছিস?" এইখানটাতে তোমার emphasis (জোর) দিতে হবে পুনঃপুনঃ। পরমানন্দকে পেতে হ'লে তোমার প্রতিটি ক্ষুদ্রানন্দের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহারশীল হ'তে হবে—শুধু ditto মেরে গেলে হবে না। যাঁকে পেলে তোমার সমগ্র কাম একার্ণবে শেষ হ'য়ে যাবে —খালি যে কৌমারত্ব পাবে তা' নয়, সমুদ্রের সমগ্র প্রবাহ যেমন এক চুমুকে নিঃশেষ হ'য়ে যায়, তেমনি তোমার সমগ্র কাম প্রবাহ "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপে নিঃশেষ হ'য়ে যাবে, ও তুমি পরম শান্তি লাভ করবে—তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে তোমার এই প্রাপ্তিটি কি হবে শুধু ditto মেরে? তা' যদি হ'ত তো আম খেয়ে কাঁটালের দিকে নজর পড়ত না।

আমি ও 'হিরণ্যকশিপু' হ'য়েছি—'হিরণ্যগর্ভ' তো হইনি! 'হিরণ্যকশিপু' ও হিরণ্যাক্ষ'-এর উল্টা হ'ল 'হিরণ্যগর্ভ'। আমি ও তা হ'লে হিরণ্যকশিপুর মত আমার প্রতি আনন্দ ও প্রতি তৃপ্তিকে জিজ্ঞেস করব, "ওরে আনন্দ! তুই কি যিনি 'হিরণ্যগর্ভ', তাঁরই প্রকাশ? Each and every তৃপ্তি—চোখের, মুখের, কানের—এ সত্যি ভগবৎপ্রকাশ—ভগবানই। যখন কোন দৃশ্য দেখে বল 'বেড়ে দেখতে," তার মানে এটা তোমার চোখের দর্শনশক্তিরই একটি মূর্তি বা ছবি—ওই দর্শন শক্তিই এই ছবি-মূর্তি ধারণ করেছে। যা কিছু দেখা যায় প্রকাশরূপে, সেটি যে জিনিষের প্রকাশ, তাঁকে দেখা হয় না—দর্শন শক্তিই যে তদাকার নিয়ে পড়ে' থাকে, তা দেখা হয় না। যদি জানা

থাকে, আমার দর্শনশক্তিরই এই রূপ—প্রকৃত পক্ষে আমার দর্শনশক্তিকেই এই ভাবে দেখছি, তার মানে হয় আমি আমার শক্তিরই দ্রষ্টা হচ্ছি। দর্শন শক্তি ও দ্রষ্টা কি আলাদা? তা যদি হ'ত, তা হ'লে এই দ্রষ্টাকে দেখবার জন্য আর একটা দ্রষ্টার দরকার হ'ত। যিনি এক পিঠে দ্রষ্টা, তিনিই আর এক পিঠে দর্শনশক্তি; আবার যিনি এক পিঠে দর্শনশক্তি, তিনিই আর এক পিঠে দৃশ্য। এটি না দেখলে তুমি বড় জোর বলবে—"ভগবান্, তোমার কত রূপ"!

এই যে আনন্দময়ী, ইনিই তো প্রকাশ—দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য। এইরূপে যদি আত্মত্ব ত্রিধা হ'য়ে না ডোবে, তো আমার সমুদ্রে ডোবা হবে না। ইনিই দৃশ্য—কিন্তু শুধু দৃশ্য নয়, দর্শনশক্তিও বটে; ইনিই দর্শনশক্তি—কিন্তু দর্শনশক্তি শুধু নয়, দ্রষ্টা ও বটে। এইরূপে যদি সমগ্রত্বে পৌছাতে পারি তো যে 'প্রহ্লাদ' আমাতে প্রকাশ হয়েছে, তাকে অবলম্বন ক'রে আমার আত্মত্ব হবে ভগবানে পৌছাবার একটি স্তম্ভস্বরূপ। এই হ'ল পুরাণে বর্ণিত 'স্ফটিকস্তম্ভ' অর্থাৎ স্বচ্ছ আত্মা। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করেছিল, "এই স্ফটিকস্তম্ভের ভিতর কি তোর হরি আছে? অর্থাৎ আমার এই যে শরীর—এই শরীররূপ স্ফটিকস্তম্ভের ভিতর—তোর হরি আছে?" এর মানে হ'ল—স্ফটিকস্তম্ভস্বরূপ অর্থাৎ স্বচ্ছ আত্মস্বরূপ এই যে আমার মূর্ত্তি, যেখানে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ প্রভৃতি শক্তিগুলি প্রকাশিত হ'য়ে রয়েছে, অর্থাৎ স্বচ্ছ হ'য়ে রয়েছে—এতে কি তোর হরি আছে?" এই দর্শন শক্তিতে ঈশ্বর আছেন কি? দর্শন শ্রবণাদি শক্তিগুলি নিয়েই তো তুমি জীবন ধারণ করছ, আর 'আমি'—'আমি' করছ ও কর্ত্তা সেজে আছ! এই তো তোমার প্রধান অবলম্বন—এই তো তোমার 'স্তম্ভ'!

সর্ব্বানন্দ ও একানন্দ

আত্মা থেকে জাত যে 'আনন্দ'—'আত্মজ'—'প্রহ্লাদ', সেই আত্মজকেই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আত্মার কথা—"তুমি যা থেকে জাত হয়েছ, সেকি এই 'স্তম্ভে' আছে?" ঠিক তেমনি ভাবে তোমাকেও দেখতে হবে। প্রধান জিনিষটি হ'ল 'চেতন'। শরীরে যে দর্শনশ্রবণাদি শক্তির প্রকাশ আছে, তার ভিতর আগে দেখতে হবে 'চেতন'কে। তোমার চোখ দেখে না—দেখে চেতন—চেতনই দ্রষ্টা। সুতরাং তোমার চোখের দর্শনশক্তি নেই—থাকলেও তা অপ্রধান; প্রধান হ'ল এই 'চেতন'। কানে আর কানকে দেখছ না—দেখছ 'চেতন'কে। নাকে আর নাককে দেখছ না—দেখছ চেতনকে। এইরূপে জ্ঞান প্রকাশের পাঁচ দিকেই দেখা যাচ্ছে 'চেতন'কে। দর্শন-শ্রবণ-ঘ্রাণ-আস্বাদন-স্পৃশন নিজেতেই পাওয়া যায়—তার মানেই হয় দৃশ্য বা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, ঘ্রাতব্য, আস্বাদয়িতব্য বা রসায়িতব্য আর স্পৃষ্টব্য সব নিজেতেই পাওয়া যায়। তখন বুঝি, ভাত খাওয়ার সুখ ব'লে দেখছিলাম একেই, তৃপ্তি বা আত্মাগত প্রকাশ ব'লে দেখছিলাম একেই;—একেই দেখছি সর্ব্বরকমের প্রকাশ রূপে। যেখানে যতরকমের আনন্দ সব এতেই রয়েছে। এই চেতনকে ভগবান ব'লে দেখা, তার মানে সর্ব্বানন্দ তাতে বিলীন রয়েছে, এইটি দেখা। ভগবৎ স্বরূপ হ'ল 'সর্ব্বানন্দ'। তাঁর স্বরূপকে 'সর্ব্বানন্দ' ব'লে যখন না দেখি, তখনই তাঁকে খণ্ডানন্দ ব'লে ভোগ করতে থাকি। এই খণ্ডানন্দ অবলম্বন ক'রে পুনঃ পুনঃ যদি 'সর্ব্বানন্দে' গিয়ে পড়তে পারি, তা হ'লেই 'একার্ণবে' গিয়ে পড়া যায়।

এই 'সর্ব্বানন্দ' ও 'একার্ণবে' তফাৎ কি? যা-কিছু প্রকাশ হচ্ছে, তাতে যে আনন্দ ভোগী, এই জায়গাটায় তোমাকে বিশেষ ভাবে

চোখ দিতে হবে। সুখ, দুঃখ—সবই ভোগ, অতএব তৃপ্তি। দুঃখকে দুঃখ ব'লে মনে হ'লেও সেটা একটা ভোগ তো বটেই; সাময়িক ভাবে সেটাও তৃপ্তি—অতৃপ্তি হ'লেও সেটাকে তৃপ্তি ব'লেই নিতে হবে। এই যে সুখ-দুঃখ প্রকাশ হচ্ছে, তাতে তুমি দেখ্‌ছ যেন এই প্রাপ্তিগুলি একটা জায়গায় বিশেষ ভাবে পড়ে থাকে। কিন্তু তোমার চেতনাই যে এইরূপে প্রকাশিত হচ্ছে—স্থূলমূর্ত্তি নিচ্ছে—সেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না। এই যে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত তুমি 'শরীর' ব'লে দেখ, এই স্থূল দৃশ্যটি তোমার চেতনাই যে হয়েছে, এটি দেখার অভাবে প্রজ্ঞাই যে বল, শক্তি, বীর্য্য বা প্রকাশ, এ কথাটা তুমি নিতে পারছ না। তুমি খালি 'ভোগ' অংশটা দেখে চলে গেলে, এই জন্য প্রজ্ঞা যে প্রাণ—ভোগ, একথাটুকু গ্রহণ করতে পারলে না। একটা জিনিষ তোমার চমৎকার লাগল; এর সঙ্গেই তোমায় নিতে হবে 'এটি একটি বোধ', এবং এই বোধ নিজেই ওই স্থূল চেহারাটি ধরলে। এটি যদি চোখে, মুখে কানে ফুটাতে পার তো দেখতে পাবে, বোধ প্রবাহ মানেই স্থূলশক্তি প্রবাহ। বলপ্রবাহ ঠিকভাবে ব্যবহার না করলে ওরই নাম হয় 'অসুর'। আর ঠিকভাবে ব্যবহার করলে ও-ই হয় মায়ের দাঁড়াবার ভূমি।

ওই যে অসুর—"জ্যেষ্ঠ", তাকে তোমার মনে হচ্ছে, ওটা মরে গেলে বেশ হয়; কিন্তু এ যে কত বড় 'বল' তা' তুমি দেখতে পাচ্ছ না। যেখানে মা অসুর মারছেন, সেখানে মায়ের এই মহতী লীলার প্রাধান্য নয়; ক্ষুদ্রত্বের কাছেই এর প্রাধান্য মনে হ'তে পারে। এই লীলার সারবত্তা হচ্ছে এই স্থূলস্বরূপ পরিণতিতে। এই ভূমিটি না পেলে, তোমার নিজের আত্মত্বের যে কত বল তা' ধরতে পারবে না। যাকে 'আমি' —'আমি' ক'রে ধরে আছ, এই খোলসটা চেখে দেখত, এটা কী

বিজ্ঞান সম্মত! একান্ত স্থূলতায়—একান্ত 'অস্তি' বা অস্মিতায় পর্য্যবসিত যে এই খোলসটি, এর গভীরতা কত বেশী! এই গভীরতাকে যদি অবলম্বন করতে না পার—এ যে কত বড় বল তা' যদি দেখতে না পাও—তবে তোমার ভগবান—তোমার গুরু পড়ে থাকবে মাত্র একটা illumination (জ্যোতি) হ'য়ে! এই illuminationএ খাপ খাওয়াবার জন্য ভগবানকে দেখতে হয় দু'দিক থেকে। যে চিন্ময়ী সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম—আকাশ বা মনের চেয়েও সূক্ষ্ম, তাঁকেই আবার দেখতে হবে স্থূলাদপি স্থূল—শরীরের চেয়েও স্থূল—পাথরের চেয়েও স্থূল। এই বোধ যতই ঘন হ'তে থাকবে ততই ভগবান তোমার চোখে কানে, নাকে, মুখে, পর্য্যন্ত ফুটতে থাকবে। এইরূপে যতক্ষণ না তিনি চোখে মুখে আসেন, ততক্ষণ তোমার ভগবৎ ধারণা কাঁচা থাকবে—অপরিপক্ক থাকবে।

ভগবৎ লাভের দুই পন্থা

এই জন্য ঋষি ভগবৎলাভের দু'টা রাস্তা দেখিয়েছেন। তাঁকে দেখতে হবে। (১) সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মরূপে, (২) আবার স্থূলাদপি স্থূলরূপে। প্রথম রাস্তাটির কথা বলেছেন—ভগবান যে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, এদিকে যাওয়া যায় বড্ড কষ্টে; সুতরাং এটিকে টেনে ফেলে দাও, আর অন্য পথটি ধর। এই কারণে ঋষি উপনিষদে ঈশিত্বের প্রাধান্য দেখিয়েছেন; আর বলেছেন, ঈশিত্বের সাধনা কঠিন নয়। ভগবানকে তোমায় পেতে হবে একান্ত স্থূলরূপে; আর এ ভাবে পেলেই তুমি তাঁকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে তাঁর সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অস্তিত্বের সঙ্গে। তখন অসুরত্ব থেকে পরমাত্মত্ব পর্য্যন্ত—সব একসা হ'য়ে যাবে। পাছে 'কুমার' হ'তে গিয়ে আম খাওয়া হ'লে আবার কাঁটাল খাওয়ার কথা এসে যায়, এই জন্য পরবর্ত্তী ক্ষেত্রটি এই ভাবে ধরিয়ে দিলাম!

ভগবানকে পূর্ণমাত্রায় পেতে হবে বৈচিত্র্যে, আবার পূর্ণমাত্রায় পেতে হ'বে নির্ব্বিশেষ স্বরূপে।

এত যে ভগবান্ খাচ্ছ তবু গায়ে তেজ হ'ল না! একটা ভগবান্ ব'সে রয়েছে, তাকে ডাকলাম বা ডাকলাম না—কথাটা এমন নয়। ভগবান্ খাচ্ছ ভগবান্ দেখছ, ভগবান্ গায়ে মাখছ —ছু'বার ডাকা নেই বা হ'ল, এটা দেখছ না কেন? ভোগ করা মানেই ডাকা। ভাত খেলে, ডাল খেলে, আর পোলাও কালিয়া খেলে—এ সব তো ভোগই করলে? তার মানেই ভগবানকে ডাকলে—পেলে। বল, প্রাণ, প্রজ্ঞা—এ সব যে 'সমবায়ী' জিনিষ, এটিতে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি জান যে 'প্রজ্ঞাপ্রকাশ' মানেই 'বলপ্রকাশ', আর যদি কোঁথ্ না পেরে ভগবান্ বলতে পার, তবে দেখবে ভগবৎ ধারণা করলেই ভগবান্ ফুটে উঠছে! 'ফুটে উঠা' মানেই সত্যি সত্যি আবির্ভূত হওয়া।

ঐ সব আলাদা আলাদা ক'রে রাখার ফলেই হচ্ছে যত গণ্ডগোল! এতেই তোমাদের হয়েছে আত্মানাত্ম জ্ঞান—এতেই পড়ে গেছ ভেদজ্ঞানে। এইরূপ আলাদা করার ফলে এই হয় যে, এপাশে যখন সমীকরণ হচ্ছে—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন সব এক হ'য়ে যাচ্ছে—ওপাশে তখন জীবভাবে দেখা হচ্ছে, যেন দ্রষ্টাই আলাদা আর একজনকে দেখছে—তার মানে জীব ভগবান থেকে আলাদা হ'য়ে যাচ্ছে। এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত করার method (প্রণালী) হ'ল যিনি দ্রষ্টা, তিনিই দর্শন এবং তিনিই দৃশ্য—এই ভাবে এই তিনটিকে একসা করা—যিনি জগদীশ্বরী, তিনিই সমগ্র জগৎশক্তি, এবং তিনিই সাক্ষাৎ জগন্মূর্ত্তি—এই ভাবে নেওয়া। ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ—এই তিনের সংযোগ করতে পারলে তবে 'চামুণ্ডার' দর্শন হয়।

—শ্রীগুরুবাণী, রবিবার, ২৫-৫-১৯৪১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশ্বপ্রকাশে অসুরত্বের স্থান

[**চুম্বক** :—যিনি নির্লেপ, অথচ যাঁ থেকে বিশ্ব প্রকাশিত হয়, তাঁর নাম রুদ্র। স্বসম্বেদিত হ'লে তাঁকে আত্মবোধ বলা হয়; অন্যথা তিনি অনির্ব্বচনীয়, বিশ্বপ্রকাশে তাঁর শক্তি হয় বজ্র, রূপ হয় বাক্, বৃত্তি হয় বহ্নি, এবং রস হয় বেদ। সাধকের প্রাপ্তব্য এই সকল ধর্ম্ম। রুদ্রকে প্রত্যক্ষ করতে হ'লে, বহিরাকাশ, অন্তরীক্ষাকাশ ও দহরাকাশ—এই ত্রিবিধ আকাশ ভেদ করতে হয়।

প্রথম আকাশটি ভেদে হয় প্রকৃতি মুক্তি। প্রকৃতির মূর্ত্তি হ'ল তামসী মূর্ত্তি। জ্ঞানমূর্ত্তির আবির্ভাবের পূর্ব্বে হয় তামসী মূর্ত্তি দর্শন; এবং জ্ঞানমূর্ত্তি বা ঋকের আবির্ভাবে (বা গৃহপতি অগ্নি প্রজ্জ্বলনে) বা বিষ্ণুর জাগরণে এই তামসী মূর্ত্তির নিধন হয়। চণ্ডীর প্রথম চরিতে এরই নাম মধুকৈটভ বধ। এই তমো ভাব থেকে বেদ ধারায় যে আত্মবোধময় পুরুষ জাগ্রত হয়, চণ্ডীর মধ্যম চরিতে উক্ত তারই নাম মহিষাসুর। এই হ'ল যজুর্ব্বেদোক্ত (দক্ষিণাগ্নি বা) রাগমূর্ত্তি। মহিষাসুরের সহিত যজুর্ব্বেদরূপিণী দুর্গার সংগ্রাম বর্ণনা। এই সংগ্রামে উভয়েরই সোম পান কিরূপে হয়। চণ্ডীর উত্তর চরিতে আত্মানাত্মভেদজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ শুম্ভের সহিত দেবীর প্রথমে অস্ত্রযুদ্ধ এবং পরে বাহুযুদ্ধের মর্ম্ম। শুম্ভ বধ মানে কি, এবং তদ্দারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কিরূপে হয়। বেদে এরই নাম আহবনীয় অগ্নি প্রজ্জ্বলন এবং সামের বা উদ্গীথের গতিলাভ।

চণ্ডী পাঠের সার্থকতা কখন হয়। সরস্বতী ক্ষেত্রের ধর্ম্ম কিরূপ। মহিষাসুরকে দেবীর বর প্রদান : দেবী পূজার সহিত মহিষের ত্রিকালব্যাপী সংযুক্ততা। উগ্রচণ্ডা, দশভূজা (দুর্গা) ও ভদ্রকালী—দেবীর এই ত্রিমূর্ত্তির বর্ণনা। উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তির পূজা কিরূপে সার্থক হয়। দেবীর চরণে মহিষের ত্রিকালব্যাপী সংলগ্নতা দ্বারা তার অনন্ত জীবন লাভ।]

রুদ্র ও বিশ্বরূপে তৎমহিমা প্রকাশ

নমঃ শিবায়। যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্, তস্মৈ রুদ্রায় নমঃ।

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্, তস্মৈ শ্রীশিবায় নমঃ। নমঃ শ্রীগুরবে।

'রুদ্র' কাকে বলে? যা থেকে অহর্নিশ সমগ্র জ্ঞানবিশ্ব দ্রুত প্রকাশ হচ্ছে। 'জ্ঞানবিশ্ব' বলা ঠিক হ'ল না; কেন না 'বিশ্ব' বললেই 'জ্ঞানবিশ্ব' বুঝায়। তোমাদের জ্ঞান ও বিশ্ববোধ উভয়ই আছে ব'লে বললাম জ্ঞানবিশ্ব। যা থেকে অনন্ত বিশ্ব—জ্ঞানময় বিশ্ব—আত্মময় বিশ্ব—আত্মার বহুধাকৃত বিশ্ব অনর্গল প্রকাশিত হচ্ছে, অথচ এই প্রকাশ হ'লেও যিনি যেমন তেমনই আছেন এবং সেই যেমন-তেমনটি কি তা' জানিনা—এমন যে দেবতা তাঁর নাম 'রুদ্র'। যে মুহূর্ত্তে তিনি কে, তিনি কি, তিনি কেমন, এই সব কথা জানতে চাই, সেই মুহূর্ত্তের নাম হ'য়ে যায় 'আত্মবোধি'; এবং যখনই 'স্বসমম্বেদন' করতে যাই—আপনাকে আপনি জানতে যাই—তখন হ'য়ে যাই, 'আত্মবোধময়'। আর সেরূপ না করলে হই 'অনাত্মবোধময়'। আর যেখানে তিনি 'স্বসম্বেদন' ও করেন না, অথচ জানতে চাই তিনি কেমন, সেখানকার সম্বন্ধে বলতে হয়, "তুমি কেমন তা' আমি জানিনা, তুমি যে-ই হও তোমাকে নমস্কার।" "যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ"।

এই যে বিশ্ব প্রকাশ, এর যে প্রকাশভাব বা শক্তিভাব, তার নাম **'বজ্র'**; এর যে রূপভাব, তার নাম **'বাক্'**; এর যে বৃত্তিভাব, তার নাম **'সূর্য্য'—'সোম'—বহ্নি**; এর যে রসভাব, তার নাম **'জাতবেদা'**; আর এর যে প্রাপ্তিভাব, তার নাম **'আত্মবোধ'**। এইরূপে ইনি বিশ্ব প্রকাশ ক'রেও নিজে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত, এইরূপ ভাবে বিরাজ করেন। 'মা' বলতে গেলে সাধককে চোখ তুলতে হবে সেখানে যেখান থেকে দেখা যাবে, এ বিশ্ব-

প্রকাশের যে কোন কণা ধরতে গেলেই বা জানতে গেলেই বা পেতে গেলে ঐ জিনিষগুলি পাওয়া যাবে; অর্থাৎ শক্তিভাবে বজ্রত্ব, জ্যোতির্ভাবে বাকত্ব, ইত্যাদি—এ সব জলে উঠবে। যেখানে আছে বিশ্বপ্রকাশ, সেখানেই আছে রুদ্রত্ব, সেখানেই আছে বহ্নিত্ব, সেখানেই আছে আত্মত্ব, ইত্যাদি—ইত্যাদি। এগুলি চেষ্টা ক'রে পাবার জিনিষ নয়। গুরু বললেই এ সব পাওয়া আপনা হতেই হবে। কারণ ওখানকার স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম হ'ল ওই। এ না হ'লে বুঝতে হবে, রুদ্র দেবতার শরণ নেওয়া হচ্ছে না।

এঁর উপাসনা করতে হ'লে বা এঁর মহিমা বুকে তুলে নিতে হ'লে এঁর ভিতর কত রূপ, কত গতি, কত প্রকাশ খালি দেখ ও তাতে বিভোর হও। যাঁর কাছে অন্বেষণ নেই, কোন হিসাব নেই, যিনি খালি সমগ্র মহিমা বিস্তারের রসহিল্লোলে ভরপুর হ'য়ে রয়েছেন—যাঁতে কত রস, কত বেদন, কত নিজস্ব—কোনটার দিকে চোখ ফিরালেই যিনি দেখেন সেটা নিজেতে গ্রথিত হ'য়ে যাচ্ছে, এরূপ অপূর্ব্ব রুদ্ররূপের যে সেবক, তারই নাম 'কাত্যায়ন' (কতি+অয়ন) ঋষি।

যাঁর মূর্ত্তি হ'ল বাক্, শক্তি হ'ল বজ্র, রস হ'ল বেদ, প্রাপ্তি হ'ল আত্মবোধ—এইরূপে যিনি পূর্ণ প্রত্যক্ষতায় ভরে রয়েছেন, এই আমার দেবতা। সুতরাং রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে, মনে, প্রাণে ইনি একেবারে ভরপুর। তাঁর কাছে অতীত ব'লে কোন জিনিষ লক্ষিত হচ্ছে না, ভবিষ্যৎ ব'লে কিছু লক্ষিত হচ্ছে না, সবই omnipresence—চিরপ্রত্যক্ষতাময়—চিরবিদ্যমানতাময়। সর্ব্বতঃ প্রত্যক্ষ যিনি, তিনি দেশ, কাল, ধর্ম্ম এসবের দ্বারা খণ্ডিত নন। জল দিয়ে সাঁতার কেটে কেটে যদি যাও, তখন যেমন খালি জলই পাও—তেমনি সর্ব্বতঃ প্রত্যক্ষতাকে দেখতে দেখতে যদি নিজেকে চালাতে পার, তবে পৌঁছাতে পারবে এই

দেবতার কাছে। জলের পর ডাঙ্গা, তার পর আবার জল, আবার ডাঙ্গা—এই ভাবে যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ এই দেবতার কিছু সন্ধান পেয়েছ ব'লে মনে হবে না। চিরপ্রত্যক্ষতা হ'ল এই দেবতার উপাসনার একটি ভূমি। এটিতে উঠতে যে, যে গ্রন্থি ভেদ করতে হয়, অর্থাৎ যে যে রকম সাধনার প্রবর্ত্তন করতে হয়, তাকে বিভাগ ক'রে দেখতে গেলে তিন রকম জিনিষ দেখতে পাই—তিন রকম আকাশ আমাদের কাছে ফু'টে উঠে: (১) প্রথম যে আকাশটি ফুটে, সেটা 'বহিরাকাশ' এবং তাতে জগৎ সম্ভূত হ'য়ে রয়েছে; (২) দ্বিতীয়তঃ যে আকাশ ফুটে, সেটা অন্তরাকাশ এবং সেটাই অন্তরীক্ষ; (৩) তার পর আরও একটা যে আকাশ ফুটে, সেটা হ'ল 'দহরাকাশ'; সেটা হ'ল একটা গভীর আকাশ—আত্মবোধ থেকে যেটার আরম্ভ ও তার প্রাপ্তিতে যার শেষ। এই তিনটে জায়গায় যদি কেউ উঠতে পারে, তারই নাম হয় 'মুক্তপুরুষ'।

চণ্ডীর প্রথম চরিত—গার্হপত্য অগ্নিপ্রজ্বলন ও মধুকৈটভ বধ

প্রথম বিভাগটিতে 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি' এই দ্বিত্ববোধ মুক্তিপথের একটি অন্তরায় ব'লে প্রতীত হয়। জগৎবোধ যে একটা অচেতন বোধ, এটা থেকে পার পেতে হবে। এই জন্য প্রথম মুক্তিটির নাম দেওয়া হ'য়েছে **'প্রকৃতি মুক্তি'**। এই মুক্তির জন্য যে পুরুষ সাধক হ'তে চলেছে—ভগবানে ফিরতে যাচ্ছে—তার পক্ষে ভগবানকে পেতে যাওয়া মানে হয়—যে প্রণালীতে ভগবান বিশ্বরচনা করেছেন, সেই প্রণালীতে যেতে হবে। তিনি বিশ্বরচনা করতে জেগেছেন সঙ্কল্পময় হ'য়ে। সে জাগরণে তিনি দেখছেন আপনার এক অপূর্ব্ব তামসীমূর্ত্তি—তমোময়মূর্ত্তি, যার সবই একেবারে পূর্ণমাত্রায় negatived বা 'নাস্তি'। তিনি সেই ভূমির ভিতর তখন ক্ষুব্ধ হলেন, এবং অমনি এক প্রার্থনা এল। তত্ত্বজ্ঞানে

যাকে 'ঈক্ষণ', 'কামনা'—এ সব বলি, দ্বিতীয়জ্ঞানে তাকেই 'প্রার্থনা' বলি। তিনি আপনারই কাছে আপনি প্রার্থী হ'লেন—"এই যে ঘোর তমোমূর্ত্তি- এটা ভেঙ্গে যাক্—বিলুপ্ত হ'য়ে যাক্, আর বোধময় মূর্ত্তি জেগে উঠুক; আর অচেতন বিশ্ব থেকে কাজ নেই. এখন চিন্ময় বিশ্ব দর্শন হোক"। এই যে তমোবোধের মূর্ত্তি, এও বোধস্বরূপ দেবতারই মূর্ত্তি—একথা বলাও যা, "এই যে তমোমূর্ত্তিতে রয়েছি, বোধস্বরূপ যে আমি, এও আমারই মূর্ত্তি"—একথা বলা ও তাই। এইটি দেখা, এরই নাম হ'ল বোধময় ক'রে তোলা বা বোধময় হ'য়ে পড়া। এই হ'ল প্রথম ক্ষেপ—এই হ'ল প্রথম বেদ স্থাপন; এই হ'ল 'অথর্ব্ব' থেকে 'ঋক্' নামীয় বেদের উদ্‌গমন। 'অথর্ব্ব' হ'ল অঙ্গার স্বরূপ, যেখানে সব negatived হ'য়ে গিয়েছে, অথচ নিজেই নিজেকে নিয়ে স্তব্ধ ক'রে রেখেছেন। এই হ'ল আত্মত্বের প্রবোধন—নিজেই বিশ্বমূর্ত্তি—নিজেই সব। এই বোধে উঠবার জন্য ঋষি বললেন, "এই যে অঙ্গারবৎ তামসীভূমি ওতে ঋক অগ্নি প্রজ্বলন কর"।

এই প্রণালীটাকে চণ্ডীতে 'মধুকৈটভ বধ' ব'লে বর্ণনা করা হ'য়েছে। এই যে জ্ঞান—এই যে বোধ, তোমাকেও এদিক দিয়েই যেতে হবে। তুমি এর ভিতর দিয়ে এ জ্ঞানটাকে জমি ক'রে নিলে। জ্ঞানময় বিশ্ব—আত্মময় বিশ্ব, এ ভাবে তোমায় বোধটাকে দেখে নিতে হবে—একে পাকা ক'রে নিতে হবে। জ্ঞানময় বিশ্ব বা আত্মময় বিশ্ব, একথা বললেই বিশ্ব জ্ঞানময় বা আত্মময় হয় না; কিন্তু এতে তোমার জ্ঞানের সূচনা হয়। এটাকেই ফুটিয়ে তুলতে হ'বে; তোমাকে এখানে ফিরে আসতে হ'বে তোমার সর্ব্বস্ব নিয়ে। অঙ্গারের ভিতর অগ্নি জেলে দিলে অঙ্গারটা যেমন দীপ্তিময় হ'য়ে যায়, ঠিক তেমনি ঐ তামসীভূমিকে অগ্নিময় করতে হবে অর্থাৎ তোমাকে অঙ্গিরা ঋষি হ'তে হবে। জীবত্বে

যাদের অভিমান, তারা তা' পারবে না। তাদের ঐ থেকে আহবনীয় অগ্নি চয়ন করতে হবে।

চণ্ডীর মধ্যম চরিত—দক্ষিণাগ্নি প্রজ্বলন ও মহিষাসুর বধ

তুমি জগতে সেবন করছ খালি অঙ্গারগুলাকে। যদিও এই অঙ্গার হ'য়েছে সেই আগুন জ্বলেই, তত্রাচ তুমি ভোগ করছ ঐ অঙ্গার, ধূম ও ধূলি। তোমার লক্ষ্য রাখতে হবে ঐ আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানে বা আহবনীয় অগ্নি চয়নে। এই যে জীবন—এইটুকুনই কি অঙ্গার থাকুবে? একে অগ্নিতে সংন্যস্ত করবার জন্য তোমাকে দৃষ্টি দিতে হবে। সেই যে চেষ্টা, সেই যে আকুলি-বিকুলি, সেটাকে অগ্নির ভিতর যে রস আছে—অঙ্গারের ভিতরও যে প্রাণ ও উষ্মা আছে, তাদ্বারা পরিপ্লুত দেখতে হবে। সে রস হ'ল 'বেদ'—এ প্রাণটা। দেখে নিলে এটা হয় একটা বেদগতির খেলা—এই সমগ্রটা। তখন সেই যে প্রচেষ্টা, তাতে দেখতে পাই কি?—এ পাশে এই তামসী ভূমি থেকে আগুন উঠছে এবং ওপাশে সেই আহবনীয় অগ্নিতে গিয়ে সংযুক্ত হচ্ছে। এই বেদগতিটি—পরম দেবতার এই রসময় ভঙ্গিমাটি যখন দেখছ তখন তাতে পেলে একটি তামসীমূর্ত্তি। এই তামসীমূর্ত্তি থেকে বেদধারায় অগ্নি জ্বেলে এক আত্মবোধময় পুরুষ মাথা বাড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করছে—আহবনীয় অগ্নির দিকে লক্ষ্য রেখে। এই যে ছবিখানা এ তোমারই ছবি—গোড়া থেকে ডগ পর্য্যন্ত। এই পুরুষ হ'লে তুমি—'**মহিষ**'। একে শুধু 'মহিষ' বললে হবে না;—এ ঋত্বিক, এ পুরোহিত, এ আজ যজ্ঞে ব্যাপৃত। ছিলে মোষ—খালি মহিষত্ব দেখছিলে; আজ চোখ প'ড়ে গেল আত্মতত্ত্ববিজ্ঞানে! আমি করছি কি? আজ যে আমি যজ্ঞে ব্যাপৃত! কি যজ্ঞ?—'আহবনীয়'। আমি মহিষত্ব ভুলে আত্মত্বকে নিয়ে যাচ্ছি আহবনীয়ের দিকে। আর এই আহবনীয় আমার

মহিষত্ব ভেদ ক'রে আত্মবোধে এগিয়ে চলেছে! আমার পুরোহিত আমায় নিয়ে যাচ্ছে। পাছে আবার মহিষত্বে পড়ি, তাই এক মহতী 'সিংহী' আমার দক্ষিণ অগ্নিকে সংহত ক'রে ধ'রে রেখেছে। পাছে আবার আমার দক্ষিণ গতি বামাবর্ত্তে ফেরে অর্থাৎ আমি জগতের দিকে ঝুঁলে পড়ি; এই জন্যে যজুঃরূপিণী মা 'সিংহী' হ'য়ে আমার দক্ষিণ বাহুকে কাম্‌ড়ে তুলে রেখে দিয়েছেন। এ প্রাণে যদি কিছু রসবিলাস থাকে, তার আছে এক দেবী—সে আমার 'আহবনীয়'! এ আমার বরণীয়—আমার প্রাপনীয়—আমার অজানা, অদেখা, অথচ কোন সূত্রে আমার সকল আদরের অধিকারিণী! সেখানে যাবার জন্যে মাথা তুলে ধরেছি; কিন্তু আমার হৃদ্‌গ্রন্থি দিগ্‌দিগন্তে লাফালাফি করে মহিষ হবার জন্য। তাই পাছে আবার ঘাড় ভেঙ্গে পড়ি—আবার শুভঙ্করী মায়ের দিক থেকে ফিরি, সে জন্য সেই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ ক'রে 'হৃদি-শূলেন উদ্ভিন্ন' মহিষকে মায়ের দিকে ঠায় চোখ রাখতে দিয়েছেন। এইরূপে উদ্ভিন্ন হওয়ার দরুণ আমার আধ-খানা (আত্মবোধ) বেরিয়েছে, আর আধখানা এখনও মোষই আছে। আধখানা মাত্র জলে উঠেছে—জীবের যে আত্মবোধ, সেটি জেগেছে, আর এ চেহারা ধরেছে। এ হ'ল আমার 'মধ্যমূর্ত্তি'। এ মূর্ত্তিতে যখন নিজেকে দেখি, তখনই দেখতে পাই আমি, আমার বিশ্ব এবং 'মা' একই সূত্রে গাঁথা। এইটা দেখা হ'ল 'রাগমুক্তি'। এ আমার কল্পনা নয়—যজুর্ব্বেদরূপিনী মা স্বয়ং বলেছেন এই অর্থ, "মহিষাঃ বৈ ঋত্বিজঃ"—এই হ'ল বেদের ভাষা। তুমি যখন "মা—মা" ব'লে—একটা বেদনে, একটা ব্যথায়, একটা অভাববোধে, চীৎকার কর তুমি যখন সেটার দিকে ছুট, তখন তুমি জাননি—তুমি দেখনি, এই যে ব্যথাময় বা অভাবময় তুমি, সে 'তুমিই' তোমারই পুরোহিত—তোমারই 'ঋত্বিক' হয়েছে,

তোমাকে বেদনময় করছে—তোমার আত্মত্বকে তন্ময় করছে, যেন "বড় দুঃখ, পরিত্রাণ চাই"—আর তোমারই দুর্গোৎসব সম্পাদন করছে। এই 'পরিত্রাণ' মানেই যে দুর্গা একথাটা তুমি জাননি; কাজেই তোমার মুখ দিয়ে 'পরিত্রাণ' বেরুচ্ছে—'দুর্গা' বেরুচ্ছে না। তোমার বোধে যে প্রতিসংঘাত—মহিষত্বের যে দুর্দ্দম নর্ত্তন—সেই তোমার যজ্ঞ করবার 'ঋত্বিক'। গুরু কৃপায় তুমি যদি জ্ঞান পেয়ে থাক তো দেখবে "আমিই 'ঋত্বিক', আমিই পুরোহিত—আমিই যজমান"।

এই মহিষ—আধখানা আত্মবোধ আর আধখানা মোষ—"শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ" (চণ্ডী—২।৩।২৫); দু'টা শিং দিয়ে পর্ব্বতগুলা তুলে তুলে মায়ের গায়ে ছুড়ছে অর্থাৎ পর্ব্বে পর্ব্বে বাকে বাঁকে পর্ব্বতগুলাকে ভেদ ক'রে মাকে মারছে। 'শৃঙ্গাভ্যাম্' মানে হ'ল 'আত্মানাত্মবোধাভ্যাম্' অর্থাৎ আত্মানাত্মরূপ দ্বৈত বোধ দ্বারা।

এই হ'ল মহিষাসুরের সহিত মায়ের যুদ্ধ। তখন আছে দুজন, যদি ও তত্ত্বতঃ একজনই। "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাপ্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে"—(কঠ-১।৩।১)। দুজনেই মধুপায়ী; এদিক থেকে মোষ, আর ওদিক থেকে আহবনীয়। বেদগুহায় দুজনেই ঢুকে পড়েছে। মা বলছেন "গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্,"—(চণ্ডী ২।৩।৩৮)। মা তো মধু খাচ্ছেনই, আমিও (মহিষাসুর ও) খাচ্ছি। আধখানা আত্মবোধ মাত্র জেগেছে, বুকে শূলবেঁধা, আর চোখ ফেরাবার যো নেই, ডান হাত সিংহের মুখে, ঠ্যাং দুটা মোষের পেটেই আছে—এ ভাবে যদি দুর্গাপূজা করতে পার, তবে মা সাক্ষাৎ "বরং বৃণু" ব'লে উঠবেন। এই হ'ল 'রাগমুক্তি'।

তখন দেখলাম এ তো মায়েতে আমাতে যুক্ত হওয়া! "আমি বিশ্বময়—বেদময়"—এই বেদময় আলোতে ভর্ত্তি হ'য়ে গেলাম। চাঁদ, সূর্য্য ও অগ্নি জ্বলে উঠল, যমের কাছ থেকে অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নির কাছ থেকে অগ্নিবিদ্যালাভ হ'ল। তারপর যেখানে নিজের—নিজত্বের—ছায়াটি পর্য্যন্ত উঠে, ওখানটাও আর রাখব না। যেখানে রুদ্রাণী মা, সেখানটায় যেতে হবে; ওখানটায় ভর্ত্তি হ'য়ে যেতে হবে 'আহবনীয় অগ্নি'তে। এখন এ আত্মা, এ অনাত্মা, এই যে ভেদ, এটা ওখানে ঘুচাতে হবে। এই ভেদ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তার নাম 'প্রকৃতি-পুরুষ' ভেদ জ্ঞান।

চণ্ডীর উত্তর চরিত—আবহনীয় অগ্নি প্রজ্বলন ও শুম্ভবধ

ঋষি তাই তৃতীয় চরিতে দেখাচ্ছেন, কি ভাবে এই ভেদজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ (বা অস্মিতারূপ অসুর) অবশেষে মাকে পেলে। যখন শুম্ভের সবই মরে গেল, তখন 'শুম্ভ' বলছে, "দেবি, তুমি কিসের গরব করছ? মেলা কয়জনে মিলে আমার ভাইটাকে (নিশুম্ভকে) মেরে ফেলেছ—প্রকৃতি বোধটাকে খুন করেছ! আচ্ছা ঠিক, এখন ও আছে 'আত্মবোধ'—আত্মবোধরূপে আমি বেচে আছি। এর সঙ্গে একা হ'য়ে লড় দেখি! এখন আমিও যেমন একা, তুমিও তেমনি একা হ'য়ে লড়, তবেই না বুঝব তোমার বাহাদুরি! দেবী বললেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়:"॥ (চণ্ডী-৩।১০।৫)

"বৎস! আমি একাই; এই দেখ আমাতেই সব বিভূতি মিশে গেল! এবার আমার সঙ্গে লড়াই কর"। তখন শুম্ভ দু'ঘা অস্ত্র মেরে দেখলে মায়ের গায়ে তা' পৌছায় না; যে অস্ত্রই ফেলছে, সে অস্ত্র চুর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। তখন সে অস্ত্র সব ফেলে দিলে, বা

দেবীর শরাঘাতে তার অস্ত্র সব খসে পড়ল। তখন সে দেবীর সহিত বাহুযুদ্ধ জুড়ে দিলে—দুজনেই দুজনকে ধরেছে! শুম্ভ দেবীকে বুকে ক'রে আকাশে উড়ে চলে গেল। তখন দেবী নিরাধারা হ'য়েই যুদ্ধ করতে লাগলেন; কেন না ব্রহ্ম যে নিরাধার—তাঁর কোন আধার নেই। শুম্ভ মনে করেছিল দেবীকে শূন্যে নিয়ে গেলেই ওঁকে খুন করা সহজ হবে। কিন্তু সে তো জানে না যে, উনি নিরাধারা—ওঁর আধারের দরকার হয় না, বরং উনিই সকলের আধার। আকাশে তুলে নিয়ে যাওয়া মানে এও হয় যে, "এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে দ্বিতীয়তা বোধের লেশ মাত্র থাকবার যো নেই"। কেন না, মা বলেছেন, "যতক্ষণ দ্বিতীয়তার স্থান থাকবে, ততক্ষণ আমি প্রসব করি না"। তখন শুম্ভ দেবীর বুকে মুষ্টিবদ্ধ ক'রে এক ঘুষি মেরে দিলে; আর দেবী তাকে মারলেন এক চপেটাঘাত। শুম্ভ সমগ্র আঙুল গুড়িয়ে মারলে মুষ্টি বা ঘুষি, আর মা আঙুলগুলো ছড়িয়ে মারলেন চপেটাঘাত বা চড়। শুম্ভ চেষ্টা করছে মুষ্টিবদ্ধ ক'রে—পঞ্চতন্মাত্রাকে একত্র ক'রে—মায়ের দিকে ছুঁড়ে মারতে, আর অমনি মা পঞ্চতন্মাত্রাকে ফাঁক ক'রে তার দিকে ধরেছেন ছড়িয়ে। সাধনা করতে গিয়ে আমরাও তাই দেখি। আমরা যখন সমগ্র জ্ঞানকে জড় ক'রে 'স্বাহা' বলতে যাই, তখন দেখি দেবী মারছেন একচড়—আর তাঁর পাঁচটি আঙুলের দাগে সব ফুটে উঠে পঞ্চতন্মাত্রার আকারে। আমরা মনে করি, সবটাই 'স্বাহা' করলাম—সমর্পণ করলাম; কিন্তু যেই চপেটাঘাত খেলাম, সব ফাঁক হ'য়ে গেল। তুমি আত্মজ্ঞানে উঠতে গেলে, সব সমর্পণ ক'রলে কিন্তু পরক্ষণেই আবার সব ফুটে উঠছে। এই হ'ল ঘুষি ও চড়ের লড়াই।

এমনি ভাবে উভয়ের ঘুষি আর চড়ের লড়াই হওয়ার পর দেবী শুম্ভের ঠ্যাং দু'টো ধরে ওকে আকাশময় পরিভ্রমণ করিয়ে জগতে

নিক্ষেপ ক'রে ফেলে দিলেন। পা দু'টা ধরার মানে এই—দেবী তো নিরাধারা আছেনই, আবার শুম্ভকেও নিরাধার করতে হবে; ওকেও দেখাতে হবে যে সে নিজেই নিজের আধার। শুম্ভ ওই যে দু'টা পায়ে চলছিল, তার মানে হ'ল যদিও সে আকাশে অর্থাৎ আত্মবোধে উঠেছে, তবুও তার আত্মানাত্মবোধের সংস্কার ভাঙ্গেনি। তখন দেবী কৃপা ক'রে আত্মানাত্মবোধরূপ তার ঠ্যাং দু'টা ধরে বললেন "তোর চলা বন্ধ হ'ল—তোর আর চলবার ক্ষমতা নেই; এবার যে চলে, সে আমি"। শুম্ভকে আকাশময় পরিভ্রমণ করালেন, তার মানে হ'ল—"তুই তো পদহীন, এই দ্যাখ্, চালাই আমিই"। এমনিভাবে মর্ত্ত্যাকাশে, অন্তরীক্ষাকাশে ও উর্দ্ধাকাশে বার কতক ঘুরিয়ে দেবী ওকে ছেড়ে দিলেন। দু'টা ঠ্যাং ধরে ইন্দ্রও তাঁর বাপকে মেরেছেন। তখন হ'য়ে গেল "জগৎ স্বাস্থ্যং" অর্থাৎ জগতের যে জগতত্ত্ব বা গতিময়তা, সে গতিটা 'স্বাস্থ্য লাভ' করলে। স্ব স্বয়ং স্থ গতিঃ তস্য ভাবঃ ইতি 'স্বাস্থ্যঃ' স্বয়ংগতিত্ব, অর্থাৎ জগৎ স্বয়ংগতিত্ব লাভ করলে। দেবী শুম্ভকে (আত্মবোধকে) আকাশময় ঘুরিয়ে এমন এক momentum পাইয়ে দিলেন যে সে হ'য়ে গেল স্বয়ংগতি —"আমিই গতি"। তখন জগৎ স্বাস্থ্য লাভ করল, আর আকাশ তিনটি নির্ম্মল হ'য়ে উঠল।

"ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলঞ্চাভবন্নভঃ॥ চণ্ডী ২।১০।২৮

আর অগ্নিত্রয় শান্ত ভাবে জ্বলতে লাগল।

জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ॥ চণ্ডী ৩।১০।৩২

আহবনীয় অগ্নিপ্রজ্বলনে রুদ্রত্ব লাভ

যখন জীব নিশ্চেষ্ট হ'য়ে গেল—যখন দেখল "এই যে আমি চলি, এতো মা তুমিই চালাও; এর ভিতর আমি ব'লে একটা জিনিষ,

বা প্রচেষ্টা ব'লে একটা জিনিষ কোথাও কিছু নেই, তখন দেখল এই আকাশের যে আবর্ত্তন, অগ্নির যে প্রজ্বলন, সোমের যে বিদ্রাবন —এই সবই ওই মা ! এর ভিতর 'আমি-তুমি'র হিসাব নেই। তখন সে পুরুষ হ'য়ে গেল আকাশচারী বা কাশীবাসী; অর্থাৎ এই আকাশকে চরণ ক'রে সে চলল। আকাশ ওকে চরণ করেছিল, এখন ও আকাশকে চরণ করল। এর মানে হ'ল সে নিরাধার হ'য়ে চলল; অর্থাৎ সে তখন ব্রহ্মত্বে ঢুকল। দেবী নিরাধারা, আবার শুম্ভও নিরাধার হ'ল; অর্থাৎ মা ছাড়া তার আর আধার নেই, এমনি হ'য়ে গেল সে। মহিষের যে মাত্র আধখানা আগে বেরিয়েছিল, এতক্ষণে সেটা পুরোদস্তুর বেরিয়ে গেল। ঋষি প্রথমে বললেন দুজনের কথা; তারপর বললেন একজনের কথা; আর তারপর বললেন নিরাধার তত্ত্বের কথা। এইরূপে তিনি তিনটি স্তর দেখিয়ে দিলেন।

লড়াইয়ের ভঙ্গিমা যা ঋষি এঁকেছেন, তা' দেখিয়ে দিলাম। এটি দেখে চণ্ডীকে কি তোমরা বুঝতে পারলে? এই মাকে দেখিয়েছি বেদ স্বরূপিণী ব'লে। যতক্ষণ না 'সাম' থেকে বেরিয়ে আকাশচারী হ'তে পারবে যতক্ষণ না নিরাধার হ'তে পারবে—ততক্ষণ মাকে লাভ করতে পারবে না। যদি স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে হয়, যদি পরমতত্ত্বকে নিষ্কাষণ ক'রে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মিকা শক্তি পেতে হয়, তবে তা' পাবে তোমার এ ব্যষ্টিতেই। শক্তিময় যে পরমরস রয়েছে, এ তোমাতেই; ভক্তিময় যে রস রয়েছে, এ তোমাতেই। পণ্ডিতেরা ভুল ক'রে একে বস্তু স্বরূপে নিতে যায়। 'বস্তু' মানে 'সত্তাবোধ'। বসতি ইতি বস্তুঃ। বস্তু ততক্ষণই, যতক্ষণ সত্তাবোধের আভাষ খেলে। যার কথা বলছি, তা সত্তাবোধের বাইরে, এবং সত্তাবোধ তা' থেকেই জন্মায়। সে রস খেলিয়ে উঠলে তার প্রধান একটা বোধ হয়

সত্তাবোধ। কাজেই তুমি যতক্ষণ না আপনাকে ঐ রসের গড়ন ছাড়া আর কিছু নয় ব'লে দেখতে পাও, ততক্ষণ তোমাকেও ঐ ভুলে পড়ে থাকতে হবে।

এই তিনটা বেদাগ্নি জ্বাললাম, এ কি তোমার বাইরে?—না। আর এই যে ভাষা প্রয়োগ করলাম, একি তোমাতেই না মায়ে?—মায়ে। এটি তুমি, না মা?—মা এটা যে পরিমাণে ধরতে পারবে, যেরূপ বিজ্ঞান দিচ্ছি, সেটা সেই পরিমাণে তোমাতে effectively (ফলপ্রদরূপে) ক্রিয়া করতে থাকবে। আমি আপনারই আশ্রিত, আমি শুধু আপনারই—এই বোধে যখন জাগ্রত হবে, আর যখন নিজেই থাকবে আর কেউ নয়, তখন ঐ রুদ্রের মত রূপ ক্ষেপ করতে পারবে, এবং 'রুদ্রাশ্ব' বা কাত্যায়ন ঋষির শিষ্য হবে।

চণ্ডীপাঠের সার্থকতা

আর একটা কথা বলি। এই যে 'চণ্ডী' ইনি হ'চ্ছেন 'বাঙ্ময়ী'। তোমার চণ্ডী পাঠের সার্থকতা তখনই হবে, যখন চণ্ডীকে বাঙ্ময়ী (বা মন্ত্রময়ী) ব'লে পাঠ করতে পারবে। এই পাঠ শোনাটার শ্রুতিধর হ'লে তুমিই। এইবার চণ্ডীপাঠ করলে তোমার চণ্ডীপাঠ ফলপ্রদ হবে। কেন না, এইরূপ জ্ঞানের পর বাক্যরাশি হ'য়ে যায় 'মন্ত্র'। চণ্ডীর শ্লোকগুলা শ্লোক নয়—'মন্ত্র'।

ঋষির বলবার ভঙ্গিমাটি একবার দেখ। শুম্ভ মারলে ঘুষি, আর দেবী মারলেন চড়। ঋষির কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! এই চিন্ময়ীর গতিটি কী স্পষ্ট ক'রে ধরে দিয়েছেন ওই কথাগুলার ভিতর দিয়ে! "শুনে কি লাভ মশায়?—পাইয়ে দিন।" মূর্খ যতক্ষণ থাকবি, ততক্ষণই বলবি "শুনে লাভ কি"? এ যে তোর নিজেরই ভঙ্গিমাটার কথাই বললাম। তুই কেমন ক'রে মোষ হলি, তুই কেমন ক'রে মায়ের সঙ্গেই জোড়া রয়েছিস্—বছরে একবার ক'রে যে মহিষ হচ্ছিস্—তা নয়;—সর্ব্ব সময়েই অহর্নিশ এ হচ্ছে; কেমন ক'রে

তোর আধখানা রয়েছে মোষের পেটের ভিতর আর আধখানা মাত্র বেরিয়ে আসছে কেমন ক'রে নবীন হ'য়ে আবার জন্মাচ্ছিস্, এই সব দেখতে পাওয়া মানেই হবে তোর বেদ। গতিতে পড়ে যাওয়া। চোখটা যদি তোর নিজেতে পুড়ে যায়, মোষের গতিটা যদি দেখতে পাস, তবে হ'য়ে গেল সাধনা। এইজন্য তোদের পুনঃপুনঃ বলছি, খালি শুনে যা, তা' হ'লেই রাস্তা আপনা হ'তেই ফাঁক হ'য়ে যাবে; শুধু রাস্তা ফাঁক নয়, মা পর্য্যন্ত ফাঁক হ'য়ে যাবে। তুই খালি তোর নিজেতে কেমন 'মোষ' মর্দ্দিত হচ্ছে, দেখ।

অসুরাসৃগ্‌বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তেকরোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্॥ (চণ্ডী-৩।১১।২৮)

[হে চণ্ডিকে, অসুরগণের রক্ত ও মেদস্বরূপ পঙ্কে চর্চ্চিত স্বীয় তেজে উজ্জ্বল তোমার খড়্গ জগতের মঙ্গল বিধান করুক; আমরা তোমাকে প্রণাম করি।]

"মহিষাসুরমদোন্মাথে প্রণতোস্মি প্রসীদ মে"।

[হে মহিষাসুরগর্ব্ববিমর্দ্দিনি! আমি তোমাকে প্রণাম করি; তুমি প্রসন্ন হও।]

"মহিষাসুর-মদোন্মাথে"—অর্থাৎ যখন তিনি মোষ মারছেন, তখন নিধন ক্রিয়া চলছে—এটি দেখতে হবে। তুই নিজেই খানিকটা মোষ, আর নিজেই খানিকটা নিধন ক্রিয়ার দিকে তাকিয়ে আছিস্। ওরই নাম দেওয়া হ'য়েছে 'চণ্ডিকা'! নিজেই মোষ হয়েছিস্? পাড়াপড়্‌শীর মোষ দেখে কি মোষ মারা হবে? নিজের মোষ দেখ। আমি কতদিন থেকে ব'লে আসছি এই কথা! মা বেদের হরফ ধরে ধরে এই কথা এখন ব'লে দিচ্ছেন। ওঁর নাম 'চণ্ডী'—চতি চ উড্ডীয়তে চ, অর্থাৎ রস খাচ্ছেন আর উড়্‌ছেন। 'উড়া' কথাটার মানে কি, তা' বলা হয়নি।

সামের ভিতর দিয়ে উদ্‌গীথের যে গতি সেটা হ'ল উড়া। electricity without flaring light (চঞ্চল দীপ্তিবিহীন তড়িৎ)—এ এই রকম নয়, এ হ'ল দীপ্তি; যেমন electricity হয় না নিজে আলো না হ'য়ে। হয় অগ্নি, না হয় চন্দ্র, না হয় সূর্য্য—এক বাহ্য জ্যোতি ও নেবেই; এই হ'ল চণ্ডীর চণ্ডিত্ব। বাহ্য জ্যোতিঃ ফোটা নিয়ে—চেহারা নিয়ে—যে ওর চণ্ডিত্ব, এ অর্থ টাই প্রবল। এই যে বরণীয় জ্যোতি, এই হ'ল **'সরস্বতী'** ক্ষেত্র।

সরস্বতী ক্ষেত্র ও তার ধর্ম্ম

সরস্বতী ক্ষেত্রের ধর্ম্ম হ'ল কি? এই যে সূর্য্য, চন্দ্র, অসংখ্য জ্যোতিঃ পিণ্ড, অসংখ্য উল্কাময় জগৎ—এই যে আলোকময় ভূমি, এই হ'ল 'সরস্বতী ভূমি'। এই যে ভূমি, এই-ই স্বর্গ—এই-ই মর্ত্ত্য। এই প্রকাশটিই এক দিক থেকে স্বর্গ, এক দিক থেকে মর্ত্ত্য, আর এক দিক থেকে অন্তরীক্ষ বা সোম। এপাশ থেকে দেখলে—মর্ত্ত্য, মধ্যে দেখলে অন্তরীক্ষ বা সোম; আর ওপাশ থেকে দেখলে স্বর্গ। কেন? যেটাকে গড়ছ বা দেখছ, সেটা নিজেই বস্তুতঃ ওই রকম স্বর্গ-মর্ত্ত্য-অন্তরীক্ষের সমাবেশ। তোমার চোখ যদি মায়ের মতন তিনটা হ'ত, তুমি দর্শনত্রয়ময় স্বর্গ-মর্ত্ত্য-অন্তরীক্ষ যুগপৎ দেখতে পেতে। দর্শনত্রয় মানে তিন রকমের দৃষ্টি। 'দৃষ্টি' মানে— (১) ঈক্ষণ, কামন, বসন, (২) হওয়া, (৩) পাওয়া। তা হ'লে দৃষ্টি মানে হয় মূল যে তত্ত্ব তাকে দেখা। এই হ'ল 'জ্ঞান'। জ্ঞান বলতে ঢুকে গেলে পাতলা একটা কিছুতে—এটা ঝুট্। জ্ঞান এমন জিনিষ, যা' হয় পাথরের মত কঠিন, আগুনের মত গরম, বরফের মত ঠাণ্ডা, আকাশের মত ফাঁক, পাহাড়ের মত নিরেট।

মহিষাসুরকে দেবীর বর দান

মহিষাসুরকে মা বর দিচ্ছেন। মহিষ বলছে "অসুরত্ব চাইনে; অসুরত্ব ভোগ ক'রে দেখলাম তাতে সুখ নেই। ইন্দ্রত্ব ও চাইনে; তাও ভোগ ক'রে দেখলাম, তাতেও সুখ নেই। আমি চাই যজ্ঞভাগ—চাই তোমায়"। দেবী বলছেন, তা' হবার যো নেই; যজ্ঞ ভাগ রয়েছে দেবতাদের জন্য। তোমায় বর দিচ্ছি, তোমাকে বাদ দিয়ে আমার পূজা হবে না"। মহিষাসুর বলছে, "মা, তোমার তো অনেক মূর্ত্তিতে পূজা হয়—'উগ্রচণ্ডা', 'দশভুজা' ও 'ভদ্রকালী'; এর মধ্যে কোন্ মূর্ত্তির সহিত আমি যুক্ত থাকব?" দেবী বলছেন, "তোমার বধ হবে তিন বার। আমার জগৎ যেমন নিত্য, তোমার বধও তেমনি নিত্য। জগৎ হচ্ছে ত্রিবৃৎময়; সুতরাং তুমি মর্ত্ত্যে বধ্য অন্তরীক্ষে বধ্য এবং তুমি স্বর্গেও বধ্য। আমিও ত্রিলোকব্যাপী, তুমিও ত্রিলোকব্যাপী। 'উগ্রচণ্ডা' মূর্ত্তি, 'ভদ্রকালী' মূর্ত্তি ও 'দশভূজা' মূর্ত্তি—এই তিন মূর্ত্তিতে; আমি মধুকৈটভ বিনাশ করি, দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করি এবং মহিষাসুর বিনাশ করি। মধুকৈটভ বধার্থে আমি 'উগ্রচণ্ডা' বেশ ধারণ ক'রে বিষ্ণুকে জাগিয়ে দিয়েছিলাম। দক্ষযজ্ঞে দক্ষ শিবকে দেখছিল না, শুধু নিজেকেই দেখছিল; সেই কারণে তখন ভদ্রকালী বেশে গিয়েছিলাম চতুঃষষ্ঠী যোগিনী হ'য়ে; তখন হ'য়েছিলাম 'ষোড়শভুজা'। আর আজ সাধকের কল্যাণের জন্য হ'য়েছি 'দশভুজা'।"

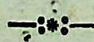
'উগ্রচণ্ডা' পূজায় পূজাবসানে অসংখ্য বলিদানের পর, যত কদর্য্যতা যত অশ্লীলতা—তোমারি ভিতরে আছে, মায়ের কাছে সব প্রকাশ করতে হয়; তা' না হ'লে মা তৃপ্তা হন না। তোমাদের ভিতরে ভিতরে যেখানে যত ঘৃণ্যতা আছে সেগুলা নিয়ে মায়ের কাছে উল্লাস করবে। জানবে, তখন মা তোমার গঙ্গাজলে

ধোওয়া ফুল নিতে আসেন নি। 'উগ্রচণ্ডা' পূজা করতে হ'লে যত ওঁচলা নিয়ে পূজা করতে বসবে। "আমার কাছে তুমি দিলদরিয়া হ'য়ে তোমার আঁস্তাকুড় খুলে ধর—তুমি ঠিক ঠিক যা' তাই বা'র ক'রে দাও। তুমি কামময়, ক্রোধময়, কৃপণ, লোভময়। তোমার যেখানে যেখানে এই রকম যত 'কু' আছে, সব বা'র কর আর উল্লাস কর আমার সাম্‌নে। তোমার বিড়ালতপস্বী-মূর্ত্তি দেখলে আমার ঘৃণা হয়। তোমার বুকে যখন কদর্য্য বৃত্তি সকল খেলা করে, তখন তারাও মোষ—তারাও ঋত্বিক। তারা যখন ডাকছে, তখন 'উগ্রচণ্ডা'; সেখানে তুমি আছ; অহংটা যখন প্রবল হ'য়েছে—ছাড়তে পারছ না, তখন 'ভদ্রকালী'—'ষোড়শভুজা'; এখানেও তুমি থাকবে। আর যেখানে মহিষ-মর্দ্দিনী দশভুজা' সেখানেও তুমি আছ"।

মহিষাসুরকে মা বর দিলেন—"আমার ত্রিবৃৎ ভঙ্গিমার মধ্যে এমন কোন ভঙ্গিমা থাকবে না, যেখানে তুমি আমার পায়ে লেগে নেই"। বাইরে থেকে তার নাম মরে থাকা; কিন্তু ভেতর থেকে তারই নাম বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকা মানে কি? যিনি ভোক্তা-ভোগ্য-প্রেরয়িতা, এই ত্রিমূর্ত্তি-ধারিণী,—ওঁর ভেতর ঠায় লেগে থাকা। না ফুটলেও ওঁর কথা যদি **বলতেও** যাই তো দেখি, ওঁর পায়ে মোষ লেগেই আছে।

এই যে তোমাদের এই সব কথা শুনাচ্ছি, কি করছি বলতে পার? বিষ্ণুর কানের ময়লা বা'র করছি, '**শ্রুতিমল**' বা'র করে দিচ্ছি।

শ্রীগুরুবাণী, রবিবার, ৩০-৮-১৯৪২



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অসুরের আত্মদান প্রণালী

[চুম্বক :—সাধনার উদ্দেশ্য—নিজেকে তন্ময় করা বা ভগবানে আত্মসমর্পণ করা। ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম জ্ঞানদেবতায় সমর্পণীয়। অসুর নামীয় 'অহং'বোধই জ্ঞানদেবতা দর্শনের অন্তরায়। অসুর ও দেবতা এক শক্তি হইতেই উদ্ভূত। অসুরসৃষ্টি ওই শক্তিতে আত্মদানের জন্য। এই আত্মদানের প্রথম স্তর—ব্রহ্মার শরণাগত হওয়া, অর্থাৎ মন্ত্রময় পুরুষ হওয়া। পরবর্ত্তী স্তর—মন্ত্রময় পুরুষ হ'য়ে নিজবাক্য অবলম্বনে ভগবতীরূপ লক্ষ্যে ধাবিত হওয়া। বাক্যের বা কথার শক্তি আছে তৎক্ষণাৎ বহন ক'রে নেওয়ার। গুরুকৃপার উদয়ে সাধকের দর্শন—নিজকথারূপে ভগবতীর আবির্ভাব। ভগবতীর গতিতে 'কাল' অন্তরায় হয় না। নিজ কথায়-চড়া ভগবৎমূর্ত্তি সাধকের একান্ত দ্রষ্টব্য। কথা ও মন্ত্রে পার্থক্য—'কথা' আত্মবহির্ভূত, আর 'মন্ত্র' আত্মসন্নিবিষ্ট। মন্ত্রই ভগবতীর ঋক্ মূর্ত্তি।]

সাধনার লক্ষ্য

জল জলকে গলায় কি? আগুন আগুনকে পোড়ায় কি? সুতরাং নিজেকে যদি জলময় বা অগ্নিময় ক'রে দিতে পার, তবে আর গলে যাওয়ার বা পুড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। এই তত্ত্বই হ'ল এমন যে নিজেকে তাই ক'রে দিতে হয়। এই যে এত বড় মহান্ বিভু, এঁর বেলাও ওই কথাই। তোমাদের এই যে ব্রহ্মবোধের এত আয়োজন, এই সমস্তের উদ্দেশ্য হ'ল ওই একটিই, অর্থাৎ নিজেকে তাই ক'রে দেওয়া। এটি করতে গিয়ে তোমার কোটি কোটি জন্ম চলে গেছে; কিন্তু এজন্য তুমি ভেব না। এই যে কোটি কোটি জন্ম পরিগ্রহণ করা, এটি নিরস্ত হয়

তখনই, যখন তুমি তাই হ'য়ে যাও—তার আগে নয়। এই কথাটি মাথায় নেবে—করতে পার আর না পার। কিন্তু সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখবে—"আমি ব'লে যা-কিছু, এগুলা সবই তোমার।" এই জন্যই ঋষি উপনিষদে বলেছেন—চক্ষু বলছে, "আমি যদি প্রতিষ্ঠা হই তো তুমিই সেই প্রতিষ্ঠা"; কান বলছে, "আমি যদি সম্পৎ হই তো তুমিই সেই সম্পৎ"; বাক্ বলছে, "আমি যদি বশিষ্ঠ হই তো তুমিই সেই বশিষ্ঠ"; মন বলছে, "আমি যদি আয়তন হই তো তুমিই সেই আয়তন"। (ছান্দোগ্য ৫।১।১৩-১৪)। এই সব উপদেশের মানে হ'ল চোখ, কান, বাক—এই গুলাকে জ্ঞানদেবতায় স্থাপিত কর। জ্ঞানদেবতায় স্থাপিত করা মানে কি?—আসল কথাটি হ'ল, তুমি যখন বস্তুদর্শী, তখন তুমি চোখের হাত থেকে দ্রষ্টৃত্বটি তুলে নিয়ে জ্ঞানের হাতে দান করলে—সত্যি যা' সেটিই দেখলে।

ঋষি বলছেন, "চক্ষু উত্থান করলে অসুরেরা তাকে আহত করেছিল ব'লে, চক্ষু এখন ভাল-মন্দ এই দুই রকম দেখে"। আমরা ভাল এবং মন্দ দেখি যে চক্ষুতে, এ হ'ল অসুরাহত চক্ষু—আসল চক্ষু নয়। ওই যে জ্ঞানচক্ষু, যেখানে তুমি অনুবেদন কর—যেটি অসুরাহত নয়—সেখানে যদি তোমার চক্ষুকে স্থাপিত কর, তা হ'লে সেটি হ'য়ে যায় অনন্ত। পর্ব্বতে ঢিল মারলে যেমন সে ঢিলটা গুঁড়িয়ে যায়, তেমনি সেই চক্ষুকে আক্রমণ করতে গেলে অসুরও গুঁড়িয়ে যায়। দেবতারা যা-কিছু দর্শন করে, শ্রবণ করে, আস্বাদন করে, সে সবের সত্য সত্য দ্রষ্টা, শ্রোতা, রসয়িতা—একমাত্র জ্ঞানই। যে জ্ঞানদেবতা এইরূপ সত্যি সত্যি দেখেন, সত্যি সত্যি শুনেন, সত্যি সত্যি আস্বাদন করেন, সেই দেবতাতেই তোমার এখানকার এই ধর্ম্মগুলা স্থাপিত কর। জ্ঞানের এই যে ছবি দেখলাম, এইখানেই তোমাদের নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি।

সত্যি সত্যি জ্ঞানই যে সব, ইঁনিই দেখেন, শুনেন, আস্বাদন করেন—সত্যি সত্যি একেবারে—এই কথাটি গুরু যখন তোমাদের দেখিয়ে দেন, তখন তোমরা তা' বুঝলাম না বলতে পার না বটে, কিন্তু তাতে ঠিক বলতে পার না। এইটুকু ঠিক ঠিক দেখবার জন্য জীবনের পর জীবন চলে যায়। সত্য সত্যই আমি দেখি না—এই জ্ঞানদেবতাই দেখেন, আমি বেঁচে নাই—ইনিই বেঁচে আছেন। আমার এই যে শক্তি, বীর্য্য, যা-কিছু, এ সব সত্য সত্যই ওঁরই শক্তি নিয়ে। ওঁরই দেখা-শুনা, ওঁরই বেঁচে থাকা—ওঁরই সব ভোগ নিয়ে আমি ওঁর যত সব transformation (রূপান্তর) স্বরূপ হ'য়ে রয়েছি। যেমন রোদ্দুরে ঘুরলে তাতেই আমি আলোময় হই, তেমনি আমি আধারস্বরূপ ওঁরই বুকে ঘুরে ঘুরে ওঁরই সব নিয়ে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছি। তারপর দেখি, এই যে 'আমি'—'আমি' ক'রে চলছি, এই সব তো ঐ 'আমি' নয়—এ সবই যে ওঁরই—আমার সর্ব্ব অঙ্গ, মেদ, মজ্জা, রক্ত ইত্যাদি সব ওঁরই—এ সব যে ওঁরই টগ্‌বগানি! সুতরাং এই যে জ্ঞান', এই জিনিষটিই খাঁটি।

সাধনার পথে অন্তরায়—অস্থরত্ব

কিন্তু এটি বেখাঁটি মেরে যাচ্ছে—যেখানে 'ওঁরই সব' এই ব'লে দেখা হচ্ছে না—যেখানে 'আমারই' এই ব'লে দেখছি। তা হ'লে যেটা মনে করছে 'ঐ আমি,' সেটাই বেখাঁটি—সেটারই নাম 'অস্থর'। কথাটি খুব ছোট বটে, কিন্তু একে বিস্তার ক'রে ক'রে ঋষি উপদেশ দিয়েছেন, আর এর জন্য পূজারও ব্যবস্থা করেছেন; এবং এটিকে practically বসাবার জন্য আমিও এমনি ক'রে দেখাচ্ছি; এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল, একে develop ক'রে তোমাদের সামনে ধরে দেওয়া—কী এক বিপুল শক্তি প্রতিরোধ করছে ওই জ্ঞানদেবতাকে দেখার পথে! এটি স্পষ্ট

ক'রে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি; কেননা তোমরা খালি "হা হতোঽস্মি" ক'রছ, এই শক্তিকে দেখছ না ব'লে।

অসুর সৃষ্টির উদ্দেশ্য

যেটি প্রকৃত 'আমি' হচ্ছে—এটি যাঁর শক্তি, যেটি প্রতিরোধ করছে—সেটিও তাঁরই শক্তি। আজ সাধনার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে পারে শুধু ওই অসুর। কেন?—মা তাকে গড়েছেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে; একটা রূপ তৈরী করেছেন মধু পান করবেন ব'লে। সেই অসুর আছে ব'লেই যেখানে তার কাজ হচ্ছে সেটিকে তুমি বিধারণ করছ এবং তোমাকে শুদ্ধ আঁকড়ে ধরে দেখছ। এই হ'লেই মায়ের খাওয়া হয়—ভোগ হয়; আর তা না হ'লে মায়ের ভোগ হয় না। প্রতিটি রস বজ্রের মত কঠিন ক'রে মা অসুরশক্তি গড়ে তুলেছেন। মা যে চিবিয়ে খান্ সে খাওয়াটি হ'ত না, যদি না অসুরকে এইরূপ বজ্রময় ক'রে না গড়তেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অসুর গঠিত হয়েছে মধ্যে আত্মদান করবার জন্য। সে যে কিরূপে সর্ব্বস্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, এইটাই হ'ল তার জীবন। প্রথমে হয় তো সে লাফালাফি করে—স্বর্গরাজ্য অধিকার করে—দেবতাদের তাড়িয়ে দেয়। এই মৃত্যুময় অস্তিত্বটি না থাকলে গঠনই হয় না—সবই আত্মজ্যোতিতে পর্য্যবসিত হয়। কাজেই অসুর যখন দেবতাদের সরিয়ে দেয়, তখন তারা স্বর্গভ্রষ্ট হ'য়ে—এইখানে মর্ত্ত্যক্ষেত্রে মানুষ হ'য়ে—ঘুরতে থাকে, আর স্বর্গরাজ্যটি হ'য়ে যায় অসুরের। তখন দেবতারাও মত্ত হ'য়ে অসুরেরই দাসত্ব করতে থাকে। চণ্ডীতে আছে, অসুরেরা স্বর্গজয় ক'রে তথায় রাজত্ব করতে লাগল। আর দেবতারা নিজ নিজ রাজত্ব হারিয়ে মর্ত্ত্য মানুষের চেহারা ধরে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগল। তার মানে হ'ল অসুরেরা বলবান্ হ'য়েছে; আর দেবতারা হ'য়েছে তাদের খাতক। এই

যে 'তুমি' রয়েছ, এখানে অসুরেরাই হয়েছে বলবান্ এবং ইন্দ্রাদি দেবতারা মর্ত্ত্যে এসে অসুরদেরই সেবা করছে। এর নাম মহিষাসুরের স্বর্গবিজয়। তা হ'লে 'মহিষাসুরের' গল্প তোমাতেই দেখা যাচ্ছে।

অসুরের আত্মদানের স্তর

'মহিষাসুর' মাকে ডাকতে শেখেনি। কিন্তু তাকে শিখতে হবে। যতক্ষণ মাকে তোমার মনে পড়ে, ততক্ষণ তোমাতে দেবতারা ফুটছে; তারা তখন বলবান্। কিন্তু তোমার অজ্ঞাতসারে মা যখন তোমা থেকে সরে পড়েন, তখন দেবরাজ 'ইন্দ্র' অর্থাৎ তোমার আত্মা—"কে আছ কোথায়, থাক্‌লে বাঁচাও গো!"—এই ব'লে কাঁদতে থাকে। তখন দেবতাদের মাথার টন্‌ক নড়ে। কিন্তু টন্‌ক নড়লেও হবে না। যদি 'ইন্দ্র' ব্রহ্মাকে পূজা করতে পারে, তবেই ইন্দ্রের উদ্ধার। তা না হ'লে শুধু মানুষের মত "ত্রাহি—ত্রাহি" করলে কি ফল হবে? ইন্দ্রকে পুরোবর্ত্তী ক'রে তোমাকে ব্রহ্মার কাছে যেতে হবে; তবেই তুমি বিষ্ণু-মহেশ্বরের কাছে যেতে পারবে। বিষ্ণুর কাছে বা শিবের কাছে যেতে হ'লে আগে যেতে হয় ব্রহ্মার কাছে; সেখানে জ্বলে উঠে 'ঋক্' অর্থাৎ 'মন্ত্র', আর তখন মা আসেন।

এই যে ব্রহ্মাকে পূজা করতে যাওয়া এর মানে কি?—মন্ত্রময় বা বেদময় পুরুষকে পূজা করা। যার বাক্য সকল মন্ত্রময়—ঋক্‌-ময় বা বেদময়—সেই পুরুষের নাম 'ব্রহ্মা'। তা হ'লে তোমাকে প্রথমেই হ'তে হবে 'ব্রহ্মা' অর্থাৎ 'মন্ত্রময় পুরুষ'। "অহম্ ব্রহ্মাস্মি"—এর মানে হ'ল, 'ব্রহ্মা' ব'লে আমি যে তত্ত্বকে অবলম্বন করছি সে-ই সব। ব্রহ্মা যখন বললেন, "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" তার মানে হ'ল তিনি ধরলেন সেই মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তিতে তিনি বলেন "আমিই সব"। এই যে 'আমিই সব'—এই কথাটির ভিতর

'আমি' যখন ঢুকে যাই, তখন যে পুরুষকে লক্ষ্য ক'রে এই কথা বলি, তার নাম 'ব্রহ্মা'। 'বোধই সব'—এই যে বোধের একটি রূপ, এটি পরিজ্ঞাত হ'য়ে কথা কয় যে পুরুষ, তার নাম 'ব্রহ্মা'। আত্মবোধের একটি লক্ষণ হ'ল 'আমিই সব'—এই বোধ। ব্রহ্মার ব্রহ্মভাবীয় বা সর্ব্বভাবীয় যে উত্থান তাকে লক্ষ্য ক'রেই বলি 'ব্রহ্মা'। "আমিই ব্রহ্মা"—এর মানে, যদি কেউ কোথাও কিছু হয়, সে আমি—আর কেউ নয়"। যে দেবতা এই রূপ অবলম্বন করে, তাকে বলি 'ব্রহ্মা'।

বাক্য বা কথার শক্তি

এই রূপকে—এই ব্রহ্মাকে—পুরোবর্ত্তী ক'রে তোমায় যেতে হবে। কিন্তু এই চোখ দিয়ে তুমি চাও না। যখন বলা হয় "ওহে, ভগবতীর পূজা করতে বস!"—এর মানে কি? যেমন এখান থেকে কাশী যেতে হ'লে টিকিট কেটে গাড়ী চড়ে যেতে হয়, তেমনি কিসে চড়ে ভগবতীর কাছে যাবে? কে তোমাকে সেখানে ব'য়ে নিয়ে যাবে?—তোমার যানবাহন কই?—বোধস্বরূপ দেবতাই তো?—আচ্ছা, তুমি যে সারাদিন দুনিয়ায় ঘুরছ, এ কিসে চড়ে?—'কথায়'। আকাশে, পাতালে, জলে, সুখে, দুঃখে—কিসে চড়ে যাও?—'কথায়'। "এখন আমি মায়ের কাছে যাব" যদি বল, তা হ'লেও ওই 'কথায়' চড়েই যেতে হবে। 'মন্ত্র' এখন বলতে পারবে না। তোমার সারা জীবনের সুখ-দুঃখ—শুধু ইহ জীবনের নয়—তোমার সমগ্র জীবনপ্রবাহের যে গতিময় আবর্ত্তন—এই সবই হচ্ছে শুধু 'কথায়' চড়ে। তুমি তখন বলতে 'আমি আগুনে চড়ে যাই—বাতাসে চড়ে যাই—ইত্যাদি। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছ কিসে চড়ে তুমি যাও?—শুধু 'কথায়'।

আচ্ছা, এই যে তুমি 'আকাশ' বললে, এই বলাটা তোমাকে কেমন ক'রে আকাশে নিয়ে যায় বলতো? আকাশ আকাশই দাঁড়িয়ে থাকে, চোখ বুজে ঘুমাও যখন। তা হ'লে আকাশে নিয়ে যাওয়াটা কি রকম? আজ দশটার সময় ট্রেনে চেপে কাল দশটার সময় কাশী পৌঁছালাম—এই যাওয়াটা যে রকম ক'রে হয়, আকাশে যাওয়াটা সেই রকম কি?—না। তবে কিসে চড়িয়ে নিয়ে যায়?—কথায়। বলবামাত্রই কি নিয়ে যায়?—হাঁ। তা হ'লে যদি বলি "আমি ভগবতীতে যাব" কিসে চড়িয়ে আমাকে নিয়ে যাবে?—কথায়; আর সেও সঙ্গে সঙ্গে নিজে যাবে।

সাধকের কথারূপে দেবীর আত্মপরিচয়

এমন এক দিন তোমার আসবে, যে দিন গুরুকৃপা হবে—যে দিন তোমার ভাগ্যোদয় হবে; সেই দিন ভগবতী তোমার নিকট আত্মপরিচয় দিয়ে বলবেন, "হাঁ রে বৎস! আমিই তোর 'কথা' —আমিই তোর 'স্বর্গ'। আমি যে তোকে বুকে ক'রে ত্রিলোক ভ্রমণ করছি, তা দেখতে পাচ্ছিস্?" এই 'কথা'রূপিণী মা-ই তোমায় সব জায়গায় বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন তো? এতে কালের অন্তরায় আছে কি? কথাটি বলামাত্রই তো তুমি এই কথাতে চড়ে চলে যাচ্ছ! এটি তোমার চোখে ঠেকে কি? বলামাত্রই এই 'কথা' তোমাকে সেই ক্ষেত্রের যে কোন অংশে বহন ক'রে নিয়ে যায়। যার সুদূর এক সীমা হ'ল অমৃত বা স্বর্গ, এবং সুদূর আর এক সীমা হ'ল মর্ত্ত্য বা নরক, একে অতিক্রম করতে তার একটুও দেরী হয় না। এই কথারূপিণী দেবী বলেন, "আমিই এই সব 'লোক'। এই জন্য আমার বুকে উঠেই যে কোন লোকে চলে যেতে পার। তুমি যা বলবে, আমি তাই হ'য়ে তোমাকে ব'য়ে নিয়ে যাব"। "মা, তা হ'লে সবই তুমি!

তবে 'ভগবতী' ব'লে তোমারই পায়ের তলায় গড়াতে হবে। হে ত্রিলোকেশ্বরি! আজ আমায় এ কী রূপ দেখালে! একটি ক্ষুদ্র কথার চেহারায় যেন উদ্‌গত হচ্ছ আমাকে ব'য়ে নেবার জন্য! তোমার বুকেই সব রয়েছে, অথচ তুমি প্রত্যেকেরই বুকে এক একটি ক্ষুদ্র কথারূপ ধরছ, আমাদের—অসুরদের—ভোগ দেবার জন্য! এই ক্ষুদ্র অসুরকে ডালে-ভাতে-টাকায়-আকাশে-বাতাসে ব'য়ে ব'য়ে অনবরত ভোগ দিতে দিতে নিয়ে চলেছ।"—"হাঁ বাবা! আমিই ত্রিলোক গড়েছি ব'লে যাঁহাতক আমাতে চড়ছ, অমনি বাঞ্ছিত লোকে পৌঁছে গেছ!" এতে 'কাল' এসে অন্তরায় হয় না—তাঁর তাকে "দাঁড়া, বাবা"—এরূপ বলবারও অবকাশ নেই! এখন বুঝে নাও, এ কী এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

কথায়-চড়া মূর্ত্তিতে ভগবতীর দর্শন

যিনি ত্রিলোক সাজেন ও ত্রিলোক গুটান, তাঁর নামই তো 'ভগবতী'? এই রূপের অভিজ্ঞ যে পুরুষ, তার নাম ব্রহ্মা। আবার ইনিই বিষ্ণু, ইনিই মহেশ্বর, ইনিই দুর্গা, ইনিই কালী। "এই যে বহুবিধ মূর্ত্তি, এ তো আমারই মূর্ত্তি, না আর কার? এ সবই আমার কথার মূর্ত্তি! এই কথায় চড়া মূর্ত্তিতে এই মহাশক্তিকে দর্শন কর না! তোমার এই চেহারাটা দেখছ কেন? তুমি যে কোন কাজে, যে কোন চিন্তায়—যে কোন ভাবে রত থাক, তার ভিতরকার চেহারাটি হ'ল কি?—একটি 'কথায়-চড়া মূর্ত্তি। ঠিক তো? তা হ'লে এখন তুমি যে 'ভগবতী' দেখতে চাচ্ছ, তোমাকে কিসে চড়ে যেতে হবে?" "ওঃ, এইবার আপনার কথার মর্ম্ম বুঝতে পেরেছি—ওই কথায় চড়তে হবে।" এই সব উপদেশ যা শুনছ, এই সব শুনে কি অন্য কথা ভাল লাগে? এ কি মাঠে ঘাটে যাকে-তাকে দেওয়া যায়?

কথা ও মন্ত্রে পার্থক্য

তুমি বলছ তোমার হাত পা; হাতে কাজ কর—পায়ে চলা ফিরা কর। এখন তুমি স্থূলতঃ চড়ে আছ হাত-পায়েই। আবার দেখতো, তোমার হাত-পা-চোখ-মুখ-কান কিসে চড়ে আছে, বাবা!—ওই 'কথা'য় চড়ে আছে তো? হর-হর! এখন এই সবের নাম হ'য়ে গেল 'মন্ত্র'—এ আর 'কথা' নয়। 'কথা' ততক্ষণই মাত্র কথা, যতক্ষণ এ আত্মবহির্ভূত; আর 'কথা' তখনই হয় 'মন্ত্র' যখন এ থাকে আত্ম-সন্নিবিষ্ট। কথার ভিতর নিজেকে সন্নিবিষ্ট দেখ! কি রকম উপদেশ! এই 'মন্ত্র'কে বা মন্ত্রময় পুরুষকে অর্থাৎ 'ব্রহ্মা'কে পুরোবর্ত্তী ক'রে—'পুরোহিত' ক'রে—তোমাকে বিষ্ণুর কাছে এবং শিবের কাছে যেতে হবে। এই জন্যই চণ্ডীতে আছে "প্রথম চরিতস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ. মহাকালী দেবতা"—ইত্যাদি।

তা হ'লে কি পেলে?—মন্ত্রই হ'ল তোমার পুঁজি। 'মন্ত্র' জানলে তবে তোমার দুর্গোৎসবের 'কল্পারম্ভ' হবে। এতদিন তুমি মায়ের মাটি-জল-বৃক্ষ-পর্ব্বত-আকাশ-বাতাস, এই সব মূর্ত্তি দেখছিলে। আর আজ তুমি মায়ের এ কী মূর্ত্তি দেখলে! কালো মা আমার আজ এ কী মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন! "ওরে! তোর আকাশ—তোর ধন—তোর বাড়ী—ব'লে এতদিন পড়েছিলাম; আজ আমার কি মূর্ত্তি দেখলি?"—এই মূর্ত্তির নাম 'ঋক'। এই অমূল্য সম্পদ নিয়ে মা আজ গুরু সেজে বসেছেন। তোমরা এখনও তাঁকে চিনলে না।

"ওঁ বিশুদ্ধ জ্ঞানদেহায় ত্রিবেদী দিব্যচক্ষুষে।
শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি নিমিত্তায় নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে।"

(চণ্ডী—কীলকস্তব)

—শ্রীগুরুবাণী, রবিবার, ১৬-৯-১৯৪৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চণ্ডীবর্ণিত ত্রিবিধ অসুর-চরিতের মর্ম্ম

[**চুম্বক :**—চণ্ডীর মহিমাত্রয় বিভাগের বিবিধ নাম। মোহের লক্ষণ। কর্ম্ম ও ভোগের লক্ষণ। মহিষাসুরের স্বরূপ বর্ণনা। চণ্ডীর মহিমাত্রয়ের অন্যবিধ নাম ; এই ত্রয়ী মহিমার বিভিন্ন বিশেষত্ব। জীবত্বে ও বিরাটে এই শক্তিত্রয়ের ক্রিয়া। বিরাটে ত্রিশক্তির স্বরূপ। প্রাণের জাগরণে ভীতির নিধন। পরাবিদ্যার আবির্ভাবে অধ্যবসায়ের নিধন। অদ্বৈত জ্ঞানোদয়ে সর্ব্বসংস্কারের লয়। ভগবতীর নিত্যলীলায়নের মহিমা।]

চণ্ডীর মহিমাত্রয়

তমঃ রজঃ সত্ত্ব—এই তিন আখ্যা ঋষিরা দিয়াছেন মায়ের মহিমাবিভাগত্রয়কে। অথবা তাঁহার: তাঁহাকে 'মহাকালী', 'মহালক্ষ্মী' ও মহাসরস্বতী' নামে আবাহন করিয়াছেন। তাঁহারি সে তমোময়ী মূর্ত্তির মহিমা—'মোহ', রজোময়ী মূর্ত্তির মহিমা—কর্ম্ম, সত্ত্বময়ী মূর্ত্তির মহিমা 'ভোগ'। আত্মবোধশূন্যতার নাম মোহ। চেতনপ্রবাহের নাম কর্ম্ম। আত্মবোধপূর্ণতার নাম ভোগ। "আপনি আছি" এরূপ জ্ঞান পর্য্যন্ত যখন থাকে না, তখনই মোহের পূর্ণ বিকাশ। নিদ্রা, মৃত্যু—এই জাতীয় (অবস্থা) মোহ। মোহ তিরোধানের মুহূর্ত্তে এ প্রকার মোহের গভীরতার আভাষ পাওয়া যায়। কোন বস্তু বা ভাববিশেষে আত্মহারা হওয়াও মোহের অন্যতম রূপান্তর। চেতনার কোন প্রকারের বিবর্ত্তনই 'কর্ম্ম'। আত্মা বা চেতনাদ্বারা চেতনাকে বা আত্মাকে জানাও কর্ম্ম। আর সেইরূপ চেতনাদ্বারা চেতনাকে জানার বা স্বসম্বেদনের আনন্দ—'ভোগ'। আবার কোন বস্তু, ব্যক্তি, বা ভাব বিশেষকে আত্মস্থ করিয়া দেখা বা সেটিকে যেন আমারই সত্তার অংশবিশেষ, এইরূপে

বোধ করা, ইহাও 'ভোগ'। আত্মসত্তাবোধ হারান আমরা মৃত্যুতে ও নিদ্রায় দেখিতে পাই। কিন্তু অন্য এক প্রকার হারান তোমরা অনুভব কর, যখন কোন পদার্থে এমনভাবে আপনাকে হারাও যেন তুমি নাই বা তোমার নিজসত্তা নাই—তাহার সত্তাই তোমার সত্তা। ভূতাবিষ্ট পুরুষে এরূপ দেখিতে পাও। ইহাও মোহের রূপান্তর। এক কথায় আংশিক ভাবে বা পূর্ণভাবে আপনাকে হারানই—আত্মচেতন হারানই—'মোহ'। চিৎচাঞ্চল্যই 'কর্ম্ম'। আংশিকভাবে বা পূর্ণভাবে আপনা হইতে অন্য কিছুকে আপন সত্তার অংশবৎ দেখিয়া আত্মপুষ্টি বোধ করা, বা আত্মস্থ হইয়া আত্মবোধপুষ্ট হওয়া—এ সকলই 'ভোগ'। চেতনশূন্যতা 'মোহ', চেতনচাঞ্চল্য 'কর্ম্ম', স্থিতচেতন 'ভোগ' বা ভোগের লক্ষণ। মোহের প্রতিক্রিয়া ভীতি, কর্ম্মের প্রতিক্রিয়া কোপ, এবং ভোগের প্রতিক্রিয়া অদৃষ্ট ও পুরুষত্ব, বা সংস্কার ও জীবত্ব, কিম্বা প্রকৃতি ও পুরুষত্ব।

মোহের লক্ষণ

আপনাকে 'পর' করিয়া বা দ্বিতীয় করিয়া তোলা—ইহা মোহের লক্ষণ। আমি যদি কাহাকেও ভালবাসি বা কোন কিছুতে একান্ত মুগ্ধ হই, তবে সে মুগ্ধতা সম্বন্ধে যখন প্রথম চেতনার উদয় হয়, তখন মনে হয়, আমাতে আর আমি নাই, আমি উহারই হইয়া গিয়াছি। কোন একান্ত জনশূন্য ক্ষেত্রে গভীর অন্ধকারে মনে হয়, যেন আমি আমাকে হারাইয়া ফেলিতেছি, আর যেন কে আমায় গ্রাস করিতে আসিতেছে। এই হারান বোধ ও এই দ্বিতীয় সত্তাবোধ আপনার সত্তাবোধ হইতেই উদয় হয়। যাহা কিছু আপনার অংশ বলিয়া বোধ হইত, সেগুলি সেখানে না পাওয়াতে এইরূপ বোধ হয়। ব্রহ্মা প্রলয়ান্তে এই মোহ পাইয়াছিলেন।

কর্ম্ম ও ভোগ

আর পরকে আপন করিয়া লওয়া—ইহা ভোগের অন্যতম প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় বা পরকে বা দ্বিতীয়বৎ প্রতিপন্ন আপনাকে আপনার সহিত যুক্ত করিয়া লইতে গিয়া আমরা বদ্ধ বা মুক্ত হই। আপনি আপনাকে পাইতেছি, এই বোধে মুক্তি, এবং আমি পরকে স্বীয় অধিকারে পাইয়া কৃতার্থ হইতেছি, এই বোধে বন্ধন। পরকে এইরূপ লইতে গিয়া আমরা বিষম বিপ্লবে পড়ি। ইহাই শুম্ভ-নিশুম্ভের বিপ্লব। ইহাতে সহচররূপে পাই অজ্ঞানান্ধতা, মত্ততা, পরশ্রীকাতরতা, পুরুভুজ-সদৃশ কামনা এবং বন্ধনের সংস্কাররাশি। চেতনায় যদি মুগ্ধ হই, তবে তাহাই হয় 'যোগনিদ্রা', আর অচিতে বা পরে হইলেই হয় মূঢ়তা। চেতনার যদি নিজের জন্য চাঞ্চল্য হয়, তবে তাহাই হয় সাধনা। আর তাহা না হইলেই হয় উচ্ছৃঙ্খল অধ্যবসায়। ইহাই 'মহিষাসুর'। আর চেতনায় চেতনকে পাওয়াই 'মুক্তি', ও পরকে পাওয়া বা অচিৎকে পাওয়াই 'বন্ধন'।

মহিষাসুরের পরিচয়

মহি+ষ, মহিবিধ্বংসী রম্ভপুত্র মহিষাসুর—'কাম'! (এই মহিষাসুরই তোকে অমরাবতীর অমরৈশ্বর্য্যবঞ্চিত করিল, হইলি তুই হৃতরাজ্য—তোকে তাড়াইল ত্রিদিব হইতে মর্ত্ত্যে মরণের মূর্চ্ছনে)। খণ্ডে খণ্ডে অনুপ্রবেশে যেমনই হারাইলে ভূমাদৃষ্টি, সৃষ্টি হইল রম্ভ অসুরের আরম্ভ অনাত্ম-রমণের! চাহিলে তুমি দশদিগন্তে দশ ইন্দ্রিয় মেলিয়া—হেরিলে অচিৎ বিষয়মেখলা দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত, সঙ্গ হইল আত্মানাত্ম—জাত হইল কামমহিষ—মূর্ত্তি ধরিল বিভীষণ! আত্মরমণ বাহ্যবিশ্বে—আত্মান্বেষণ দৃশ্যে দৃশ্যে—মহিতে বালুতে ধূলিতে তোমার আত্মপ্রীতির অন্বেষণ! যাহা

পাও তাহা কর গ্রাস - শুধু স্বার্থসাধন—শুধু অধিকার—আস্ফালন! কোথায় প্রীতি—কোথায় তৃপ্তি?—তৃপ্তির নামে সংগ্রহ শুধু—প্রীতির নামে বলিদান। হৃদয়াকাশ মহিষাধিকারে ভরিয়া গিয়াছে আঁধারে—বলির তপ্তরুধিরে! সত্যদেবতা হৃদয় ছাড়িয়া বিচরণশীল বাহিরে! মত্তমহিষতাড়নে, মরণে মরণে ছুটিয়া আকাশ ভরাইলে মরণে মরণে! শুধু মৃত্যু—শুধু সচকিত মৃত্যুভয়ে, শুধু ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদ! এততেও তুই হবি না জাগ্রত—এত দহনে দলনে দুর্গমে!

চণ্ডীমহিমাত্রয়ের অন্যবিধ নাম ও বিশেষত্ব

এই আমার হৃল্লেখার তিন মূর্ত্তি—পার্ব্বতী, অম্বিকা ও কাত্যায়নী। আর জেনে রাখ—এই পার্ব্বতী, অম্বিকা ও কাত্যায়নীই তোদের সুষুপ্তি, জাগ্রত ও স্বপ্নপাদের দেবী কালী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। তোদের চেতনাকে নিবিড় মোহের পরশে সমাচ্ছন্ন করে ও আবার সে তিমিরঘোর অজ্ঞানতা থেকে জাগ্রত ক'রে দেয়—ওই পার্ব্বতী কালীরূপে। তোদের জাগরণে সিদ্ধি, বিদ্যা, বীর্য্য, শ্রী দিয়ে সোহাগ করে ও বিশ্ববীজ রচনা করে—ঐ আম্বিকা মা দুর্গারূপে। আর তোদের স্বপ্নে বা ভোগপাদে ভোগের তৃপ্তি দিয়ে তোদের জীবত্বকে পরিপুষ্ট করে ও সংস্কার-রূপ ঐশ্বর্য্যসম্ভারকে ফলময়ী করে—ঐ কাত্যায়নী সরস্বতীরূপে। ঠিক তেমনি আবার তোর অহংকে অব্যক্তে ক'রে মুক্তিপ্রাঙ্গনে তোকে জাগিয়ে দেয়—ওই কালী; শক্তি ও সিদ্ধি দিয়ে তোর গতি বিস্তার করে—ওই দুর্গা; আর তোকে আপ্তকামত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব দেয়—কাত্যায়নী সরস্বতী। সুপ্তিপাদে মোহের মূর্চ্ছারূপ মধুময় সুপ্তিই 'মধু' নামীয় অসুর; আর কীটভীতি মৃত্যুই 'কৈটভ'। এই সুপ্তি ও মৃত্যু ও বিরাটে খণ্ডপ্রলয় ও মহাপ্রলয়ের দেবী—মহাকালীই তাঁর মধুকৈটভ বধের কারণ হন;

তোর প্রাণকে জাগিয়ে দিয়ে তোর জাগ্রত পাদে 'রম্ভ' (যাকে 'আরম্ভণ' বলে) নামীয় অসুরের পুত্র অধ্যবসায় বা কর্ম্মরূপ মহিষাসুরকে দলিত করে ও বিরাট বিশ্বক্রীড়ার বীজ সংগৃহীত করে ওই অম্বিকা মহালক্ষ্মী; আর সেই বীজসকলকে ভোগাকারে ও বিরাটে জগদাকারে ব্যঞ্জিত করে কাত্যায়নী স্বপ্নপাদে। আর সেই স্বপ্নপাদের যে অসুরদ্বয় অদৃষ্ট ও জীবত্ব বা পুরুষকার, ইহাদিগকে মথিত, পরিবর্ত্তিত অথবা সংহার ক'রে মুক্তিরূপ ভাগ্য ও মুক্তপুরুষকার রচিত করে এবং বিরাট বিশ্বরূপ ধারণ করে —ওই কাত্যায়নী মহাসরস্বতী!

সুপ্তি ও মৃত্যু, অধ্যবসায় বা কর্ম্ম, আর কর্ম্মফল ও জীবত্ব—এই ত্রিপাদ লইয়াই 'জীব'; আর বিরাটে লয়, সৃষ্টি ও স্থিতি— এই ত্রিপাদ লইয়াই 'বিশ্ব'। এই সুপ্তি বা মূর্চ্ছা ও মৃত্যুই 'মধুকৈটভ'; এই কর্ম্মই 'মহিষাসুর'; আর অদৃষ্ট (বা কর্ম্মফল) ও জীবত্বই 'নিশুম্ভ' ও 'শুম্ভ'। আর বিশ্বেশ্বরীর দিকে লক্ষ্য ফিরিলে ঐ সুপ্তি (স্বং অপীতো ভবতি ইতি) তুরীয় যোগনিদ্রা হয় প্রাণের অঙ্কেই এবং প্রাণের অঙ্কেই মৃত্যু হয়—বিদেহমুক্তি হয়। ইহাই মধুকৈটভের বিষ্ণু-অঙ্কে মৃত্যু। কর্ম্ম ব্রহ্মযজ্ঞ-আকারে নৈষ্কর্ম্ম্যে পর্য্যবসিত হয় ও ইহাই মহিষাসুর বধ। ভোগ মুক্তির আকারে ও জীবত্ব এক অবাধ আত্মপ্রত্যয়ে আত্মবিসর্জ্জন করে ইহাই শুম্ভনিশুম্ভ বধ। সংক্ষেপে এই ত্রিপাদ তত্ত্বটি চণ্ডীতে বর্ণিত, একথা যেন ভুলিস্ না। এইটুকু বুঝে রাখতে পারলেই তোদের এত কালের লুপ্ত চণ্ডীতত্ত্ব জাগিয়ে রাখা হবে।

জীবত্বে ও বিরাটে শক্তিত্রয়ের ক্রিয়া

বিরাট হিসাবে ঋষি দেবী মাহাত্ম্যে এই কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ত্রিপুরার ত্রিবিধ কাহিনী এই ভাবে বর্ণনা করিতে ঋষি প্রথম চরিতে তমঃ বা সুষুপ্তি বা মোহ, মধ্যম চরিতে রজঃ বা

জাগ্রদবস্থা এবং উত্তর চরিতে সুষুপ্ত, স্বপ্ন বা ভোগ দেখাইয়াছেন। প্রথম চরিতের ঋষি ব্রহ্মা উদ্বুদ্ধ হইয়া মোহের দৃশ্য দেখেন। নগ্না প্রলয়ঙ্করী কালী স্তবার্ণবকে কারণার্ণবে পরিণত করিয়া যখন মোহের আঁধার-বসন বিছাইয়া দেন, জগৎপ্রাণ বিষ্ণু সে বাসাঞ্চল-আবরণে শিশুর মত যোগনিদ্রায় সমাবৃত থাকেন। তখনকার সে দৃশ্য কী বিভীষণ! কিছু নাই—শূন্য-শূন্য-শূন্য! জ্যোতিহারা দিকহারা, শব্দহারা, নিবিড় অন্ধকার! স্বসত্তা যেন স্বসত্তাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। সর্ব্বগ্রাসিনী অব্যক্তের মাঝে সবহারা ব্রহ্মা মোহের আচ্ছন্নতায় ভীত হন, আত্মসত্তাকে মৃত্যুময় দ্বিতীয় বলিয়া বোধ করেন। পরে সে মোহরাত্রিরূপিণী মহাকালীকে পরমাত্মশক্তি বলিয়া চিনিয়া, স্বীয় প্রাণকে সম্বুদ্ধ করিয়া, সেই ভীতির কবল হইতে পরিত্রাণ পান। 'আমিই' আছি, দ্বিতীয় কেহ নাই, দ্বিতীয় হইতেই ভয়—এরূপ সোহং জ্ঞানে তিনি ব্যুত্থিত হন। প্রাণের জাগরণে ভীতির নিধনের মত দ্বিতীয় চরিতে অধ্যবসায় নিধন হয়—পরা বিদ্যার পাদপরশে, নৈষ্কর্ম্ম্য উদয়ে ও সিদ্ধি, শক্তি, শ্রী ও বিদ্যা লাভে। প্রাণ বা বিষ্ণুপ্রমুখ দেবতাবৃন্দের কোপে পরাবিদ্যার আবির্ভাব।

আর সংস্কার ও খণ্ড জীবপুরুষত্ব লয় প্রাপ্ত হয়, "যিনি বহু তিনিই একা"—এই জ্ঞানোদয়ে, অর্থাৎ সর্ব্ববিপরীত একত্র সমন্বয় করিয়া পূর্ণ পরমাত্মদর্শনে। অথবা সে সংস্কারসহ জীবত্ব, বা নিশুম্ভ-সহ শুম্ভ, মুক্ত পুরুষের আত্মাধীনে থাকে তাহার পদতলে নিম্নস্থ হইয়া। এই জন্য উত্তর চরিতের ঋষি 'রুদ্র'। জ্ঞানস্বরূপ 'রুদ্র' এই চরিতের দূতস্বরূপ প্রেরিত দেখিতে পাই। ভোগের অন্ধতা, মত্ততা, পরশ্রীকাতরতা, কামনা প্রভৃতি নিধনের পর জ্ঞানোদয় হয়। জ্ঞানগুরু যেন বলেন, "প্রযাত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ"—"অথবা নিধন প্রাপ্ত হইবে"। এই উত্তর চরিতে ঈশানের এই

মাত্র সম্বন্ধ দেখা যায়। অথচ তিনি এই চরিতের ঋষি; সুতরাং বুঝিতে হইবে, জ্ঞানের এই যে দৌত্য, ইহাই এ চরিতের সমধিক প্রধান ব্যাপার।

তোমার এই যে ঋষিবর্ণিত কাহিনী! তুমি পার্ব্বতি; তুমি দিনে দিনে এমনি করিয়া আমাতে যে নিত্যলীলা প্রকাশ কর! তুমি কালী হইয়া আস আমায় যোগনিদ্রা দিতে; আমার খণ্ডদর্শী প্রাণ কিন্তু অজ্ঞানতাময় ঘোর সুষুপ্তির মোহে মুর্চ্ছিত হয়। জাগরণের মাঝে তুমি আস মহালক্ষ্মী রূপে, দশপ্রহরণময় দশ করে আমার চাঞ্চল্য দুর করিয়া আমায় সিদ্ধি, শক্তি, শ্রী ও বিদ্যা দিতে। আমি দেখি, আসিয়াছে এক বিরাট আত্মশক্তির সংগ্রাম, এক প্রচণ্ড অভাবের প্রচণ্ড তাড়না, এক সনাতন ক্ষুধার সনাতন আহার সংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে সনাতন ভ্রমণ ও ভিক্ষা সংগ্রহ। স্বপ্নে বা ভোগে তুমি আস মহাসরস্বতীরূপে, ক্ষীরস্তনী মাতৃরূপে আমায় জ্ঞানস্তন্য দিতে। হায়! আমি দেখি, আসিয়াছে আমায় ভোগ দিতে এক পীনোন্নতপয়োধরা যুবতী বধূ! অহো নিশুম্ভ! অহো শুম্ভ! অহো অহঙ্কারময় জীবত্ব!

ওরে, শুধু এই জন্যই আমাদিগের বিষয়ভোগে তুমি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যাও! জ্ঞানদায়িনীর অঙ্গ হইতে এই জন্যই "করাল বদনা ঘোরা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী" বিশ্বগ্রাসিনী ভয়ঙ্করা 'বামা' বহির্গত হইয়া আমায় মুর্চ্ছিত করে। আমি হিমালয় স্থিতা দক্ষিণা কালীর ক্রোড়ে যোগনিদ্রা না পাইয়া বামাকালীর চর্ব্বণে পেষিত হই। আমরা ভোগের সময় যে যজ্ঞভাগাপহারী হই!

—শ্রীগুরুর "সত্যসম্বেদন" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত

(পৃষ্ঠা ৭৮-৮২, ৯৫-৯৭ এবং ১৬৫)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নমুচিবধ রহস্য

[চুম্বক :—ইন্দ্রকর্ত্তৃক জলের ফেনায় নির্ম্মিত বজ্রদ্বারা নমুচিবধের উপাখ্যান। শুম্ভনিশুম্ভবধ অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞান দূরীভূত হওয়ার পরও অমুক্তিবোধের নাম 'নমুচি'। গুরুর উপদেশে বিশ্বকে জ্ঞানময় ব'লে দেখলেও 'বিশ্ব' ব'লে একটা অচেতনত্ব বোধ থাকে। এই অচেতনত্ব বোধ দূর হয় না, যে পর্য্যন্ত না জ্ঞানময় বিশ্বই আপন প্রাণমূর্ত্তি ব'লে ইহার দিকে একটা অদম্য প্রাণগতি হয়। চিন্তা বা ধ্যানদ্বারা বিশ্বের অচিৎমূর্ত্তি নিরাকৃত হয় না—হয় শুধু গুরু প্রদর্শিত পথে নিজ প্লুতগতি প্রাপ্তি দ্বারা। অধ্যাত্ম ও অধিদৈব প্রাণ যে একজনেরই প্রাণপ্রকাশ—এই দর্শনই ওই প্রদর্শিত পথ। ইহার আর এক নাম দ্যু-ভু একসা করা। তদ্দ্বারা মহাপ্রাণের জাগরণ হয় এবং তাতে নিদ্রা ও জাগরণ ক্রমে অবিচ্ছিন্ন জাগরণে পরিণত হয়। অধ্যাত্ম প্রাণের এই প্লুতগতি মহাত্মাত্মার অব্যক্ত ক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত। প্রথমে সাধকের এই দর্শন হয় না। অন্তরাকাশ ও বাহ্যাকাশ এক প্রাণময়ী মায়েরই দ্বিবিধ প্রস্ফুটিত মূর্ত্তি; এই সত্য ব্যবহারের অভ্যাস একান্ত আবশ্যক। আত্মময়তা, প্রাণময়তা ও প্রাণের উদ্বেলন থাকলেই ব্যবহার সত্য হয়। বিশ্বমূর্ত্তি প্রাণেরই জমাটরসে রচিত; এই দর্শনে সেই ব্যবহার আসে। সুতরাং প্রাণরসেরই বজ্রে বিশ্ব রচিত—এই জ্ঞানে, এবং চিদচিৎ জ্ঞানের সন্ধিতে 'নমুচি' বধ্য। বেদাগ্নি প্রজ্বলনই এই জ্ঞানের অভ্যাস, এবং "ব্রহ্মৈবেদম্ সর্ব্বম্" ইহার লক্ষ্য। বেদগতিরই অন্য এক নাম প্রাণপ্রবাহ। রূপ ও রসের বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলাই বিশ্বতনুময়ী মায়ের ধর্ম্ম। ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি নবশক্তিমূর্ত্তিই (পরবর্ত্তী খণ্ডে দ্রষ্টব্য) তাঁর এই বৈচিত্র্যময় তনু। আর তদ্দর্শনজনিত সোমপানই সাধনা।]

পুরাণোক্ত নমুচি বধের উপাখ্যান ও তার মর্ম্ম

যখন শুম্ভনিশুম্ভ-বধ হ'ল, তখন ইন্দ্র ভাবলে যে তার উদ্ধার হ'য়ে গেল। কিন্তু তখনও তার উদ্ধার হয়নি—তখনও আর এক অসুর

আছে, যে না মরলে ইন্দ্রের উদ্ধার হয় না। সেই অসুর হ'ল শুম্ভনিশুম্ভের ছোট ভাই 'নমুচি'। ইন্দ্র তখন 'নমুচি'র সঙ্গে লড়াই করলে, কিন্তু পারলে না—হেরে গেল। ইন্দ্রকে সে বন্দী ক'রে বললে, "তুমি এখন আমার বন্দী; তবু তোমায় বর দিচ্ছি, ভিজেও নয়, শুকনাও নয়—এমন এক অস্ত্র দিয়ে, আর দিবাও নয়, রাত্রিও নয়—এমন এক ক্ষণে, তুমি আমাকে বধ করতে পারবে; এই ভাবে যদি প্রস্তুত হ'তে পার তবেই আবার যুদ্ধ করতে এস—তা না হ'লে আর এস না"। এই ব'লে সে ইন্দ্রকে ছেড়ে দিলে। তখন ইন্দ্র জলের ফেনা দিয়ে বজ্র নির্ম্মাণ ক'রে এই অস্ত্র দ্বারা দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণে নমুচিকে বধ করলে এবং ইন্দ্রত্ব ফিরে পেলে।

তোমরা এ পর্য্যন্ত যে জ্ঞান লাভ করেছ, তা' দ্বারা শুম্ভনিশুম্ভ পর্য্যন্ত বড় জোর বধ করতে পার। শুম্ভনিশুম্ভ বধ হ'ল প্রকৃত পক্ষে দ্বৈতজ্ঞান বধ। প্রকৃতি ও পুরুষ—এই বিভাগদ্বয় যখন গিয়ে একত্বে পর্য্যবসিত হয়, তখন হয় শুম্ভনিশুম্ভ বধ। যদিও তখন দেখতে পাও, এই বিশ্ব জ্ঞানময়, আমি জ্ঞানময় এবং সবই জ্ঞানময়, তবুও তা'তে তোমার মুক্তি হবে না; তখনও নমুচি' ব'লে একটা অসুর জেগে থাকে। 'নমুচি' মানে 'ন মুঞ্চতি' ইতি —অর্থাৎ তখনও "আমি মুক্ত হলাম" এই জ্ঞান তুমি পেলে না। এই কথাটি বলবার জন্যই ওই উপাখ্যানটি।

দুর্নিবার অচিৎবোধ

আমি তোমাদের ব'লে দিয়েছি ব্রহ্ম কে, ব্রহ্ম কিরূপ, আর কেমন ক'রে ব্রহ্মবোধে যেতে হয়। কিন্তু এতেও যে তোমরা ব্রহ্মের সাড়া পাচ্ছ না, তার কারণ এখনও তোমাদের 'নমুচি' মরেনি—এখনও "মুক্ত আমি" এই কথা বলতে পারছ না। কখন পারবে?

যখন জলের ফেনার বস্ত্র তৈরী করতে পারবে, যখন দিবারাত্রির সন্ধি দেখতে পাবে, আর যখন বস্ত্র দিয়ে এই সন্ধিক্ষণে 'নমুচি'কে আঘাত করতে পারবে। তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি, এই যে বাহ্যবিশ্ব, এটি জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়—এটি জ্ঞানদেবতারই প্রকাশ। তবু বিশ্ব যেন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে স্পর্দ্ধা ক'রে বলছে, "আমাকে কেউ জয় করতে পারেনি"। যতক্ষণ তুমি বিশ্বকে মাটি দিয়ে গড়া ব'লে দেখবে, ততক্ষণ বিশ্ব বলবে, "আমি অজেয়"। তুমি এতকাল দেখতে বাধ্য হচ্ছিলে যে এখানে গাছ রয়েছে, মাটি রয়েছে পাথর রয়েছে, জল রয়েছে; কিন্তু এখন গুরুর উপদেশ পেয়ে দেখছ যে এসবই "জ্ঞান"—"কেবলং জ্ঞান-মূর্ত্তিন্"। তুমি মনে করছ, এই জ্ঞানই অসুর মারবার পক্ষে যথেষ্ট, আর জগৎ দেখলেই একে পালটে জ্ঞানময় ক'রে দেখছ। তবু ততক্ষণ তোমার মুক্তি হবে না—ততক্ষণ তুমি জানবে 'নমুচি' মরেনি—যতক্ষণ এই দুনিয়া "আমি বিজিত হইনি" ব'লে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওইরূপে মাত্রায় মাত্রায় জ্ঞানমূর্ত্তি দেখা সত্ত্বেও দুনিয়ার গাছটার দিকে, মাটিটার দিকে যখনই তোমার চোখ পড়ছে, তখন প্রথমেই একটা অচেতনতার ছবি এসে যাচ্ছে। এই দুনিয়ার দিকে চোখ পড়া মাত্রই যতক্ষণ না তোমার 'প্রজ্ঞা' অর্থাৎ তোমার 'প্রাণ'—"এটি আমার প্রাণ—এটি আমার প্রাণ দিয়েই গড়া"—এমনি ভাবে এর দিকে পাগল হ'য়ে ছুটতে থাকবে, ততক্ষণ তোমার চোখে দুনিয়া অচেতন স্পর্দ্ধাশীল ও অজেয় হ'য়েই পড়ে থাকবে।

গুরুদত্ত জ্ঞান নিয়ে তুমি অসুর মারতে আরম্ভ কর। অসুর মারবার ক্রম হ'ল—"হংসযুক্ত বিমানস্থে"—ইত্যাদি থেকে আরম্ভ ক'রে "চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে"—ইত্যাদি পর্য্যন্ত নয়টি নারায়ণী মূর্ত্তির স্তব, যাকে বলে "নবার্ণ স্তোত্র"। (বিশদ বিবরণ 'রহস্য শিক্ষা'র পরবর্ত্তী

খণ্ডে দ্রষ্টব্য।) ব্রহ্মতত্ত্বে উঠতে গেলে জ্ঞানদেবতা এরূপ মূর্ত্তিতে পরপর ফুটতে থাকে; আর অবশেষে শুম্ভনিশুম্ভ বধ হয়।

আমার উপদেশ শোনা সত্ত্বেও তোমরা চিরকাল ধরে সেই চিন্ত্যরই অনুধাবন করছ। আমার কথা যখনই শুনলে, অমনি সব জড় ক'রে নিয়ে পেটের ভিতর পুরে মুদিত নয়নে ধ্যান করতে বসে গেলে। এই জন্যই তোমরা উঠতে পারছ না। আমি মুদিত নয়নে ধ্যানের কথা বলছি না—বলছি স্বতঃ-উদ্ভাসিত সর্ব্বরূপা মায়ের কথা; আর তোমরা যখন ভগবানের কথা ভাবছ, তখন মনে ক'রছ ব্যক্তবিশ্ব থেকে ভিন্ন আর একজন কেউ আছে এবং আমার এই কথাগুলাকে তাতে লাগাতে চেষ্টা করছ; নয়তো ধ্যান করতে বসে যাচ্ছ; নয়তো বা ভগবানকে সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছ! কিন্তু যাতে তুমি নিজে ভগবানে গা ঢেলে দিয়ে আপন স্ফূর্ত্তিতে 'প্লুতগতি' প্রাপ্ত হও, সেটি করতে পারছ না। 'প্লুতগতি' মানে ঢেউয়ের মত উথলে উথলে, বেড়ে বেড়ে. অনন্তে অনন্তে চলা। এই প্লুতগতি আমাকে ঠেলে দিচ্ছে সুদূরে—দিগ্‌দিগন্তে, কিন্তু তোমাকে এই গতি একটা ব্যাগে পুরার মত মৃত্যুর ভিতরে পুরছে। তুমি মুখে বলছ বটে "ভগবান," কিন্তু ছুটছ একটা মড়ার থলিতে! এই গতিটি দেখাই তোমাদের গুরু প্রদত্ত রাস্তা, এবং তোমাদের প্রাপ্তির সার্থকতার চরম জিনিষ।

অচিৎবোধ দ্রবীকরণের উপায়

তা হ'লে 'নমুচি'র এই যে অচেতনতার স্পর্দ্ধা, একে কিরূপে মারতে হবে? ঋষি বললেন "নমুচিকে সহজে মারতে পারবে না; ওকে জলের ফেনা দিয়ে, অর্থাৎ দিগ্‌দিগন্তপ্রসারী প্রাণ প্রকাশ দ্বারা বজ্র তৈরী ক'রে সেই বজ্র দিয়ে মারতে হবে। নচেৎ ওকে মারা সম্ভব নয়"। জল মানে 'প্রাণ', আর দিকের নামও 'প্রাণ'। এইখানে—তোমার বুকের ভিতর—'প্রাণ' ব'লে

যাকে আস্বাদন করছ, তাকে 'জানা' ব'লে তোমার একটা ভোগ আছে তো—যেমন তোমরা ব'লে থাক, "প্রাণটা জুড়িয়ে গেল"! ওইখানে—বাহ্যবিশ্বে—এই প্রাণই রয়েছে। ঋষি বলছেন, "এ কথাটি কবিত্ব নয়—ওই প্রাণের বিস্তার; যে প্রাণ ফুটে উঠে দিগ্‌দিগন্ত ব্যেপে, এই প্রাণই এইরূপে গুড়িয়ে যায় এবং বেড়ে উঠে; এবং তারই বুকে অনুভূতিময় হ'য়ে তোমাদের একবার জাগতে হয় ও একবার কোঁচকাতে হয়"। এই যে দিক্‌প্রকাশ, এতো একজনের স্থিতিময় প্রাণ? তুমিও এর ভোক্তা। কিন্তু তুমি একটি স্বতন্ত্র সত্তা ব'লে নিজেকে মনে কর; তাই এ প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে এবং আপনাকে আপনাতে গুড়িয়ে নেয়। সুরত্বের কেন্দ্ররূপে সূর্য্য ওখানে ব'সে আছে ব'লে এটি হয়। তোমার এই যে ভোক্তৃত্বটি, এটি সূর্য্যই পুনঃ-পুনঃ এইখানে তোমাতে নিয়ে এসে তোমাকে পাইয়ে দিচ্ছে; কেননা, তোমাকে দেখতে হবে, তুমি এইখানে যাকে 'প্রাণ' ব'লে বরণ করছ, এটি ওই যে দুনিয়াভোর ছড়িয়ে পড়েছে সে-ই। ওই প্রাণ যে আর কেউ নয়, এ তুমিই—এই কথাটা চেনাবার জন্য তোমাকে পুনঃপুনঃ নিদ্রিত ও জাগরিত করা হচ্ছে! যিনি প্রাণ হ'য়ে বাহ্যবিশ্বে ফুটে রয়েছেন বা ফুটছেন, ইনিই আপনাকে এলিয়ে দিয়ে তোমার ব্যূহস্থ প্রাণ সেজেছেন।

এইরূপে আপাতত প্রতীয়মান বিভিন্ন প্রাণশক্তি দুটিকে এক করবার জন্য তোমাদের যা করতে বলি, সেইটি করার নাম 'দ্যু-ভূ এক্‌সা করা'। পরিশেষে ঐরূপ এক্‌সা হবার জন্যই ওই প্রাণকেন্দ্র তোমাতে দিবারাত্রিবোধ রূপে একবার প্রসারণ ও একবার সংঙ্কোচন করাচ্ছে। এইরূপ এক্‌সা করাটি যখন হ'য়ে যাবে—যখন তোমার প্রাণটি মহাপ্রাণে উন্নীত হবে, তখন আর তুমি ঘুমাবে না। প্রথমে তোমার দিবারাত্রি—জাগরণ ও সঙ্কোচন

—হবে পাক্ষিক, অর্থাৎ তুমি চৌদ্দদিন জাগবে আর চৌদ্দদিন ঘুমাবে। তারপর হবে তোমার ছ' মাস দিন আর ছ' মাস রাত। পরিশেষে একদিন তোমার এমন অবস্থা হবে যে তোমার দিন-রাত্রি হবে এক হাজার বৎসর ক'রে। সে কি এই জীবনে হবে?—না। এই জগতের যে নিয়ম, এখন তুমি তার অধীন। তুমি শুধু জেনে নিলে পরপর ভূমিগুলা—পাক্ষিক দিন ও রাত্রি, ষাণ্মাসিক দিন ও রাত্রি, সহস্রবৎসরব্যাপী দিন ও রাত্রি। এসব ঠিক ঠিক ভাবে জেনে নিলে পরপর ভূমিগুলা টপ্-টপ্ ক'রে পার হ'তে পারবে।

এইগুলা এমন ভাবে জেনে নিতে পারলে তুমি একদিন দেখবে, জলে যেমন ঢিল ফেললে জলের ঢেউ ক্রমে বাড়তে বাড়তে দূরে চলে যায়, তেমনি এই যে তোমার স্পন্দন বা থাকাটি, অর্থাৎ তোমার ব্যবহারশীলতার যে প্রতিচাঞ্চল্য—এটি ক্রিয়া করছে ওই মহান্ বিপুল প্রাণে। তোমার প্রাণের এই যে চাঞ্চল্য —এর নড়াচড়া যা-কিছু—এ যে এখানেই আবদ্ধ, তা নয়; একে isolated (বিচ্ছিন্ন) মনে ক'র না! প্রাণের এই যে 'নবতি'রূপ গতি, এই ঢেউ বেড়ে বেড়ে চলেছে অনন্তে অনন্তে, যেখানে মা চলেও চলেন না. সেই অব্যক্ত ক্ষেত্র পর্য্যন্ত। কিন্তু তুমি তো তা' দেখছ না! তুমি যা' দেখছ, সেটি হচ্ছে the contracted soul within the human body—একেই তুমি ধরছ। প্রাণের এই প্লুতগতি গুরু দেখাচ্ছেন বটে, কিন্তু তুমি একে গ্রাহ্য করছ না।

বিশ্বমূর্ত্তি প্রাণেরই উদ্বেলন-এই জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আবশ্যকতা

এই দুনিয়াটা কি? এটি প্রাণেরই দিক্‌প্রকাশ নয় কি? ঋষি বলেন: "প্রাচী প্রাক্ প্রাণাঃ, প্রতীচী প্রত্যক্ প্রাণাঃ"। যিনি প্রাণ তাঁরই এই সব ফোটা মূর্ত্তি। ঋষি কে একে 'প্রাণ' ব'লে

বর্ণনা করলেন, তা কোন অনুমান দ্বারা নয়—একদম 'সত্যপ্রাণ' রূপে দর্শন দ্বারা। এখানে যে তোমার অন্তরাকাশ –"অয়মেব সঃ যোঽয়ম্ বাহ্যাকাশঃ"। যিনি অন্তরাকাশ তিনিই বহিরাকাশ, আর তিনিই 'প্রাণ'। কিন্তু তোমাদের কাছে এ সব কথা গৃহীত হয় শুধু কবিত্বের মত—সত্যের মত গৃহীত হয় না। অথচ তোমরা পূজাও করছ, জপও করছ, 'সত্য' 'সত্য'ও করছ! তোমরা "হা রাম"— "হা রাম" করছ বটে, কিন্তু ওটা হ'য়ে যাচ্ছে 'হারাম' অর্থাৎ বেইমান! তোমাদের আমি পুনঃপুনঃ বলছি, ওই যে 'প্লুতগতি'টি, এর দিকে চোখ রাখ—একে মেনে নাও; এই সিদ্ধান্তটিকে পাথরের মত শক্ত ক'রে বসিয়ে নাও। এটিতে যেন আর সন্দেহ না হয়, তোমাদের চোখে যেন পড়ে যায় যে এটা প্রাণগতি—এ 'মা'। ঘুম থেকে উঠলেই যেন মনে পড়ে যায়, এই যে বিশ্বমূর্ত্তি, ইনিই সাক্ষাৎ প্রাণময়ী মা। 'মা' ব'লে এঁর সঙ্গে সত্য ব্যবহার করবে।

এঁকে 'মা' ব'লে ব্যবহার করতে হ'লে কি কি জিনিষ দরকার? —(১) আত্মময়তা, (২) হৃদয়ময়তা এবং (৩) প্রাণের উদ্বেলন। আমি তোমার বাড়ী গেলে তুমি কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়!—"ওরে, এ নিয়ে আয়—তা নিয়ে আয়!" ওতে কি কিছু মিথ্যাচার আছে? তোমার গোটা প্রাণটি তোমাকে উদ্বেলিত ক'রে ঘিরে ফেলে! তখন অন্য কোন দরকারে কেউ এলে. তুমি বল "এখন ও সব কথা শুনতে পারি না—সরে যাও"। ভগবতীর সঙ্গে এরূপ ব্যবহারময় হ'তে হবে। তাঁর সম্বন্ধে এই সব কথা শুনে তুমি শুধু বলবে "আহা"! তুমি হ'লে মাতৃ-অন্বেষী—দীন, দরিদ্র, কাঙ্গাল; দীনতা ঘুচাবার আশায় বসে আছ, আর যে সর্ব্বময়ী মা তোমার দিগ্‌দিগন্ত ব্যেপে ঘিরে রয়েছেন, তাঁর কথা শুনে একবার একটু 'আহা' বললেই কি সব হ'য়ে গেল? 'মা' 'মা' ব'লে যদি তোমার আত্মময়তা, হৃদয়ময়তা এবং প্রাণের উদ্বেলন অব্যাহতভাবে

বইতে থাকে তবেই তোমার ব্যবহার ঠিক হবে। তোমার ছেলেকে যখন আদর কর, তখন তার চেহারা তোমার বুকে খোঁটার মত অটল হ'য়ে থাকে, আর তার উপর আধিপত্য করে প্রাণের উদ্বেলনটি। প্রাণের আধার হ'ল এই চেহারাটি। তুমি যে ছেলে বলছ তাতে যত রকম রস আছে, সেই সমগ্র রসটি জমে তো ছেলের এই চেহারাটি হ'য়েছে? তাই তাকে এত আদর কর। এমনি ভাবে তুমি বিশ্বরূপ ভগবৎমূর্ত্তিতে ব্যবহার-ময় হ'লে, তার নাম হবে সত্যের ব্যবহার। যাকে বললে 'মা,' তার প্রতিটি কণায় ব্যবহারময় হ'তে হবে, অর্থাৎ আত্মময়, হৃদয়ময় এবং উদ্বেলনময় হ'তে হবে। তখন কি তোমার বিন্দুমাত্রও চিন্তা আসবে যে ওই শরীরটা মায়ের least material জিনিষ? যখন তুমি ছেলেটিকে আদর কর তখন কি তোমার মনে হয় যে তার শরীরটা ছেলে নয়—ছেলে হ'ল ভিতরকার রসটি? তখন মনে হয় তার নখ, চুল, প্রভৃতি প্রতিটি অঙ্গই ওই রসে গঠিত! এই যে মাকে 'প্রাণ' বলে চেনালাম—যেটি দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, এও তো ওই রসেরই উদ্বেলন? আর এই উদ্বেলনই জমাট বাঁধা হ'য়ে যে যে চেহারা ধরেছে, তার নাম সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদি।

দিবারাত্রির সন্ধিই নমুচিবধের ক্ষণ

তা হ'লে তুমি যখন এই দিগ্‌দিগন্তপ্রসারী মাকে আদর করতে যাও, তখন আর তোমার মনে হবে না যে ওই গাছটা বা পাথরটা অচেতন। কেননা যে প্রাণ ডেলা বেঁধেছে এখানে —তোমার অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে—সে-ই ওখানে—বহির্বিশ্বে—ধরেছে এক একটি চেহারা, যার নাম পাথর, কাঠ, মাটি, আকাশ ইত্যাদি। নাম যাই হোক, আসলে দেখ কোন রসটি লহরে লহরে উদ্বেলিত হ'য়ে জমাট হ'য়ে ওই মূর্ত্তি ধরেছে। এই চোখ তোমাদের

ফুটবে 'নমুচি' বধ করবার জন্য? কখন—কোন্ সন্ধিক্ষণে—ফুটবে? যখন তোমাতে আর ওতে সন্ধি হবে; তৎপূর্ব্বে নমুচিবধ হবেই না। এখন তোমরা জ্ঞান ও অজ্ঞান, চেতন ও অচেতন—এই সব বিভাগ নিয়েই আছ। এইরূপ বিভাগজ্ঞান দূর হ'লে দিবারাত্রির সন্ধি হয় আর ওই নমুচি বধের ক্ষণ উপস্থিত হয়। তা হ'লে এখন অভ্যাস করবে কি? "তিনিই সব"—এই ব'লে নিতে পারলেই ভাল। কিন্তু তা হয় না যতক্ষণ না ঐ স্তর-গুলা গ্রহণ করতে পার। তুমিই বিশ্বমূর্ত্তি হ'য়েছ—এমন ভাবে যদি নাও, তা হ'লে 'তুমি' 'তুমি'ই থাকবে, আর 'বিশ্ব'ও 'বিশ্ব'ই থেকে যাবে। আবার তুমি বিশ্ব' এই জ্ঞান থাকলে 'আমি' বাদ পড়ে যাই। তাই এই যে চিরে চিরে একসা হ'য়ে যাবার রাস্তাটি, এটিই গ্রহণ করতে হবে। "ব্রহ্মৈব ইদম্ সর্ব্বম্"—এটিই সার কথা; তবে এটি চিনে নেওয়ার রাস্তা হ'ল বেদ; আর 'বেদ' মানেই ওই সব স্তর।

'বেদ' এখন একটা অন্য রকম জিনিষের মত হ'য়ে গেছে। কিন্তু এই 'বেদ' এবং 'এই 'তুমি' এক নয় কি? ঋক্—যজুঃ—সাম যখন বললাম, সে কি শুধু একটা কথাই বললাম? যখন দেখিয়ে দিলাম—প্রাণের এমন ক'রে বিস্তার হ'য়েছে, তখন তো বেদেরই কথা কইলাম। এই যে বিশ্ব, এই যে আকাশ, এ দু'টা জ্ঞানই। এই কথা যখন বললাম, তখন এই দু'টায় যে ঠেকে গেল এমন তো নয়! 'আমি' ও 'আমার ছেলে'—যখন বললাম, তখন কি আমাতে ও ছেলেতে ঠেকে গেল? ছেলের বুক থেকে আমার বুকে কত রস স্বতঃসিদ্ধভাবে উদ্বেলিত হ'য়ে বইতে থাকে! সেই রসটি যেমন আমাতেই, তেমনি বিশ্ব থেকে আমাতে ওই রস স্বতঃসিদ্ধভাবে যতক্ষণ না বইতে" থাকে ততক্ষণ বুঝতে হবে বেদ-প্রবাহই হয়নি। এটা ক'রে ক'রে দেখবার জিনিষ নয়—এ স্বতঃসিদ্ধ

ব্যাপার। গুরুর সিদ্ধান্তে যদি এসে পড় তো দেখবে এইটি হ'ল ওই জিনিষ—এর আকার-প্রকারই ওই। আমি 'আকার' কথাটা ব'লে ফেলেছি, যদিও এই প্রাণ কত সত্য—এ কি চেহারা ধরে, তার ইঙ্গিতও পাওনি।

এই যে দুনিয়া, এ যেন 'রূপ-রূপ' ক'রে দুলছে; দোলাই বা উদ্বেলনই হ'ল এর ধর্ম্ম—'রূপ' ফুটিয়ে তোলাই এর ধর্ম্ম; তোমার শুধু জানারই অপেক্ষা। তুমি কিন্তু তা' দেখছ না—তুমি দেখছ না, এতে ঠেক্‌লে কী আগুন বেরোয়, রসের পর রস কেমন প্রবাহিত হ'তে থাকে, সোমের প্লাবনে দিগ্‌দিগন্ত কিরূপ ভর্ত্তি হ'য়ে যায়! তুমি যা দেখছ, সেটা হচ্ছে—ওটি আকাশ আর এটি পৃথিবী—ওটি চেতন আর এইটি অচেতন! তুমি দেখছ না, কী বৈচিত্র্যময় চেহারা এই বিশ্ব ধরে—কি রূপের পর্ব্বত ও ফুটিয়ে তোলে! এই বিশ্ব কত রকম চেহারায় ফুটছে, সেই স্তরগুলা দেখাবার জন্যই বলা হয়েছে 'ব্রহ্মাণী,' 'মাহেশ্বরী,' 'কৌমারী' ইত্যাদি। কত রকম মূর্ত্ত প্রাণের প্রবহন হ'লে একটি ছেলে গড়া হয়—মা তন্ময়ী হ'য়ে দাঁড়ান—সেটিই এই 'নবার্ণ' স্তোত্রে দেখান হ'য়েছে।

সাধকের লক্ষ্য—গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানে বেদময় ও জীবন্ত হওয়া

একে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আত্মময়, প্রাণময়, ইন্দ্রিয়ময় ও উদ্বেলনময় ক'রে তুলতে পার—যতক্ষণ না আমার জ্ঞান এইরূপে তোমাকে ঠেলে চালিত ক'রে দিবে, ততক্ষণ বুঝতে হবে এই জ্ঞান নীচেই পড়ে আছে। এইরূপে চালিত করবার জন্যই ঋষি-গুরু বিশেষ ভাবে ছক এঁকে দিলেন, যেমন বাড়ী তৈরীর structure গুলাতে পর পর নম্বর দেওয়া থাকে, আর সেই সেই নম্বর দেখে যেখানে যেটা বসাতে হয় সেই ভাবে বসিয়ে যাও, এমনি ভাবে তিনি নম্বর দিয়ে দিলেন—এইটি 'ঋক'

একে এই রকম ভাবে জ্বালতে হয়, আর এ এই রকম ভাবে জ্যান্ত হয়; এইটি 'যজুঃ', একে এই রকম ভাবে জ্বালতে হয়, এবং এ এই রকম ভাবে জ্যান্ত হয়; এইটি 'সাম,' একে এই রকম ভাবে জ্বালতে হয়, এবং এ এই রকম ভাবে জ্যান্ত হয়। জ্যান্ত হওয়া চাই—এই হ'ল আসল কথা। এইটুকু যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ তোমার বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই। অক্লান্ত ভাবে একে গ্রহণ করতে হবে। এইখানটা হ'ল most crucial point—নয় কি ?

—শ্রীগুরুবাণী, রবিবার, ২৯-৪-১৯৪৫



ষষ্ঠ অধ্যায়

চণ্ডীর শক্তিস্বরূপতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবীর তামসীমূর্ত্তি ও ধ্যান

[চুম্বক :—'অম্ভৃণ' বা বাঙ্ময় না হ'য়ে চণ্ডীপাঠ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই অম্ভৃণত্বের কথা চণ্ডীর ধ্যানে আছে। 'সুধাব্ধি' মানে চেতনসমুদ্র, যা থেকে বিশ্ব জাত হয়। মণি' মানে বাক্; দেবী বাক্‌মণ্ডপে রত্নবেদীর উপর যজ্ঞময়ী হ'য়ে বসে আছেন। জ্ঞান-স্বরূপতা ও শক্তিস্বরূপতা—এই দু'দিক তিনি সংযুক্ত ক'রে রেখেছেন ব'লে তার নাম 'পরিপীতবর্ণা'। আবার তিনি যা জ্ঞানস্বরূপতা দ্বারা ভোগ করছেন, তা দ্বারাই আবৃত হ'য়ে আছেন—তাই 'পীতাম্বরা'; মণ্ডপ, সিংহাসন ও বেদী—এই তিনটে তিন বেদ। চণ্ডিকা এই ত্রিবেদের অধিষ্ঠাত্রী; এখানে তাঁর ভঙ্গিমা 'পীতবর্ণা'। আনন্দময়ী নিজের দিক্ থেকে আনন্দ উদ্‌গীরণ করছেন, এবং জগতের দিক্ থেকে অসুরের আনন্দ গ্রাস করছেন—তাই তিনি 'ধৃতমুদ্‌গরবৈরীজিহ্বা'। বেদত্রয়ের ভিতর দিয়ে 'মা' বললে মায়ের এই চেহারা ফুটে। নচেৎ অসুর বধ হয় না। এই জন্য ব্রহ্মের রসস্বরূপতা জানা আবশ্যক।]

চণ্ডীপাঠের অনুগামী বাঙ্ময়ত্ব দর্শন

চণ্ডীতত্ত্বে একপাও অগ্রসর হবার জো নেই চণ্ডীকে না জেনে এবং প্রতিপদে শক্তি অর্জ্জন না ক'রে—তেজস্বী না হ'য়ে। কেন? চণ্ডীর উপলব্ধি করতে হ'লে সমগ্র জগৎটা নিয়ে উপলব্ধি করতে হয়—"নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা" অর্থাৎ চারিদিক "নাদপূরিত" বা বাঙ্ময়, এইটি দেখে দেখে চলতে হয়। চণ্ডী পড়তে হ'লেও 'অম্ভৃণ' অর্থাৎ বাঙ্ময় বা মন্ত্রময় পুরুষ হ'য়েই পড়তে হয়। 'অম্ভৃণ' মানে জানে না, এই রকম পুরুষের চণ্ডীপাঠ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা

মাত্র। চণ্ডী কেন উপাস্য—কেন চণ্ডীকে পূজা করব, এসব কথা 'অন্তর্মুখ' না হ'লে বুঝতেই পারবে না। বলেছ কি দেবতা বেরিয়ে আসছে—এরকম হ'লে ঠিক ঠিক চণ্ডীপাঠ হয়। এই অন্তর্মুখত্ব হ'ল চণ্ডীর essential point (সারতত্ত্ব)। এসব কথা চণ্ডীর ধ্যানেই রয়েছে। এই ধ্যানটি হ'ল—

ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী।
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকমাল্যবিভূষিতাঙ্গীম্
দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরী জিহ্বাম্॥

[সুধাসমুদ্রের মধ্যে মণিমণ্ডপস্থ রত্নবেদীস্থিত সিংহাসনে সমাসীনা, পরিপীতবর্ণা, পীতবস্ত্রপরিহিতা, বর্ণমাল্যশোভিত অঙ্গবিশিষ্টা এবং হস্তে মুদ্গর ও শত্রুজিহ্বাধারিণী দেবীকে স্মরণ করিতেছি।]

"সুধাব্ধি" বা চেতন সমুদ্র

এই মহাকালীকে একটু একটু চিনতে পারলে! এই হ'ল চণ্ডীর তামসীমূর্ত্তি। সুধাব্ধি মানে কি?—সুধাসমুদ্র অর্থাৎ চেতন-সমুদ্র বা পরমাত্মতত্ত্ব, যা থেকে সব জাত হয় ও যাতে সব প্রলীন হয়। এখানে আমার কথা বা তোমার কথা নয়—একদম 'চেতনে'র কথা কইছি। খালি এই একটি শব্দের উপর বজ্রের মত প'ড়ে থাকতে হবে। তোমায় ভুলে যেতে হবে তুমি, আমি অসুর—এই সব বিভিন্নত্ব। একেই বলে সুধাব্ধি; একে পুরাণে বলেছে 'ক্ষীরোদ সমুদ্র,' তন্ত্রে 'কামরূপ' বা 'কামাখ্যা,' এবং গীতায় বলেছে, "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্—" (১৪।৩)। অব্যক্ত ক্ষেত্র যখন প্রকাশ হয়, তখন তার নাম হয় 'মহৎভূমি'। আত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে যত পরিষ্কার ভাবে একে নেবে, ততই জীবত্ব ভাঙ্গবে। 'চেতন'—এই তত্ত্বটির জ্ঞানই জীবত্ব ভাঙ্গে; আর ভেঙ্গে দিলেই এটা হ'য়ে যায় ভগবতীর—হ'য়ে যায়

স্বয়ম্প্রকাশ; আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাতে adopted (গৃহীত) হ'য়ে যায়। এই পরমতত্ত্ব হ'ল এই যোনির, যা থেকে আমিত্ব -তুমিত্বটা জন্মেছে।

"মণিমণ্ডপ রত্নবেদী"

'মণি' মানে কি?—বাক্। 'মণ্ড' (মন্+ড) মানে যা চিন্তনীয়, জ্ঞাতব্য বা শ্রদ্ধেয়, অর্থাৎ সার বস্তু। আর 'মণ্ডপ' হ'ল, যা এই মণ্ডকে পালন করে (মণ্ড+প) বা ধারণ করে, যেমন 'চণ্ডীমণ্ডপ' —'চণ্ডী' বিগ্রহের আধার বা যে মন্দিরে 'চণ্ডী' প্রতিষ্ঠিত। তা হ'লে 'মণিমণ্ডপ' মানে হল মণিরূপ বা বাক্‌রূপ সারতত্ত্বের আধার, অর্থাৎ (বিরাট) মন—ভগবতীর সঙ্কল্পাত্মক ভাব। এটি হ'ল মায়ের প্রথম আসন। আর দ্বিতীয় আসন হ'ল 'সিংহাসন'—ব্রহ্মযজ্ঞময় ক্ষেত্র। এই সিংহাসন এক 'বেদী'র উপর অধিষ্ঠিত। এই বেদীটি হ'ল 'রত্নবেদী'—মায়ের তৃতীয় আসন, যা'কিছু মূর্ত্তি ধরেছে বা মূর্ত্ত হয়েছে, সেই বস্তুগুলি বা ভূতগুলির সমষ্টি। যা' কিছু ফুটে উঠেছে, তার নাম 'রত্ন' কেন?—এতেই আত্মদেবতা রমণ করেন বা রতিময় হন; 'রমতি'—এই জন্য এদের নাম 'রত্ন'। দেবী বাক্‌মণ্ডপে রত্নবেদীর উপর সিংহাসনে ব'সে আছেন।

"সিংহাসনোপরিগতা" দেবী

দেবী কি ভাবে ব'সে আছেন?—"সিংহাসনোপরিগতাম্," অর্থাৎ যজ্ঞময়ী হ'য়ে। 'সিংহাসন' মানে কর্ম্মময় বা যজ্ঞময় আসন। ভগবতী সমস্ত কর্ম্মের উপর control (প্রভুত্ব) করছেন। সৃষ্টি ক'রে, control ক'রে এবং লয় ক'রে আবার এই সমস্ত কর্ম্ম-জালের উপর যিনি ব'সে রয়েছেন একেবারে direct (প্রত্যক্ষ) কর্ত্তা হ'য়ে, তিনিই হ'লেন "সিংহাসনোপরিগতা"। আঃ! এমন না হ'লে কি 'ভগবতী' হয়! এক জায়গায় ভগবতী ব'সে আছেন,

আর এক জায়গায় কর্ম্ম নিয়ে যত সব হুড়াহুড়ি চলছে—এরকম কি ভগবতীর থাকা ?—না। হাসি আর কাঁদি, ছুটাছুটি করি আর শুয়ে থাকি—এসব হচ্ছে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায়। এই ইচ্ছাময়ী কে ? এই 'স্বয়ম্প্রকাশ', এই যে প্রচেষ্টা করছি এঁকে ধরবার জন্য—এই প্রচেষ্টাও এরই তো ? ভগবতি ! তুমি এমনি ক'রে আমাদের গুয়ের পোকা ক'রে রেখেছিলে, আবার স্বর্গের কপাট খুলে দিচ্ছ। কেন এমন কর মা ?

"পরিপীতবর্ণা" ও "পীতাম্বরা" দেবী

"পরিপীতবর্ণাম্" মানে কি ? 'পা' ধাতু থেকে হ'য়েছে 'পীত', অর্থাৎ পান ক'রে ফেলেছেন বা খেয়ে ফেলেছেন। পরিপূর্ণরূপে বা সর্ব্বতোভাবে যিনি সমস্ত 'বর্ণ'কে বা প্রকাশকে খেয়ে ব'সে আছেন, তিনি হ'লেন 'পরিপীতবর্ণা'। এ পাশ থেকে 'চেতনা' আর ওপাশ থেকে 'অচেতন,' এই দু'টা দিক্ যেখানে meet করেছে—এপাশ থেকে কালো আর ওপাশ থেকে লাল, এই দু'টাকে যিনি খেয়ে ফেলেছেন, তাঁর নাম 'পরিপীতবর্ণা'। লাল ও কালো এই দু'টা বর্ণ মিশে হ'য়েছে হলুদে—'পীত'। ইনি উভয়কে পান করেছেন—উভয়কে একসঙ্গে ক'রে বিরাজ করছেন। যজ্ঞময় হ'য়ে—এদিক থেকে সব ফুটিয়ে তুলে সেগুলাকে আবার নিজের দিকে নিয়ে চলেছেন। জ্ঞানস্বরূপতা এক পিঠে, আর অনাত্মস্বরূপতা বা শক্তিস্বরূপতা অন্য পিঠে—এই দু'টার সংযোগ যিনি বজায় রেখেছেন, তাঁরই হ'ল যজুর্ব্বেদমূর্ত্তি—তাঁরই নাম 'পরিপীতবর্ণা'। এখন এই 'বেদ'টি বুঝতে পারলে ? It is neither knowledge nor only consciousness (এটি জ্ঞানও নয় বা শুধু চেতনাও নয়)। যিনি সব হন, তিনি আবার তা সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করেন বা ভোগ করেন। এইটি হ'ল ভয়ঙ্কর mystery (রহস্য) এই চেতন দেবতার। আর "পীতাম্বরা" মানে যা তিনি খাচ্ছেন,

তা'দ্বারাই আবার আবৃত হ'য়েও আছেন ; তাই তাঁর এই আবরণটি অম্বরের মত হ'য়ে রয়েছে।

'মণ্ডপ,' 'বেদী' ও 'সিংহাসন' ব'লে যে বর্ণনাটি দেওয়া হ'ল, এর সার্থকতা হ'ল তিন্‌টে 'বেদ'! সকলই যদি প্রজ্ঞান হয়, 'মণ্ডপ' তার ভিতর ফুটে উঠছে! এটা হ'ল 'সামবেদ'। 'রত্নবেদী' হ'ল 'ঋগ্বেদ', আর 'সিংহাসন' 'যজুর্ব্বেদ'। সামবেদ হ'ল—মহাসরস্বতী ক্ষেত্র। উপরে যেটা ছুটছে, এটা 'বজ্র'। সাম থেকে ঋকে নজরে পড়ল—এই যে সংযোগ হ'য়ে গেল, এর নাম 'যজুঃ'। এই যে ত্রিবেদ, এর মধ্যে যিনি বসে আছেন, তিনি 'চণ্ডিকা'। যেখানে 'মণ্ডপ' সেখানেও 'বাক্'; যেখানে 'রত্নবেদী' সেখানেও 'বাক্'; আর যেখানে সিংহাসন সেখানেও 'বাক্'।

তা হ'লে বাক্‌রূপিণী যে দেবতা, তিনিই হ'লেন এই ত্রিবেদের অধিষ্ঠাত্রী, আর তাঁর ভঙ্গিমা হ'ল 'পীতবর্ণা'। এখানে 'পীত' বলাতে পানটার উপরই জোর দেওয়া হ'ল অর্থাৎ যজুর্ব্বেদের উপর 'সোম' ক্ষেত্রেরই জোর দেওয়া হ'ল। যদি বলতাম কালো, ওকে সামক্ষেত্রে জোর দেওয়া হ'ত ও যদি বলতাম লাল, ওকে ঋক্ ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হত; আর যদি বলি হলুদে, তবে সোম ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হ'ল। এখানে সবটাই 'পীত' করা হচ্ছে—বর্ণ, বস্ত্র ও অলঙ্কার। 'কনক' মানে সুবর্ণ বা পীতবর্ণবিশিষ্ট অক্ষর। 'কনকমাল্য' মানে হ'ল পীতবর্ণমালা। পরমাত্মতত্ত্ব থেকে যে বর্ণরাশি দিগ্‌দিগন্তে অনবরত অনন্তে অনন্তে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সেই সব পীতবর্ণ দ্বারা দেবীর অঙ্গ বিভূষিত, তাই তিনি 'কনকমাল্যবিভূষিতাঙ্গী' অর্থাৎ পীতবর্ণমালিনী। আবার তিনি পীতাম্বরাও —পীত আকাশরূপ বস্ত্রাচ্ছাদিতাও। এখানে ঋষি 'পবমান সোম' ক্ষেত্রটি দেখাবার জন্যই এই পীতভাবের বর্ণনাটি করছেন। তোমায় রস খেতে হবে। তোমাকে stagnated (অচল) মূর্ত্তি দেখাবার

জন্য এই দেবতা কল্পনা করা হয়নি। কোন্ রসের দেবতা দেখতে গেলে এ রকমের মূর্ত্তি হ'তে পারে—সেই রসটি তোমায় খেতে হবে।

"ধৃতমুদ্গরবৈরীজিহ্বা" চণ্ডিকা

"দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্গরবৈরীজিহ্বাম্"—এখানে 'মুদ্গর' মানে কি? 'মুদ' মানে 'আনন্দ,' আর 'গর' মানে উদ্গীরতি ইতি', 'গরয়তি ইতি' বা। একদিকে 'মুদং' রসং গরয়তি—আনন্দং উদ্গীরতি—গর্জ্জয়তি, অর্থাৎ ঢাল্‌ছে; রসতত্ত্বে এসব একই কথা। রসতত্ত্বে ঢালা যেটার চেহারা, সেটাই গর্জ্জন। আর একদিকে দেবী বৈরীজিহ্বা ধরেছেন—গ্রাস করছেন। 'বৈরীজিহ্বা' মানে কি? যেমন, এই যে খরম এটিকে মাত্র খরম ব'লে যদি দেখি—যদি এই ব'লে না দেখি—"ভগবতি! তুমিই সেজেছ এই খরম"—এর নাম হ'ল 'বৈরীজিহ্বা'। যা-কিছু এল, সবই তো ভোগ—টাকা স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি? তা হ'লে সে ভোগটাকে যদি ওইভাবে নিতে না পারি, সেটা তখন হ'ল 'বৈরীজিহ্বা'। 'মুদ্গর' কেন বললে?—দেবী জিভ্ দিয়ে চেপে ধরে আনন্দকে গ্রাস করছেন। আগেই বলা হ'য়েছে 'মুদ' মানে আনন্দ, আর 'গৃ' ধাতু মানে গ্রাস করা। তিনি অসুরের আনন্দকে গ্রাস করছেন। অসুরস্য মুদং আনন্দং গ্রসতি তথা চ আত্মনঃ আনন্দস্বরূপং উদ্গীরতি। 'গৃ' ধাতুর দু'টা অর্থ—অসুরের দিক থেকে আনন্দ গ্রাস করা হচ্ছে, আবার আনন্দময়ীর দিক থেকে আনন্দ উদ্গীরিত করা হচ্ছে—বা'র করা হচ্ছে। এই জন্য এতসব অস্ত্র থাকতেও 'মুদ্গর' বলা হয়েছে। 'যজ্ঞ' ব'লে না দেখলে বাকের যে মূর্ত্তি হয়, তার নাম 'বৈরী'। যজ্ঞ না করলে সাধারণ কথায় যে ভাবে জগদ্ ব্যবহার হয়, তাকে বলা হয় 'বৈরীজিহ্বা'। সুতরাং 'ধৃতবৈরীজিহ্বাং' বলাও যা, 'ধৃতবিশ্বং' বলাও তাই। 'বৈরী' মানে অসুর, যাকে

মারতে হবে। মায়ের এই ভঙ্গিমার নাম 'মহাসরস্বতীবিদ্যা'—ঐখানে আর কাউকে ঢুকতে দিবেন না।

বৈরীজিহ্বার নিগ্রহ

মহাশক্তিতত্ত্বের উপাসনা যখন চলে, 'কাল' ও 'নাদ' এই আদি দু'টা জিনিষ নিতে হয়। জিভ্ থেকে কথা ফুটে, আবার কথা থেকে জগৎ ফুটে। জগৎ-ফোটা মানে বৈরী-ফোটা—জগৎ দেখা মানে বৈরী-দেখা। যেটা অসুর-জিহ্বা—যেটা 'মা' বলতে চায়নি, সেটাকে মা চেপে ধরেছেন। যখন 'মা' বলতে যাও, তখন জীবভাবীয় চিন্তাজাল কি খেলা করতে থাকে? 'জীবভাবীয় চিন্তাজাল' মা ছাড়া আর অন্য কোন কথা; সেগুলিই বৈরী-জিহ্বা। মা যখন "উদ্গীরতি" তখন বৈরীজিহ্বা চেপে ধরেছেন, আর ত্রিবেদকে আসন ক'রে আনন্দ ঢালছেন। এই 'মুদ্গরণ'রূপ যে ক্রিয়া তা'দ্বারা 'বৈরীজিহ্বাং শোষয়তি'। বেদের ভিতর দিয়ে যদি 'মা' বল তবেই এ চেহারা ফুটে। 'বৈরীজিহ্বা' মারতে কতক্ষণ লাগে?—তা' বুঝতে পারছ না—ধারণা করতে পারছ না। তার মানে হ'ল 'অহমস্মি'—এই বৈরী-জিহ্বা চলেছে ঠায় sub-consciously (অর্দ্ধচৈতন্য ভাবে)। 'আমি রয়েছি'—এই অস্মিতা-বোধটিকে যতক্ষণ না মায়ের 'মুদ্গরে' ধরে, ততক্ষণ বলবে, "সব বুঝেছি বটে, কিন্তু হবার জো নেই, মশায়," আর ততক্ষণ একে কিছুতেই মারতে পারবে না। একে মারবার একমাত্র যে রাস্তাটি সেটি দেখতে পাবে, যদি 'রসতত্ত্ব' বুঝতে পার। আর এটি না ধরতে পারলে কিছুতেই বাঁচবার উপায় নেই।

এই জন্যে ব্রহ্মের রসস্বরূপতা আমি তোমাদের বলবার চেষ্টা করছি। রসস্বরূপ কাকে বলে? সমগ্র সোম আর সূর্য্য যাতে একীভূত হয়, তার নাম 'রস'। যেমন ধর গন্ধতত্ত্ব; এই গন্ধ-তত্ত্বের বিশিষ্ট কোন গন্ধ নেই। বিশিষ্ট গন্ধ যতক্ষণ থাকবে,

ততক্ষণ গন্ধতত্ত্ব বলবার জো নেই। গন্ধ অথচ তাতে গন্ধ নেই, এমন যে গন্ধ, সে গন্ধ থেকেই সব গন্ধ বেরুবে। এমন যে রস তা থেকে যত কিছু প্রাণ বেরোয়। যাতে কোন রস নেই, অথচ যা থেকে যত-কিছু রস সব বেরোয়, এমন যে তত্ত্ব, তার নাম 'রসতত্ত্ব'।

—শ্রীগুরুবাণী, সোমবার, ৫-৫-১৯৪১

—০ঃ*ঃ০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেবীর চরিতত্রয় মাহাত্ম্য

[চুম্বক :—চণ্ডীবর্ণিত ত্রিশক্তি; প্রথম-শক্তি নন্দা; দ্বিতীয়-শক্তি শাকম্ভরী; তৃতীয়-শক্তি ভীমা। চেতনের এই ত্রিশক্তির ক্রিয়া—নিজেতে ও বিশ্বে। জাগরণের কারণ—আনন্দের প্রেরণা নিজ চেতনায়। দেবতা দর্শনের পূর্ব্বে চেতনাকে চেনার আবশ্যকতা, নচেৎ দেবতা চেনা অসম্ভব। "শান্তম্ উপাসীত"। ভগবৎ চৈতন্যই মানবের স্বভাবসিদ্ধ আশ্রয়।]

চণ্ডীবর্ণিত শক্তিত্রয়

শক্তির প্রকাশ ত্রিবিধ। উপনিষদ যাকে 'ত্রিবৃৎ' বলেছে, চণ্ডীতে তাকেই ত্রিশক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 'ত্রিবৃৎ' মানে আর কিছু নয়—ওই যে স্বয়ম্প্রকাশ, ইনিই আপনাদ্বারা আপনাকে তিনরূপে জানছেন। শক্তি হিসেবে দেখতে গিয়ে 'চেতন' সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে, তিনি ত্রিশক্তি হ'য়েছেন। এই ত্রিশক্তি কি কি? —'নন্দা', 'শাকম্ভরী' ও 'ভীমা'। এঁদের কাজ হ'ল—আনন্দ-প্রকাশ, প্রাণপ্রকাশ আর তামসীমূর্ত্তি বা ভূতপ্রকাশ। এই

তিনটি শক্তির ভিতর তিনটি 'বীজ' আছে, আর তিনটি তত্ত্ব আছে। আর তিনটে বিভিন্ন ছন্দে বা তালে এই ত্রিশক্তির বিকাশ হয়।

নন্দা শক্তি

চণ্ডীর প্রথম চরিতে 'নন্দা' হ'ল 'শক্তি', 'রক্তদন্তিকা' হ'ল 'বীজ', আর 'অগ্নি' হ'ল 'তত্ত্ব'। ইনি যে এখানে 'আনন্দ'স্বরূপিনী, এই আনন্দের চোটে তিনি কি করছেন?—ঈশিত্ব; "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—(তৈত্তিরীয় ৩৬)। প্রথমে যে primary (আদি) ঠেলাটা, সেটা তো 'আনন্দ'ই— আনন্দ ভিন্ন কেউ কখনও কোন কাজ করে না। সেখানকার specific (বিশিষ্ট) ক্রিয়া হ'ল "রক্তদন্তিকা"—কেটে কেটে চিবিয়ে চিবিয়ে ছেড়ে দেওয়া—খালি টুকরা টুকরা ক'রে দেওয়া। আনন্দেরই চোটে তা থেকে সব টুক্‌রা বা'র হয়, আর সে টুক্‌রা-গুলি হয় তেজোময়—অগ্নিময়। এখানে কর্ত্তনময়তা হ'ল প্রধান। এই টুকরাগুলি হ'ল 'ঋক্'। তাই এই শক্তি ঋগ্বেদস্বরূপ।

শাকম্ভরী শক্তি

মধ্যম চরিতে 'শাকম্ভরী' অর্থাৎ প্রাণময়ী মূর্ত্তি বা শক্তিসমূহমূর্ত্তি হ'ল দ্বিতীয়া শক্তি। এর বীজ হ'ল 'দুর্গা'। এর কাজ কি?— পোষণ করা—'দুর্গ' রচনা করা-ঈশ্বর ভাব ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবভাব তৈরী করা, আর তা ভেঙ্গে দেওয়া। একে বিশিষ্ট শক্তিতে শক্তিমান করবার aspect হ'ল দু'টা—একটা aspect 'ভোগ' আর একটা 'অপবর্গ'—একটা 'সিদ্ধি' আর একটা 'মুক্তি'। এই উভয় ফলের দাতা ব'লে এর নাম হ'ল 'দুর্গা'। কিরূপে এ এই ফল দেয়?—"কর্ম্মফলেষুজুষ্টা" হ'য়ে। এর বৈশিষ্ট্য হ'ল পোষণময়তা। তাই এর তত্ত্ব হ'ল 'বায়ু' অর্থাৎ প্রাণ। এই শক্তি 'ঋক্' ও আম্নত্বের সংযোগ ঘটায় ব'লে এর স্বরূপ হ'ল 'যজুর্ব্বেদ'।

ভীমা শক্তি

উত্তর চরিতে 'ভীমা' হ'ল তৃতীয়া শক্তি। এখানে এ যে মূর্ত্তি ধরেছে, তা' একেবারে তামসী—একেবারে অচেতন। এ এক ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, তাই এর নাম 'ভীমা'। এর বীজ কি?—'ভ্রামরী,' আনন্দে ফেটে গিয়ে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে প্রাণময় বা পোষণময় হ'য়ে ভ্রমরের মত ফর-ফর ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছে। যেমন, সূর্য্য উড়ছে, চন্দ্র উড়ছে, নক্ষত্র উড়ছে—বিশ্বের সকল পদার্থই কেবল উড়ছে; আর তোমরাও জন্ম হ'তে জন্মান্তরে উড়ে বেড়াচ্ছ। এখানে কোন্ ক্রিয়ার প্রাধান্য?—ভ্রমণময়তা। এই যে কর্ত্তনময়তা, পোষণময়তা ও ভ্রমণময়তা, এর ভিতর যত কিছু ঘুরছে from one stage to another—এক কাল থেকে আর এক কাল পর্য্যন্ত—এই সব হ'ল 'ভ্রামরী' বীজের ক্রিয়া।

জীব চৈতন্যে এই শক্তিত্রয়ের রূপপ্রকাশ

এই যে ত্রিবিধ শক্তি—নন্দা, শাকম্ভরী ও ভীমা—এই শক্তি মুর্ত্তিতে এ কে উড়ছে?—তোমারই চেতনা—ওই 'স্বয়ম্প্রকাশ'। তোমার দৈনন্দিন ব্যবহারে দেখ, এই কাজই হচ্ছে। তুমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে টাকাকড়ি নিয়ে বাজারে গেলে, এবং মাছতরকারী কিনে এনে রাঁধলে, আর "তুই খা—তুই খা" ব'লে বাড়ীর সকলকে খাইয়ে নিজে শুদ্ধ খেলে। এর ভিতর কোথায় বা 'নন্দা', কোথায় বা 'শাকম্ভরী', আর কোথায়ই বা 'ভীমা'? বাজার ক'রে এনে পাঁচ জনকে খাওয়াতে হবে—এই রসে যে মস্‌গুল হ'য়ে, megnetised (চৌম্বকধর্ম্মী) হ'য়ে রয়েছ—এই হ'ল 'নন্দা'। তার পর বাজার ক'রে এসে তোমার নানা রকম রান্না করা—এই হ'ল 'শাকম্ভরী'। আর 'ভীমা' এল তখন, যখন গপ্-গপ্ ক'রে ভূতের মতন খেয়ে ফেললে, এবং আবার অব্যক্ততার ভিতর negatived (নাস্তি) হ'য়ে গেলে। 'ভ্রামরী' মানে হ'ল

প্রত্যাবর্ত্তন—অব্যক্তে নিধন। যে আনন্দটা নিয়ে তুমি বেরিয়েছিলে, খাওয়া হ'য়ে যাওয়ার পর ওটা নিধন প্রাপ্ত হ'ল, এবং 'ভূত' হ'য়ে অব্যক্ত ঘরে ঢুকে গেল। সেটা আবার বেরুবে টাকার থলে হাতে করে আর ছাতা মাথায় দিয়ে, যখন আবার খাওয়াবার আবশ্যকতা মনে পড়ে যাবে। উল্লাসে বেরুল, তাতে magnetised (চৌম্বকধর্ম্মী) হ'ল, এবং তাতে প্রাপ্তির আনন্দ নিয়ে 'ভূত' হ'ল,—এই ক্রিয়াই অনবরত চলেছে প্রতি জীবের জীবনে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পদার্থের আবর্ত্তনে।

এই ত্রিবিধ শক্তির উৎস—আনন্দ

আনন্দে magnetised হ'য়ে যাওয়া, তাকে প্রাপ্তির প্রকাশে ফুটিয়ে তোলা, আর যে আনন্দ নিয়ে বেরুনো হয়, সেটা ভূত হ'য়ে যাওয়া—আনন্দের এই খেলা তোমাতে হচ্ছে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র ওই ত্রিশক্তি এই কাজ করছে, আবার 'ভূত' হ'য়ে সব অব্যক্তে একসা হচ্ছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু থেকে আরম্ভ ক'রে, তুমি-আমি পর্য্যন্ত—টিকটিকি গিরগিটি পর্য্যন্ত—সবাই বাইরে দেখতে পাঁচজনকে খাওয়াচ্ছে; টিকটিকি গিরগিটি হয় তো নিজের হাত-পা-কেই খাওয়াচ্ছে। কিন্তু এই খাওয়ানোর জন্য আনন্দের এই যে ঠেলাটা বুকে এল, সেটা পরিশেষে হ'ল 'ভূত'—অব্যক্তে প্রত্যাবর্ত্তন। তোমার চেতন ক্রিয়ায় আনন্দস্বরূপের এই গতিটি দেখা যাচ্ছে?

তুমি সকাল বেলা উঠেই নিজেকে স্ত্রীপুত্র জগৎ সংসারময় বিস্ফুরিত ক'রে ছেড়ে দিয়েছ। 'জেগে উঠেছ' মানে নিজের আনন্দস্বরূপতা যেখানে, সেখানে দাঁড়িয়ে আনন্দের চোটে 'রক্ত-দন্তিকা' সঙ্গমে নিজেকে কচ্-কচ্ ক'রে কেটে নিয়েছ; তার পর তুমি চললে—তোমার প্রাণের খেলা আরম্ভ হ'ল; তারপর 'সমাস' হ'ল, আর তজ্জাতীয় গতি চলতে লাগল। কখন চললে অমুকের

সঙ্গে দেখা করতে; কখন চললে ডাক্তারের কাছে, ছেলের অসুখ ব'লে; কখন বা চললে আজ ছেলের বিয়ে, তার উদ্যোগ করতে। এইরূপে তুমি বৈশিষ্ট্যের পর বৈশিষ্ট্য নিতে লাগলে। তোমার দরকার ছিল কি গামছা বগলে ক'রে বাজার করতে যাওয়ার, যদি না আনন্দময়ী তোমাকে জাগিয়ে দিতেন? যদি Sleeping draught খেয়ে—ঘুমের ওষুধ খেয়ে—তুমি পড়েই থাকতে, তো কে যে'ত মূলো কিন্‌তে আর আলু কিন্‌তে?

সর্ব্বশক্তির আধার চেতনতত্ত্বকে চেনার আবশ্যকতা

এই যে তোমার activity (ক্রিয়াশীলত্ব), এ কোথায় দেখতে পাচ্ছ?—তোমার নিজ চেতনায় তো? কালী-কৃষ্ণ—এ সব দেবতা দেখ আর না দেখ, এই চেতনের ক্রিয়া যত দেখতে থাকবে ততই কালী-কৃষ্ণ আপনি এসে পড়বে, ও বলবে "বরং বৃণু"! সকাল বেলা হৈ-হৈ ক'রে কেন খাট্‌তে বেরিয়েছ?—কোন্ শক্তি তোমাকে বা'র করেছে? এই খানে দেখ কালী-কৃষ্ণ; তবেই চিনতে পারবে কে এই হাট করে—বাজার করে। মন্দিরের ভিতরে কি দেখবে কালী-কৃষ্ণ?—এখানে দেখ তবে চিনতে পারবে।

এসে পড়েছ; এখানে চোখ টিপলে আর নাক টিপলে, কিছু হবে না—এ কথাটা বুঝে নাও; তোমায় পড়তে হবে একদম 'চেতনে'। Just plain consciousness (শুধু সরল চেতন) নিয়ে চল, আর চিনতে থাক এই জিনিষটিকে। তোমার গায়ে যদি জহুরতের একটা বস্তা ফেলে দিই তা তোমার নিকট নিরর্থক হবে, বরং ভারী বস্তার চোটে তোমার প্রাণ যায়-যায় হবে, আর তুমি বলবে "এটা ফেলে দিতে পারলে বাঁচি"। এই অবস্থাটি হয় যদি তুমি জহরত না চেন। আমি যদি কালী-কৃষ্ণ হ'য়ে দাঁড়াই, আর যদি তুমি চিনতে না পার, তবে কি হবে?

ধীরে ধীরে ধারণা কর; একেবারে না পার তো দুবারে কর; "শান্তমুপাসীত"। ভগবানই তোমার স্বভাবসিদ্ধ আশ্রয়—স্বভাব-সিদ্ধই—অলৌকিক নয়। অলৌকিক হ'ল তোমার এই বাঁদর সাজাটা—হনুমান সাজাটা!—আর লৌকিক ব্যাপার হ'ল ভগবৎ-স্বাধর্ম্ম্য। অলৌকিক হ'ল এই 'ভূত'টা—এই ভীমা তামসীমূর্ত্তি।

—শ্রীগুরুবাণী, বৃহস্পতিবার, ২২-৫-১৯৪১

—:*:—

শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা প্রণীত পুস্তকাবলী

বেদান্তদর্শন পূর্ব্বভাগ—বেদান্তের নূতন আলোক।	...	৩৲
ঐ কাপড়ে বাধাই	...	৪৲
ঋতম্ভরা বা সত্যপ্রতিষ্ঠা, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রচৈতন্য। ৩য় সংস্করণ।		৩৲
শ্রীশ্রীগুরুবাণী ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, প্রতি সংখ্যা	...	।৵৩
জাতবেদা	...	২॥০
সত্য-সম্বেদন	...	৩৲
ঈশোপনিষৎ	...	১॥০
শিবের বুকে শ্যামা কেন?	...	॥০
মা আমার কাল কেন?	...	॥০
দশমহাবিদ্যা (সচিত্র)	...	
মুক্তি	...	
বিজয় ভেরী	...	৶১০
বৈজয়ন্তী তন্ত্রম (ঋতম্ভরা সারম্)	...	১।০
আদর্শ ব্রাহ্মণ (নাটক)	...	
নামের বল (নাটক)	...	২৲
সতী-(নাটক)—যন্ত্রস্থ	...	
উপনিষদ্‌রহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা		
১ম ভাগে—১ম ও ২য় অধ্যায়	...	
২য় ভাগে ৩য় ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়	...	
৩য় ভাগে—৭ম হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়	...	৫৲

বেদবাণী—১ম—৪র্থ খণ্ড প্রতি খণ্ড ২৲, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রতি খণ্ড ২।০

চিদম্বরা—সাধন রাজ্যের অপূর্ব্ব গ্রন্থ। মূল্য ৩৲

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীশ্রীবিশ্বমাতা পূজা—১৯৩৮ সালের পূজানুষ্ঠান ২৸০, ১৯৩৯ সালের পূজানুষ্ঠান ৩।০

শ্রীকুমুদ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,

শ্রীগুরুমন্দির—

৬৪ নং কালী বন্দ্যোপাধ্যায় গলি, হাওড়া।

রহস্যবিদ্যা

বা

শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণের চণ্ডীতত্ত্বসম্বন্ধীয় উপদেশবাণী সংগ্রহ

মধ্যপ্রবাহ ও অন্তঃপ্রবাহ—যন্ত্রস্থ

'ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের দুর্লভ ও অমৃতময় উপদেশ পরিপূরিত এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠে কেবল যে চণ্ডীজ্ঞান সম্যক্ উদ্ভাসিত হইবে তাহা নয়, পরন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সর্ব্বসংশয়ের নিরসন এবং ভগবৎ সাধনার প্রকৃষ্ট পন্থা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে।

মধ্যপ্রবাহ—প্রাণাত্মিকা চণ্ডিকা

—সংক্ষিপ্ত সূচী—

১। "দেবাব ব্রহ্মণোরূপে"
২। চণ্ডিকার ব্রহ্মচক্রবিলাস ও ঈশিত্ব
৩। চণ্ডীরহস্য 'চামুণ্ডা'
৪। সিংহতত্ত্ব—জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়
৫। চণ্ডীর বেদমূলকত্ব
৬। জাতবেদা চণ্ডিকা
৭। নবশক্তিস্ফুরণমণ্ডিতা চণ্ডিকা

অন্তঃপ্রবাহ—বাগাত্মিকা চণ্ডিকা

—সংক্ষিপ্ত সূচী—

১। রসতত্ত্ব ২। কালতত্ত্ব ৩। রুদ্রতত্ত্ব ৪। সুখতত্ত্ব ৫। পরিশিষ্ট

—০:*:০—

প্রকাশক—শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
উপনিষদ্ রহস্য কার্য্যালয়—৬৪ নং কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, হাওড়া
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ
১২৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা

বিশ্ববাণী প্রেস—কলিকাতা-৩।